





বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

বিজ্ঞান ব্লগের এক যুগ নির্বাচিত নিবন্ধ সংকলন

সম্পাদনায়

আরাফাত রহমান, সুজয় কুমার দাশ, মুবতাসিম ফুয়াদ

অলংকরণে মুবতাসিম ফুয়াদ

প্রচ্ছদ-ছবি: আমান্ডা কিউয়েরাগা

প্রকাশকাল: জুন ২০২১

© বিজ্ঞান ব্লগ

ওয়েবসাইট: bigganblog.org ফেসবুক গ্রুপ: বিজ্ঞান ব্লগ ফোরাম



বিজ্ঞান ব্লগের প্রত্যেক পাঠক এবং শুভাকাজ্জীর প্রতি উৎসর্গীকৃত



ভূমিকা

বতে অবাক লাগে, বিজ্ঞান ব্লগের এক যুগ পূর্ণ হতে যাচছে। পেছনে ফিরে গত বারো বছরের দিকে তাকালে অবাকই লাগে। ২০১০ সালে শুরু হওয়া ছোট এই অনলাইন গ্রুপ ব্লগিটিতে একটা দুইটা করে এখন পর্যন্ত ৮ে২টি লেখা প্রকাশিত হয়েছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে। আমাদের এই দীর্ঘ যাত্রার মাইলফলক হিসেবে প্রকাশিত হলো বিজ্ঞান অভিসন্ধানী ই-বইটি। এখানে আমাদের সকল নিয়মিত লেখক ও গত এক বছরে সক্রিয় অবদানকারীদের একটি করে লেখা নিয়ে বিজ্ঞান-নিবন্ধ সংকলন তৈরি করা হয়েছে। এর নাম কেন বিজ্ঞান অভিসন্ধানী? কারণ এখানে যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা বিজ্ঞানের প্রতি নিজেদের ভালোবাসা আর অর্জিত জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব থেকে লিখেছেন। আমাদের লেখকরা সবাই একেকজন অভিযাত্রী, বিজ্ঞানের কৌতুহলের রহস্যময় রাজত্বে তাঁদের অভিসন্ধান। মোট পঞ্চাশ জন বিজ্ঞান অভিযাত্রিকের পঞ্চাশটি বিজ্ঞান নিবন্ধ নিয়ে এই ই-বইটি।

বিভিন্ন সময় যাঁরা বিজ্ঞান নিয়ে লিখেছেন, তাঁদেরকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জানানো প্রায় অসম্ভব। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চা আর বিজ্ঞান মনষ্কতা ছড়িয়ে দেয়ার আন্দোলনে বিজ্ঞান ব্লগ নামের এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যাঁরা বিভিন্ন সময় অবদান রেখেছেন, তাঁদেরকে তবুও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। বিজ্ঞান ব্লগের লেখক-পাঠকরাই আমাদের প্রাণ, সবার স্বেচ্ছাশ্রম, সক্রিয় অংশগ্রহণেই বিজ্ঞান ব্লগ বড় হচ্ছে ও আমরা একে অপরের কাছ থেকে শিখতে পারছি। এছাড়া অনেকেই বিভিন্ন সময় বিজ্ঞান ব্লগকে সহযোগীতা এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ভাবতে ভালো লাগে যে বিজ্ঞান ব্লগে লেখালেখি শুক্ত করে অনেকেই পরবর্তীতে বিজ্ঞান লেখক হিসেবে

নিজেদের আরেকটি পরিচয় তৈরি করেছেন। তাঁরা নিয়মিত বিজ্ঞান প্রবন্ধ লেখালেখি অব্যাহত রেখেছেন, এবং বিভিন্ন সময় বইও প্রকাশ করেছেন।

বিজ্ঞান ব্লগের এতোগুলো পুরনো লেখা ঘেঁটে বিভিন্ন লেখকের লেখা নির্বাচন সহজ নয়। এই সংকলনে লেখা নির্বাচনের কাজটি সুচারুভাবে করেছে সুজয় কুমার দাশ। আর লেখাগুলোকে বই হিসেবে নান্দনিক রূপ দেয়ার জন্যে কাজ করেছে মুবতাসিম ফুয়াদ; বইটির কাঠামো নির্মিত হয়েছে আদীব হাসানের বুক-টেমপ্লেট অবলম্বনে। তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি এই বইটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

আরাফাত রহমান সম্পাদক, বিজ্ঞান ব্লগ জুন ২০২১

সূচীপত্ৰ

ভূমি	ত্ মিকা	
১ .	আপেক্ষিকতায় যথার্থ সময়	:
ર.	দীপেন ভট্টাচার্য পেনিসিলিন এর জন্ম নিয়ে দু'কথা	29
૭ .	কে এম শরীফুল ইসলাম ${f DNA}$ 'র গঠন আবিস্কার: ছেলের কাছে ফ্রান্সিস ক্রিকের চিঠি	২
8.	সাদিয়া মুসাররাত, খান তানজীদ ওসমান সুন্দরবন বাঁচাও	২১
¢.	ফৌজিয়া আহমেদ সময় সুড়ঙ্গের নতুন দ্বার	৩ ৫
৬.	জি এম সাজ্জাদ হোসেন প্রিন্স মন্তিষ্ক ও তার ধারণক্ষমতা	8:
٩.	সৈয়দ মনজুর মোর্শেদ মগজের ঘড়িবিদ্যা সমস্যাদ সাম্প্রিকাশ	80
b .	কহশান আহমেদ নিউট্রিনো: মহাবিশ্বের ভূত	৫৩
გ.	সিরাজাম মুনির শ্রাবণ বাংলাদেশে ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ	৬৭
3 0.	আমানুল ইসলাম আইনস্টাইনের ডেস্ক ও রহস্যময় জড়পদার্থ	90
	হিমাংশু কর	

33.	আমি তব মালধ্গের হব মালাকর অতনু চক্রবর্ত্তী	৮৭
3 2.	মিউটেশন: কল্পনা, এক্স-ম্যানের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা কামরুজ্জামান ইমন	ડ ૦૯
5 ७.	জিন থেরাপি: চিকিৎসা বিজ্ঞানের শেষ অধ্যায় মডার্গ এইপ	33¢
\$8.	যে রাজপুত্র নন রাজার ছেলে শাহরিয়ার কবির পাভেল	202
\$ @.	কার্মার ব্যবচ্ছেদ: একটি প্রায় বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা সাবরিনা সুমাইয়া	38c
১৬.	রাশিফলবিদ্যাকে না বলুন মেহজাবিন হোসেন	১৫৩
১ ٩.	পদার্থবিজ্ঞানের যে ৬টি সমীকরণ বদলে দিয়েছিল ইতিহাসের বাঁক আহম্মদ উল্লাহ ফয়সাল	১৬১
\$ b.	গ্র্যাভিটেশনাল লেলিং তরিকুল দিপু	১৬৭
ኔ ል.	মেঘনাদ সাহা: একজন বিজ্ঞানী ও বিপ্লবী ইমতিয়াজ আহমেদ	ን ৮১
২০.	ভা ইরাসও কিন্তু ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে এন মাহমুদ	ን ሬረ
২১.	কিডনি রোগের জন্য দায়ী অনিয়মসমূহ এবং আপনার করণীয় এহতেশামূল কবীর লোটন	ኔልል
২২.	লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি মুহাম্মদ সামিউল আলম	২১১

২৩.	. ছোট ওকাজাকি ফ্রেগমেন্ট থেকে বড় সামাজিক ইস্যু আরিফ আশরাফ	২২৫
ર 8.	শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমাবে প্রোবায়োটিক তানভীর আহমেদ	২৩১
২৫.	্ল্লাসিক্যাল মেকানিক্স সৈয়দ ইমাদ উদ্দিন শুভ	২৩৭
২৬.	. কোভিড-১৯ টেস্টে নেগেটিভ মানেই বিপদমুক্ত নয় সৈয়দ মুক্তাদির আল সিয়াম	২৫৫
ર ૧.	অণুজীবের সাথে অমর প্রেম এফ, এম, আশিক মাহমুদ	২৬১
২৮.	. এভারেস্টের চূড়াতেও মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ আবীর হোসেন অনি	২৭১
২৯.	করো নাভাইরাস ভ্যাক্সিন: খরগোশ-কচ্ছপের পরিণতি কাম্য নয় আসিফ আহমেদ	২৭৭
90 ,	.মহাকাশে আবর্জনা: ঝুঁকি ও ভবিষ্যৎ মোঃ ফোরকান	২৮৩
৩ ১.	ঘড়ি আবিষ্কারের গল্প সাজেদা আক্তার জেরিন	২৯৯
৩২	. অনকোলাইটিক ভাইরাস থেরাপি মনির হোসেন	৩০৯
99	. বিশেষ আপেক্ষিকতার বিশেষ ভর মুবতাসিম ফুয়াদ	৩১৫
৩ 8.	, মস্তিঞ্চের চেতনা রহস্য রাফায়েতুল ইসলাম রুপম	৩৩১

৩৫. তামাকের মোজাইক ভাইরাস: রোগ ও প্রতিকার জান্নাতুল ফিজা	৩৩৯
৩৬.মেয়েদের ঋতুষ্রাব: ঋতুচক্র কী এবং কীভাবে কাজ করে? তানভীর রানা রাব্বি	৩৫৩
৩৭.করোনার ভ্যাক্সিন: কার্যক্ষমতা কি একমাত্র মানদন্ত? মাকসুদুর রহমান শিহাব	৩৬৩
৩৮.শৈবাল থেকেই তৈরি হবে পরিবেশবান্ধব পোশাক নুর ঈ হাসনাইন সারিখা	৩৭১
৩৯. মারিয়ানা ট্রেঞ্চ: পৃথিবীর গভীরতম স্থান আবিদ আবদুল্লাহ	৩৮১
৪০. আমরা কীভাবে অন্যদের থেকে বড় মন্তিষ্ক পেলাম সুজয় কুমার দাশ	৩৮৯
৪১. এইচআইভি উদ্ভবের আশ্চর্য ইতিহাস আরাফাত রহমান	৩৯৫
৪২. মেটালিক রেশিও: গোল্ডেন রেশিওর মূল পরিবার	800
সামিয়াতুল খান ৪৩. গাছেও কি ক্যান্সার হতে পারে?	877
মোঃ সানজিদ আহমেদ, অর্ণব কান্তি পাল 88. একটুখানি ক্রিসপার	878
অনির্বাণ মৈত্র ৪৫. মন্তিষ্ক যখন প্রেমের নাটের গুরু	803
মিঠুন পাল ৪৬. কেন মানুষ ষড়যন্ত্র তত্ত্বে বিশ্বাস করে?	883
শুভ সালাউদ্দিন	

89. অন্ত্রে মাইক্রোবায়োম নেই এমন প্রাণীর সন্ধানে উদিতি পাল বৃষ্টি	867
8৮.বিশুদ্ধ জল-সংকটে বিশ্ব: সম্ভাবনায় নির্লবণীকরণ সিয়াম আরাফাত	8৬৫
৪৯. "সুন্দর" এর কাটাকুটি: নন্দন স্নায়ু-বিজ্ঞান আরিফ ইশতিয়াক	د ۹8
৫০.ভিটামিন বি-১ আবিষ্কারের গল্প প্রসূন ঘোষ রায়	8৭৯
আহ্বান	8৮৭

পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

§ 3



আপেক্ষিকতায় যথার্থ সময়

দীপেন ভট্টাচার্য

পর্ব ১:

আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত অধ্যা-পক রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বই 'আপেক্ষিকতা তত্ত্ব' একটি উঁচু মানের বই। সমস্যা হল আমার কাছে সেটার যে কপিটা আছে তার ছাপা ও বাঁধাই ঠিক সম পরিমাণে নিকৃষ্ট। যার ফলে এই বইটি ডেস্ক রেফারেঙ্গ হবার বদলে বইয়ের তাকের কোন এক কোণায় অবহেলায় পড়ে থাকে। অধ্যাপক রঞ্জন proper time এর বাংলা করেছেন দেখলাম যথার্থ সময়। যথার্থ সময়টি কি জিনিস? আর time interval-কে বলেছেন কালিক অন্তর, ভাষাটা ইন্টারেস্টিং না?

রা যাক কোন একটা জাড্য কাঠামোয় (inertial reference frame) দুটি ঘটনা একই স্থানে ঘটেছে, কিন্তু একই সময়ে নয়। অর্থাৎ তাদের মাঝে কালিক (বা কালের অর্থাৎ সময়ের) অন্তর আছে। যেমন প্রথম ঘটনাটা হতে পারে আমি হাত থেকে একটা বল ছেড়ে দিলাম, দ্বিতীয় ঘটনা হল বলটা মাটিতে আঘাত করল। ধরা যাক এই দুটো ঘটনার মধ্যে সময়ের পার্থক্য হচ্ছে Δt_0 । যদি বলটার মাটিতে পড়তে ১ সেকেন্ড সময় লাগে তবে Δt_0 = ১ সেকেন্ড। যে কাঠামোয় আমি এই বল পড়ার ঘটনাটা পর্যবেক্ষণ করছি তার তুলনায় আমি স্থির আছি। সেটা আমার বাড়ির একটা ঘর হতে পারে। এই কাঠামোটাকে আমরা বলব আমার স্থিত বা প্রকৃত কাঠামো।

এখন ধরা যাক, কাকতালীয় ভাবে ঐ বলটা মাটিতে পড়ার সময় আমার বন্ধু স্বাতী একটি দ্রুত গতির যানে বসে আমার বাড়ির পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল এবং ঘরের জানালা দিয়ে এই ঘটনাটা পর্যবেক্ষণ করল। (স্বাতী ভিনগ্রহের অধিবাসী, স্বাতী তারার কাছের এক সৌরমণ্ডল থেকে এসেছে বলে আমি তাকে স্বাতী নাম দিয়েছি।)

সেই হাই-টেক যানের গতি ছিল বেশ, ধরা যাক তা হল u। পরে



স্বাতীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম সেই সময়ে তার আকাশ্যানের গতি ছিল আলোর গতির অর্ধেক। আলোর গতিকে যদি আমরা c দিয়ে চিহ্নিত করি, তবে u=0.5c। আমার ঘরের প্রকৃত কাঠামোর তুলনায় স্বাতী সমবেগে চলছিল, অর্থাৎ তার কোন ত্বরণ ছিল না। সেই ক্ষেত্রে বলা যায় আমার জাড্য কাঠামোর মত স্বাতীর জন্যও তার আকাশ্যান একটা জাড্য কাঠামোর ভূমিকা পালন করেছে।

যাইহোক স্বাতীর সঙ্গে পরদিন দেখা। সে বলল, 'কাল তোমার বাড়ির পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলাম। দেখি তুমি একটা বল নিয়ে খেলছ।' আমি বললাম, 'বলটা কতক্ষণে মাটিতে পড়ে তাই মাপছিলাম।' স্বাতী জিজ্ঞেস করল, 'কেন?' আমি বললাম, "মাধ্যাকর্ষণ জনিত ত্বরণ, g-এর মান জানতে ঐ সময়টা লাগবে।" স্বাতী বলল, 'খুব ভাল। তা কত সময় নিল?' আমি বললাম, 'এক সেকেন্ড।' স্বাতী বলল, 'আমার আকাশযানের যান্ত্রিক চোখ থেকে কিছু এড়ায় না। সেটার হিসেবে তোমার বল পড়তে সময় লেগেছে ১.১৫৪৭ সেকেন্ড।'

আমি বললাম, 'তা বটে। তোমার গতি ছিল আলোর গতির অর্ধেক। স্বাভাবিক ভাবেই তোমার কাঠামোতে সময়ের প্রসারণ হয়েছে। আমার $\Delta t_0 =$ ১ সেকেন্ড হচ্ছে যথার্থ বা প্রকৃত সময়, কারণ বল ছাড়া ও বলের মাটিতে আঘাত করা এই দুটো ঘটনাই আমি এক জায়গায়

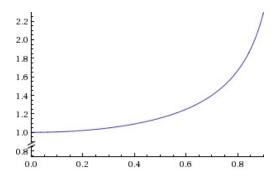
দাঁড়িয়ে মেপেছি। কিন্তু তুমি এই দুটো ঘটনা দুটো ভিন্ন জায়গা থেকে মেপেছ। তাই তোমার কালিক অন্তর যথার্থ নয়। তোমার কালিক অন্তর যদি Δt হয়, তবে আপেক্ষিকতার সূত্র অনুযায়ী

$$\Delta t = rac{\Delta t_0}{\sqrt{1-rac{u^2}{c^2}}} = rac{1}{\sqrt{1-rac{(0.5c)^2}{c^2}}} = rac{1}{\sqrt{1-0.25}} = 1.1547$$
 সেকেন্ড

অর্থাৎ তোমার বেগসম্পন্ন কাঠামোতে সময়ের প্রসারণ হয়েছে। এক অর্থে তোমার কাঠামোতে সময় শ্লথ হয়ে গিয়েছে। তুমি বলটাকে আমার থেকে আস্তে পড়তে দেখেছ।

'আমি যদি আরো জোরে যেতাম তাহলে বলটাকে তো আরো আস্তে পড়তে দেখতাম,' স্বাতী বলে।

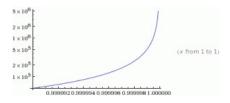
'তা বটে', আমি বলি, 'আর দেখ তোমার জন্য এই গ্রাফগুলো আমি আগেই বানিয়ে রেখেছিলাম।' এই বলে আমি নিচের ছবিগুলো স্বাতীকে দেখাই।



এখানে x-অক্ষে আলোর ভগ্নাংশে স্বাতীর গতিবেগ দেখানো হয়েছে। 0.2 মানে আকাশযানের গতি হচ্ছে 0.2c বা আলোর গতিবেগের ২০%, 0.8 হচ্ছে 0.8c বা আলোর গতিবেগের ৮০%। y-অক্ষে দেখানো হয়েছে কালিক অন্তর। y-অক্ষের একক হচ্ছে সেকেন্ড। দেখাই যাচ্ছে বল পড়ার কালিক অন্তর স্বাতীর কাঠামোর গতিবেগের ওপর নির্ভর

করে, অর্থাৎ সেটা হল গতিবেগের ফাংশান। আকাশযানের গতিবেগ যত বেশী হবে সময়ের অন্তর তত বাড়বে, স্বাতী দেখবে বলটা পড়তে বেশী সময় নিচ্ছে। আলোর গতিবেগের ৮০%-এ বলটা পড়তে সময় নেবে প্রায় ২.৮ সেকেন্ড।

'আর তুমি আলোর গতিবেগের যত কাছাকাছি যাবে কালিক অন্তর তত বেড়ে যাবে,' আমি বলি, 'নিচের গ্রাফটা দেখ।'



'তুমি যদি আলোর গতিবেগের ৯৯% বা 0.99999999c-তে ভ্রমণ করতে তবে তোমার কাছে ঐ কালিক অন্তরটা হতো $e \times 50^{\circ}$ বা $e \times 600$,০০০ সেকেন্ড। অর্থাৎ পাঁচ মিলিয়ন বা পঞ্চাশ লক্ষ সেকেন্ড। যা কিনা প্রায় $e \times 600$ দিন বা দু'মাসের সমান। আর আলোর গতিবেগে ভ্রমণ করলে সময় তোমার জন্য স্তব্ধ হয়ে যেত। বলটা ওপরেই আটকে যেত আমার হাত থেকে আর পড়ত না।'

যে কালিক অন্তর একই জায়গায় নির্ণীত হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে যথার্থ সময়। শুধুমাত্র আমার ঘড়িই আমার কাঠামোর তুলনায় স্থির আছে। কিন্তু স্বাতীর কাঠামো আমার তুলনায় গতিশীল ছিল বলে তার ঘড়ি আমার কাঠামোর তুলনায় স্থির ছিল না। কাজেই তার সময় যথার্থ সময় নয়। তাই তার সময়কে আমার তুলনায় মাপতে হবে সেই সময় শ্লুথ হবে।

সত্যিই কি তাই? আমার সময় যথার্থ আর স্বাতীর সময় যথার্থ নয়? বিষয়টিকে একটু পরিষ্কার করতে হলে আর একটু ভাবনা চিন্তার দরকার আছে।

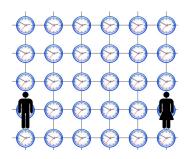
পর্ব ২:

তীর সঙ্গে বলটার ব্যাপারে আমার মতের মিল হল, কিন্তু এর পরেই একটা ব্যাপারে আমাদের দুজনের তর্ক লেগে গেল। আমি বললাম, 'তুমি তো আমার জানালার পাশ দিয়ে আলোর গতিবেগের অর্ধেক গতিতে (u=0.5c) বেড়িয়ে গেলে। আমি দুরবিন দিয়ে দেখলাম তুমি ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) কিলোমিটার দূরত্ব সেকেন্ডে পার হয়ে গেলে। আলো যেহেতু সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার যায়, তাই তোমার যান ঐ দূরত্ব পার হতে আমার ঘড়িতে ২ সেকেন্ড সময় নিয়েছে। তোমার ঘড়িতে তখন ক'টা বাজে?'

স্বাতী বলল, 'আশা করছি তুমি যে ২ সেকেন্ড সময় নির্ধারণ করেছ সেটা আমার আকাশযান যে তিন লক্ষ কিলোমিটার পার হয়েছে সেই খবরটা আবার তোমার কাছে আসতে যতটুকু সময় নিয়েছে সেটা বাদ দিয়েই মেপেছ।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তা তো বটেই। তাছাড়া আমি এমন একটা জাড্য কাঠামো ব্যবহার করছি যেখানে কিছু পথ অন্তর একটা করে ঘড়ি রয়েছে, সবগুলো ঘড়ি আবার একই সময়ে সমলয় (synchronize) করা আছে। তুমি যখন আমার জানালার পাশ দিয়ে গেলে আমার ঘড়ি যদি শূন্য সেকেন্ড দেখায় তাহলে তিন লক্ষ কিলোমিটার দূরে আমি যে ঘড়ি রেখে দিয়েছি সেই মুহুর্তে সেটাও শূন্য সেকেন্ড দেখাবে। তুমি যখন সেই তিন লক্ষ কিলোমিটার দূরের ঘড়ির পাশ দিয়ে গেলে তখন সেই ঘড়ি দু সেকেন্ড সময় দেখিয়েছে।'

আমার জাড্য ফ্রেমে এক গাদা ঘড়ি সমলয় (synchronize) করা আছে। নিচের বাঁ কোণার ঘড়িটা আমার হলে, তিন লক্ষ দূরে আর একটি ঘড়ি আছে। ২ সেকেন্ড পরে স্বাতী সেই ঘড়ির পাশ দিয়ে যাবে।



'তাহলে আমি বলি আমার দিকটা,' স্বাতী বলে, 'দুটি ঘটনা ঘটেছে। এক, আমি তোমার জানালার পাশ দিয়ে উড়ে গেছি। দুই, আমি তোমার তিন লক্ষ মিটার পার হয়েছি।'

'আমার তিন লক্ষ মিটার বলছ কেন?' আমি জিজ্ঞেস করি, 'সেটা কি তোমারও নয়?'

'দাঁড়াও,' বলে স্বাতী, 'ভাবনাগুলি একটু গুছিয়ে নিই। প্রথমত: এই দুটি ঘটনা তোমার কাঠামোয় দুটি ভিন্ন জায়গায় ঘটেছে। কিন্তু আমার আকাশযানের কাঠামোয় তারা একই জায়গায় ঘটেছে। তাই এক্ষেত্রে আমার কালিক অন্তর হচ্ছে যথার্থ বা প্রকৃত সময়, কারণ তোমার জানালার পাশ দিয়ে যাওয়া ও তোমার তিন লক্ষ কিলোমিটার পার হওয়া এই দুটো ঘটনাই আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মেপেছি। কিন্তু তুমি এই দুটো ঘটনা দুটো ভিন্ন জায়গা থেকে মেপেছ। তাই তোমার কালিক অন্তর যথার্থ নয়। তোমার কালিক অন্তর যদি $\Delta t=2$ সেকেন্ড হয়, তবে আপেক্ষিকতার সূত্র অনুযায়ী আমার কালিক অন্তর হবে,

$$\Delta t_0 = \Delta t \sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}} = 2\sqrt{1-\frac{(0.5c)^2}{c^2}} = 2\sqrt{1-0.25}$$
 = 1.73 সেকেড

তাই তুমি যখন তোমার দুটো ঘড়ির মাধ্যমে ২ সেকেন্ড সময় দেখছ, আমি ১.৭৩ সেকেন্ড সময় দেখছি।' 'তাহলে তুমি যখন তোমার ঘড়িতে ১.৭৩ সেকেন্ড সময় দেখছ, আমি আমার ঘড়িতে ২ সেকেন্ড দেখব।' আমি স্বাতীকে বলি।

'এখানেই যত ঝামেলা। উত্তরটা হচ্ছে।' স্বাতী উত্তর দেয়।

'কি বলছ তুমি?' আমি একটু রেগেই যাই স্বাতীর ওপর, 'একটু আগেই না বললে আমি যখন ২ সেকেন্ড মাপবো, তুমি ১.৭৩ সেকেন্ড মাপবে। তাহলে তুমি যখন ১.৭৩ সেকেন্ড মাপবে, আমি কেন ২ সেকেন্ড মাপবো না।'

'না, আমি তা বলি নি,' শান্ত স্বরে উত্তর দেয় স্বাতী, 'প্রথম ক্ষেত্রে তুমি যখন দেখছ আমার আকাশযান দ্রুত বেগে আকাশে ছুটে যাচ্ছে, তুমি এক জায়গায় বসে আমার সময় ও দূরত্ত্ব নির্ধারণ করতে পারবে না, তোমাকে সেই এক গাদা সিনখ্রোনাইজড (সমলিত) ঘড়ির সাহায্য নিতে হবে। আমি যখন তিন লক্ষ কিলোমিটার পার হব সেই দূরত্ত্বে বসানো একটা ঘড়ি তখন দেখাবে ২ সেকেন্ড, কিন্তু আমার আকাশযানের ঘড়ি বলবে মাত্র ১.৭৩ সেকেন্ড পার হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে তুমি নিজে ২ সেকেন্ড সময় মাপো নি, বরং তোমার কাঠামোতে এক গাদা ঘড়ি ব্যবহার করে নির্ধারণ করেছ যে আমার দু সেকেন্ড সময় লেগেছে তিন লক্ষ কিলোমিটার পার হতে। যেহেতু দুটো ঘটনা তুমি দুই জায়গা থেকে মেপেছ তোমার মাপাটা যথার্থ বা proper নয়, সেটা হবে Δt । এখানে আমার সময়টা হচ্ছে যথার্থ সময় Δt_0 । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রশ্নটা হচ্ছ উলটো। এখন আমি ১.৭৩ সেকেন্ড মাপছি এক জায়গায় বসে নয়, বরং দু-জায়গায়। তুমি কিন্তু একই জায়গায় বসে সময় দেখছ। এখন তোমার সময় হবে যথার্থ।'

'দাঁড়াও,' আমি বলে উঠি, 'আমি এটা বুঝতে পারছি তুমি যখন ভীষণ গতিতে ভ্রমণ করছ তোমার সময়ের প্রসারণ হচ্ছে যার ফলে আমার ২ সেকেন্ড তোমার ১.৭৩ সেকেন্ড হচ্ছে। এবং যেহেতু তুমি একই জায়গায় বসে তোমার সময় নির্ধারণ করছ তাই তোমার সময়কে যথার্থ সময় বলা **হচে**ছ।'

'ঠিক, স্বাতী বলে। এখন আমাদের দেখতে হবে প্রশ্নটা কাকে করা হচ্ছে। আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় — স্বাতী, তুমি যখন তোমার ঘড়িতে ১.৭৩ সেকেন্ড দেখবে তখন দ.র ঘড়িতে কত সময় দেখাবে, তাহলে আমি বলব আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাক কার সময় এখানে যথার্থ। যেহেতু এই ক্ষেত্রে আমাকে আমার কাঠামোতে ১.৭৩ সেকেন্ড মাপতে হবে সেহেতু আমাকে আমার কাঠামোতে এক গাদা সিনক্রোনাইজড ঘড়ির সাহায্য নিতে হবে, এবং সেই ক্ষেত্রে তোমার সময় হবে যথার্থ। আমি দেখব তুমি আমার থেকে দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছ এবং তুমি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে তোমার সময় মাপছ। এই ক্ষেত্রে আমার কালিক অন্তর হবে $\Delta t = 5.9$ ০ সেকেন্ড, এবং তোমার অন্তর হবে,

$$\Delta t_0 = \Delta t \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} = 1.73 \sqrt{1 - \frac{(0.5c)^2}{c^2}} = 1.73 \sqrt{1 - 0.25}$$

$$= 1.5 \quad$$
েসকেন্ড'

'এই ক্ষেত্রে প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছি আমি,' স্বাতী বলে, 'এবং আপেক্ষিকতার বোধ অনুযায়ী এবার তুমি আমার কাছ খুব দ্রুত দূরে চলে যাচছ। এবং ১.৭৩ সেকেন্ড পরে আমি তোমাকে ১.৭৩২০৫ সেকেন্ড পূরণ ১,৫০,০০০ কিলোমিটার/সেকেন্ড = ২,৫৯,৮০৮ কিলোমিটার পেছনে দেখব। আমি বলব যে তোমার ঘড়ি শ্লখ চলছে এবং সেই ঘড়িতে মাত্র ১.৫ সেকেন্ড পার হয়েছে।'

আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

স্বাতী বলতে থাকল, 'ঠিক আছে, আমি বরং একটা চার্ট (সারণী ১.১) বানাই। আমার আকাশযানের গতিবিধি দেখে তুমি (দ.) বলবে, স্বাতী ৩,০০,০০০ কিলোমিটার দূরত্ত্ব পারি দিয়েছে ২ সেকেন্ডে। এদিকে আমি (স্বাতী) বলব, তুমি যাকে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার বলছ সেটা পারি দিতে আমার (স্বাতীর) সময় লেগেছে ১.৭৩ সেকেন্ড, কিন্তু আমি

(স্বাতী) ৩,০০,০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করি নি, বরং দ. আমাকে ছেড়ে ২,৫৯,৮০৮ কিলোমিটার পেছনে চলে গেছে। আর দ.র ঘড়িতে তখন বাজবে ১.৫ সেকেন্ড।

আমি	স্বাতী (যথার্থ সময়)	অতিক্রান্ত স্থান
২ সেকেন্ড	১.৭৩ সেকেভ	৩,০০,০০০ কি.মি.
আমি (যথার্থ সময়)	স্বাতী	অতিক্রান্ত স্থান
১.৫ সেকেভ	১.৭৩ সেকেন্ড	২,৫৯,৮০৮ কি.মি.

সারণী ১.১

'এই জনেই কি এর নাম আপেক্ষিকতা?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'সে তোমরা ভাল জানো। আমি তো আর পৃথিবীর লোক নই,' স্বাতী হেসে বলে, 'তবে আপেক্ষিকতায় তোমার জন্য যা সত্যি আমার জন্য তা নয়, তোমার আর আমার ঘটনা যুগপৎ বা simultaneous নয়।'

পর্ব ৩:

পুরোনো কথা দু'একটা বলে নেই। ভিন তারার গ্রহ থেকে স্বাতী তার খুব দ্রুতগামী নভোষান নিয়ে পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছে। তার নভোষান খুব দ্রুত চলে। একবার সে আমার বাড়ির জানালার পাশ দিয়ে আলোর গতির অর্ধেক গতি নিয়ে উড়ে গেল। এই উড়ে যাবার মূহুর্তে আমার ঘরের ঘড়ি ০ সেকেন্ড দেখাল, অন্যদিকে স্বাতীও তার নভোষানের ঘড়ির মান ০ সেকেন্ড করে দিল। এই উড়ে যাওয়ার পর আমার ঘড়িতে যখন ২ সেকেন্ড সময় যাবে, তখন আমার কাঠামোতে স্বাতীর ঘড়িতে ১.৭৩ সেকেন্ড সময় দেখাবে। এইখানে 'আমার কাঠামো' কথাটা প্রয়োজনীয়, কারণ স্বাতীর কাঠামোতে 'আমার ঐ সময়ে' স্বাতী কি সময় দেখছে সেটা আমি জানতে পারব না। অন্যদিকে স্বাতীর কাঠামোতে আমার

ঘড়িতে তখন ১.৫ সেকেন্ড বাজবে, ১.৭৩ সেকেন্ড নয়। স্বাতীর কাঠামোতে যখন স্বাতীর ঘড়ি ১.৭৩ সেকেন্ড দেখাচ্ছিল, আমার কাঠামোতে তখন আমার ঘড়ি কত সময় দেখাচ্ছিল সেই প্রশ্নটা করা যাবে না। কারণ এটার যদি কোন উত্তর থাকে তাহলে পরম বা absolute দেশ-কালের একটা নিউটনীয় ধারনা সত্য হবে। আমরা জানি, আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বলে যে পরম দেশ-কাল বলে কিছু নেই।

স্বাতীর সঙ্গে যখন ওপরের প্রপঞ্চ নিয়ে কথা হচ্ছে, সেই সময় মৃত্তিকা রাণী এসে উপস্থিত। স্বাতীকে নিয়ে তার আবার কিছু ঈর্ষাপরায়ণতা আছে। মৃত্তিকা উদ্ভিদবিদ, আপেক্ষিকতা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। সেবলল, 'তোমরা কি নিয়ে কথা বলছ?'

আমি বললাম, 'আপেক্ষিকতা নিয়ে।'

মৃত্তিকা বলল, 'তারপর?' আমি বললাম, 'স্বাতীর সঙ্গে একটা বিষয়ে তর্ক হচ্ছে।'

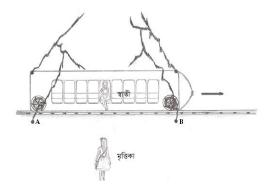
তর্কের বিষয়বস্তুটা তাকে বলার পর মৃত্তিকা বলল, 'হুঁ'। হুঁ-টা যেন একটু তাচ্ছিল্য মেশানো ছিল। আমি বললাম, 'হুঁ মানে?'

'হুঁ মানে তোমরা পদার্থবিদরা সরল জিনিসকে জটিল করে দাও।' 'তার মানে?'

'মানে খুব সহজ,' বলে মৃত্তিকা, 'তোমরাই তো বললে এটা আপে-ক্ষিকতা। তুমি আর স্বাতী দুটো জাড্য কাঠামোতে বসে এক অপরের কার্যাবলী দেখছ। দুটো কাঠামোর কোনটাই বিশেষ নয়। তোমার মনে হবে স্বাতী সেকেন্ডে ১৫০,০০০ কিলোমিটার বেগে সামনে চলে গেল, স্বাতী ভাবল তুমি সেকেন্ডে ১৫০,০০০ কিলোমিটার বেগে পেছনে চলে গেলে। তোমার ফ্রেমে স্বাতীর ঘড়ি শ্লথ চলবে, আর স্বাতীর ফ্রেমে তোমার ঘড়ি শ্লথ চলবে, এটা না বোঝার কি হল?'

সত্যিই তো! এটা তো বোঝারই কথা। আমার ঘড়িতে যখন ২ সেকেন্ড বাজবে, আমার কাঠামোতে স্বাতীর ঘড়িতে তখন ১.৭৩ সেকেন্ড বাজবে, তেমনই স্বাতী যখন তার ঘড়িতে ২ সেকেন্ড দেখবে তার কাছে মনে হবে আমার ঘড়িতে ১.৭৩ সেকেন্ড বেজেছে। আমাদের দুজনের কাঠামোর মধ্যে একটা প্রতিসাম্য তো বজায় থাকবে। তাই স্বাতী তার ঘড়িতে ১.৭৩ সেকেন্ড দেখবে, সে ভাববে আমি ১.৫ সেকেন্ড দেখছি।

একজন উদ্ভিদবিদের কাছে সহজ ব্যাখ্যা শুনে আমি ও স্বাতী দুজনেই একটু দমে গেলাম। মৃত্তিকা মুখ বাঁকিয়ে হাসল। তারপর বলল, 'তোমরা পদার্থবিদরা সহজ জিনিসকে জটিল করে ফেল। যেমন তোমরা বলছ দুটি ঘটনা যদি একজনের ফ্রেমে যুগপৎ অর্থাৎ একই সঙ্গে ঘটে থাকে, সেটা আর একজনের কাঠামোতে যুগপৎ হবে না। কিন্তু তোমরা ট্রেনের উদাহরণটা কেন দিচ্ছ না? স্বয়ং আইনস্টাইন তো যুগপৎ ঘটনার একটা ব্যাখ্যা দিতে রেলগাড়িকে ব্যবহার করেছেন। জান না যে পৃথিবীর তাবৎ পাঠ্যপুস্তক সেই উদাহরণটাই ব্যবহার করে?'



চিত্র ১.১: মৃত্তিকার কাঠামোতে, ট্রেনের বাইরে প্ল্যাটফর্মের দু'পাশে, মৃত্তিকা ও স্বাতীর থেকে সম দূরত্বে, একই সময়ে দুটি বজ্রপাত হল।

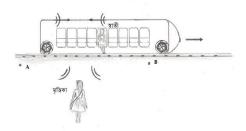
সত্যিই তো, ভাবলাম আমি। বললাম, 'দাঁড়াও, দেখি আমি এই ঘটনাটা বর্ণনা করতে পারি কিনা। মনে কর একটা রেলগাড়ি বেশ জোরে পশ্চিম থেকে পূব দিকে যাচ্ছে সমবেগে। ট্রেনের একদম মাঝখানে স্বাতী বসে আছে। ধর কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেনটা একটা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম পার হচ্ছে। প্ল্যাটফর্মটার দৈর্ঘ্য ট্রেনের সমান। আরো ধরা যাক প্ল্যাটফর্মের ঠিক মাঝখানে তুমি মৃত্তিকা দাঁড়িয়ে আছ। আর ট্রেনটার সামনের দিকটা ঠিক প্ল্যাটফর্মের সামনের দিকের সমান। ঠিক সেই সময়ই মৃত্তিকার ঘড়ি অনুযায়ী দুটো বজ্রপাত হল যেটা কিনা ট্রেনের ঠিক সামনে ও ঠিক পেছনে প্ল্যাটফর্মটাকে ঝলসে দিল কালো দাগে। পেছনের দাগটা হল A আর সামনের দাগটা হল B। মৃত্তিকার কাছে এই বজ্রপাতদুটো একই সময়ে দেখা যাবে। কারণ A ও B বিন্দু দুটি তার থেকে সম দূরত্বের। কাজেই বজ্রপাতের ঝলকানি তার কাছে আলোর গতিবেগে যতটুকু সময় লাগে সেই সময়ের পরে যুগপৎ ভাবে এসে পৌঁছাবে। যদিও এই ঘটনাদুটো মৃত্তিকার কাছে যুগপৎ, কিন্তু স্বাতীর কাছে সে দুটি যুগপৎ নয়।'

আমি একটু দম নেই। স্বাতী আর মৃত্তিকাদুজনেই চুপ করে থাকে। এগুলো তাদের কাছে অজানা জিনিস না।

আমি আবার বলতে শুরু করি, 'ধরা যাক স্বাতীর ট্রেনটা বেশ জোরে যাচ্ছে। তাহলে স্বাতী B'র ঘটনাটা আগে দেখবে, কারণ B'র ঘটনাটা বহন করে যে আলোক তরঙ্গ স্বাতীর দিকে আসছে তার ট্রেনও সেদিকে ছুটে যাচ্ছে। আর A থেকে যে আলোক তরঙ্গ আসছে সেটাকে আর একটু বেশী দূরত্ব পার হতে হচ্ছে। স্বাতী ভাববে B'র ঘটনাটা আগে ঘটেছে, অর্থাৎ বজ্রপাতটা সেখানে A'র আগেই ঘটেছে। এখন যেহেতু স্বাতীর ট্রেন সমবেগে যাচ্ছে, আপেক্ষিকতার একটা পস্টুলেট বা স্বীকার্য অনুযায়ী স্বাতীর কাঠামোটা হল একটা জাড্য কাঠামো, স্বাতীর পক্ষেকোন ধরনের পরীক্ষা করা সম্ভব নয় যা দিয়ে কিনা সে বুঝতে পারে সে দ্রুতগতিতে ভ্রমণ করছে এবং প্ল্যাটফর্মের কাঠামোয় A ও B'র ঘটনা যুগপেং।'

স্বাতী বলল, 'কিন্তু আমার ফ্রেম যদি জাড্যই হয় আমার কি ঐ দুটো ঘটনা, অর্থাৎ A ও B'র ঘটনা একসাথে দেখার কথা নয়?'

আমি বললাম, 'তুমি দুটো ঘটনা একসাথে দেখতে যদি ঐ আলো তোমার ট্রেনের দুপাশ থেকে নির্গত হত। অর্থাৎ মনে করে ট্রেনের দুপাশে দুটো টর্চ বাতি বা লেজার আছে। সে দুটো বাতি ট্রেনের



চিত্র ১.২: স্বাতীর কাছে A ও B থেকে আলো ভিন্ন সময়ে এসে পৌঁছাবে। স্বাতী ভাববে B'র ঘটনা A'র আগে ঘটেছে। এই ধারনাটা স্বাতীর কাঠামোতে ঠিক, মৃত্তিকার কাঠামোতে নয়। মৃত্তিকা ভাববে স্বাতীর ট্রেনের গতিমুখের জন্য স্বাতী ভিন্ন সময়ে A ও B'র ঘটনা দেখছে। দুটো ধারনাই সঠিক তাদের নিজের কাঠামোতে।

সাথেই ভ্রমণ করছে। সেই দুটো যদি একই সময়ে জ্বলে উঠত তাহলে তুমি একই সময়ে ঐ দুটো ঘটনা দেখতে। সেইক্ষেত্রে সে দুটো যুগপৎ হত। কিন্তু বজ্রপাত দুটো তোমার ট্রেনের সাথে ভ্রমণ করছিল না, তা-দের উৎস ট্রেনের বাইরে, তাই জন্য তুমি তাদের একসাথে দেখবে না।

মৃত্তিকা বলল, 'কিন্তু বজ্রপাতের ক্ষেত্রে, আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দেখব যে স্বাতীর কাছে A ও B থেকে আলো বিভিন্ন সময়ে পোঁছেছে। B'র আলো আগে পোঁছাবে, A'র আলো পরে। কিন্তু এই ঘটনাটার ব্যাপারে আমাদের উপসংহার ভিন্ন হবে। আমি যেখানে বলব, A'র থেকে আগত আলোকে বেশী পরিমাণ পথ যেতে হয়েছে বলে স্বাতী A'র ঘটনাটা পরে দেখছে, স্বাতী বলবে আসলে A'র ঘটনাটা পরে ঘটেছে বলে সে সেটা পরে দেখছে। এখানে কারুর ধারনাই বেঠিক নয়। দুটো ধারনাই দুজনের কাঠামোতে আলাদা আলাদা ভাবে ঠিক। কারণ প্রতিটি জাড্য ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়ম একই ভাবে সংঘঠিত হবার কথা। আইনস্টাইন যখন তার বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব রচনা করেন তিনি দুটি মৌলিক স্বীকার্য, যার ইংরেজি হচ্ছে, সমস্ত জাড্য কাঠামোতে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী একই থাকবে।'

'তাহলে জাড্য কাঠামোর সংজ্ঞাটাও দিয়ে দাও,' আমি বলি।

'আমি যেরকম বুঝি সেভাবেই বলছি,' মৃত্তিকা বলে, 'জাড্য বা জড়-ত্বীয় কাঠামোতে দেশ (স্থান) ও কাল (সময়) সমসত্ত্ব হবে, অর্থাৎ দেশ ও কাল একই ভাবে বইবে ও দিক-নির্ভর হবে না। আর প্রতিটি জাড্য কাঠামো অন্য একটি জাড্য কাঠামোর অনুপাতে ত্বরণ-শীল হবে না, অর্থাৎ একটি কাঠামো অন্য কাঠামোর তুলনায় একই গতিবেগে চলবে। আর যেই কাঠামোতে ত্বরণ নেই, সেই কাঠামোর মধ্যে বসে সেই কাঠামো যে গতিশীল সেটা কোনভাবেই বোঝা যাবে না।'

'তুমি বলছ আমি যদি একটা বদ্ধ ঘরে থাকি আর ঘরটা যদি সম গতিতে ভ্রমণ করে আমি কোন ধরণের পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারব না যে আমার ঘরটা ভ্রমণ করছে।'

'না, কারণ স্থির থাকা আর সমগতিতে ভ্রমণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দুটো কাঠামোতেই পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলো একই ভাবে খাটবে। যদি না খাটে তাহলে তো সমূহ বিপদ।'

'তা বটে,' আমি স্বীকার করলাম।

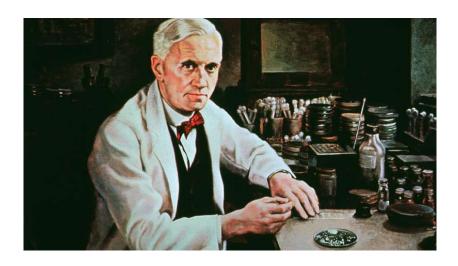
দ্ৰষ্টব্য:

- 🗞 লেখাটি পূর্বে ফেসবুক নোট হিসেবে প্রকাশিত।
- 🗞 ফিচার ছবির উৎস Wallpaper Flare।



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

§ ২



পেনিসিলিন এর জন্ম নিয়ে দু'কথা

কে এম শরীফুল ইসলাম

৯২৮ এর সেপ্টেম্বরের এক সকাল। তার কান্ট্রি হাউজ ধুনে $({
m The~Dhoon})$ ছুটি কাটিয়ে ফ্লেমিং তার কাজে ফিরলেন সেইন্ট মেরি হাসপাতালে। ছুটিতে যাওয়ার আগে তিনি কিছু পেট্রি-ডিশ রেখে যান তার কাজ করার বেঞ্চের এক পাশে যেন তার অনুপস্থিতিতে তার সহকর্মী Stuart Craddock তার বেঞ্চে কাজ করতে পারেন। ছুটি থেকে ফিরে আলেকজান্ডার তার দীর্ঘ দিনের পড়ে থাকা পেট্রি-ডিশগুলো দেখছিলেন এবং বাছাই করছিলেন কোন প্লেটগুলো তিনি ব্যবহার করতে পারবেন। এগুলোর বেশীর ভাগই ছিল দূষিত (contaminated)। ফ্লেমিং প্রতিটি ডিশকে লাইজলের ট্রেতে চুবিয়ে রাখলেন জীবাণুমুক্ত করতে। একদিন ডিশের গাদা থেকে ডিশগুলো বাছাই করার সময় তাঁর সাবেক সহকারী, D. Merlin Pryce, তার সাথে দেখা করার জন্যে আসলেন। ফ্লেমিং এই সুযোগে প্রাইস চলে যাওয়াতে তাকে কি পরিমাণ অতিরিক্ত কষ্ট করতে হয়েছে এ নিয়ে অভিযোগ করে বসলেন। প্রমাণ দেখাতে তিনি তার লাইজলে রাখা প্লেটগুলো থেকে কয়েকটা খুজে বের করলেন যেগুলোতে লাইজল লাগেনি। বলে রাখা দরকার যে লাইজল জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে। নির্দিষ্ট একটা প্লেট খুজে তিনি যখন প্রাইসকে দেখাতে যাচ্ছিলেন তখন তিনি একটা অবাক করা কিছু খেয়াল করলেন। তিনি দেখলেন যে তার প্লেটে এক ধরণের ছত্রাক জন্মেছে,যেটা আসলে ততোটা অবাক হওয়ার মত ব্যাপার না। যাইহোক, ফ্লেমিং এর কাছে মনে হল যে এই ছত্রাক ডিশে থাকা $Staphylococcus\ aureus$ কে ধ্বংস করতে পারে। তিনি এই ছত্রাক এর ক্ষমতা নিয়ে মোটামটি একটা আন্দাজ কর্লেন।

ফ্লেমিং এই ছত্রাকটি জন্মানোর জন্যে এবং এর কি উপাদান ব্যাক্টেরিয়ার প্রাণ নাশক হিসেবে কাজ করে তা জানতে আরো কয়েক সপ্তাহ ব্যায় করেন এবং ছত্রাক বিশেষজ্ঞ (Mycologist) C. J. La Touche (যার অফিস ছিল ফ্লেমিং এর নিচ তলায়) এর সাথে যোগাযোগ করে তিনি নিশ্চিত হলেন যে ছত্রাকটি ছিল পেনিসিলিয়াম। আর তাই ফ্লেমিং ছত্রাকের কার্যকর ব্যাক্টেরিয়া প্রতিরোধি উপাদানের নাম দেন পেনিসিলিন

(penicillin) |

কিন্তু ছত্রাকটি এসেছিলো কোথা থেকে?

খুব সম্ভবত নিচতলায় La Touche এর অফিস থেকেই। La Touche তখন জন ফ্রিম্যান এর জন্যে ছত্রাকের বিশাল স্যাম্পল সংগ্রহ করছিলেন যিনি অ্যাযমা নিয়ে গবেষণা করছিলেন এবং হয়-তো সেখান থেকে কিছু ছত্রাক উড়ে গিয়ে ফ্রেমিং এর প্লেটে বাসা বাধে।

ফ্লেমিং তারপর এই ছত্রাকটি নিয়ে অসংখ্য পরীক্ষা করেন এবং ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়ার উপর প্রয়োগ করেন এবং বিশ্ময় নিয়ে দেখলেন যে তা ব্যাক্টেরিয়াগুলোকে প্রচুর পরিমাণে ধ্বংসও করতে পারে। তিনি আরো কিছু ভিন্ন পরীক্ষা করে দেখেন যে এই ছত্রাকগুলো নন-টক্সিক। ফ্লেমিং তার 'wonder drug' এর সন্ধানে ছিলেন। এটাই কি তার সেই 'wonder drug'? না, ফ্লেমিং এর কাছে তা মনে হয়নি। যদিও তিনি জানতেন যে এই ছত্রাক এর কিছু সম্ভাবনা আছে কিন্তু রসায়নবিদ না হওয়ায় তিনি কার্যকর ব্যাক্টেরিয়া প্রতিরোধী উপাদান (active antibacterial element) penicillin কে আলাদা করতে এবং উপাদানটিকে মানব শরীরে ব্যবহার উপোযোগী করার জন্যে দীর্ঘক্ষণ কার্যকর রাখতে ব্যর্থ হন।

বারো বছর পর

সাল ১৯৪০, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় বছর। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এর দু'জন বিজ্ঞানী,অস্ট্রেলিয়ান Howard Florey এবং জার্মান Ernst Chain পেনিসিলিন নিয়ে কাজ শুরু করলেন। নতুন রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যাবহারের মাধ্যমে তাঁরা পেনিসিলিয়াম থেকে এক ধরণের বাদামী বর্ণের পাওডার তৈরী করতে সক্ষম হলেন যেটা তার ব্যাক্টেরিয়াকে ধ্বংস

করার ক্ষমতা অনেক দিন ধরে রাখতে পারে। তাঁরা এই পাওডারটি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এবং দেখতে পান যে এটির ব্যবহার নিরাপদ। শীঘ্রই যুদ্ধে চিকিৎসায় এর চাহিদা বাড়তে লাগলো এবং সাথে সাথে এর উৎপাদন ও।

চিকিৎসায় পেনিসিলিনের উপস্থিতির কারণে অনেক প্রাণ বাঁচল যা হয়ত পেনিসিলিন ছাড়া সম্ভব হতোনা কারণ অনেক সামান্য ক্ষতও এর আগে প্রাণঘাতী ছিল। পেনিসিলিন বর্তমানে ডিফথেরিয়া, গ্যাংগ্রীন,নিউমোনিয়া, সিফিলিস,যক্ষা সারাতেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

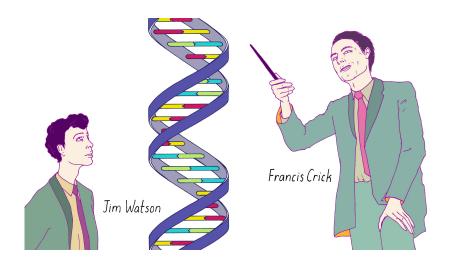
যদিও ফ্লেমিংই পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন কিন্তু Howard Florey আর Ernst Chain এর অবদান ছাড়া তিনি এটাকে ব্যাবহার যোগ্য করতে পারতেন না। ১৯৪৫ এ যদিও তিনজনকেই নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়, তথাপি ফ্লেমিংকেই এখনো পেনিসিলিন এর আবিষ্কর্তা হিসেবে সম্মান জানান হয়।

তথ্যসূত্র

- ♦ Jennifer Rosenberg. Alexander Fleming Discovers Penicillin – about.com guide.
- 🗞 ফিচার ছবিসূত্র: Britannica.



§ o



DNA'র গঠন আবিস্কার: ছেলের কাছে ফ্রান্সিস ক্রিকের চিঠি

সাদিয়া মুসাররাত, খান তানজীদ ওসমান



৯৫৩ সালে বিলেতি জীববিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক তার ১২ বছর বয়সী সন্তান মাইকেল কে নিজেদের সাম্প্রতিক একটি অসাধারন আবিষ্কারের বর্ণনা দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিতে ক্রিক এঁকেছেন এমন একটি গঠন, যা সম্ভবত এযাবৎকালে সবচেয়ে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চিত্রকর্ম- DNA এর গঠন (যার জন্য ১৯৬২ সালে ক্রিক এবং অন্যন্যরা পেয়েছিলেন নোবেল পুরষ্কার)। উল্লেখ্য, 'নেচার' পত্রিকায় পাঠানোর আগেই DNA এর গঠনের বর্ণণা দিয়ে নিজের ১২ বছর বয়সী ছেলেকে চিঠিটি লিখেছিলেন ক্রিক। সেজন্য, DNA এর গঠনের বর্ণনা করা প্রথম কোনো লিখিত পত্র এটি এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

গত ১০ই এপ্রিল (২০১৩) মাইকেল ক্রিক (ছেলে) চিঠিটি অকশনে তুলেছিলেন নিউ ইয়র্কে। একজন অজানা ক্রেতা কিনে নেন ৫.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে; বাড়তি খরচসহ মোট খরচ আসে ৬ মিলিয়ন ডলার। অকশনে অর্জিত অর্ধেক টাকা দান করা হবে সান ডিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়ার অবস্থিত Salk Institute of Biological Studies এ, যেখানের প্রফেসর ছিলেন ফ্রান্সিস ক্রিক। অকশনের চিঠিটির দাম হারিয়ে দিয়েছে এর আগের রেকর্ড গড়া আব্রাহাম লিঙ্কনের একটি চিঠিকে যেটা বিক্রি হয়েছিল মোট ৩.৪ মিলিয়ন ডলারে।

মজার বিষয় হচ্ছে, নোবেল পুরস্কারের মেডেলটিও অকশনে উঠেছিল,

কিন্তু সেটা এই চিঠির চেয়ে কম দামে বিক্রি হয়েছে (মাত্র ২.৩ মিলিয়ন ডলারে)। সে যাই হোক, পয়সা দিয়ে এই চিঠির মূল্য কখনই নির্ধারণ করা যায়না, বিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিঠিগুলির একটি হলো এই হাতে লেখা চিঠিটি।

এখানে, ফ্রান্সিস ক্রিকের নিজহাতে লেখা চিঠিটির মূল-ছবিসহ বঙ্গানুবাদ করা হলো। (দ্রষ্টব্যঃ ব্র্যাকেটের ভেতরে লেখাগুলি মূল লেখায় ছিলনা।)

ফ্রান্সিস ক্রিকের চিঠি

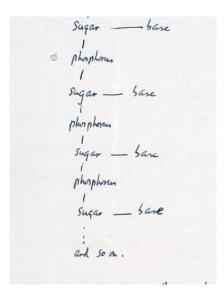
১৯ পর্তুগাল প্লেস কেমব্রিজ ১৯ মার্চ '৫৩

প্রিয় মাইকেল,

জিম ওয়াটসন এবং আমি সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূণর্ আবিস্কারটি করেছি। আমরা ডিঅক্সি-রাইবো-নিউক্লিইক-এসিডের (নামটা লক্ষ্য কর, এটাকে ছোট করে বলে DNA) গঠনের একটি মডেল তৈরি করেছি। তোমার হয়তো মনে আছে আমাদের বংশগতি বহন করা ক্রোমোজমে (chromosome) জিনের (gene) কথা- যেগুলি DNA এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত।

আমাদের গঠনটি অদ্ভুত সুন্দর। DNA কে মোটামুটি চ্যাপ্টা পুঁতির লম্বা চেইন হিসেবে দেখতে পারো। চ্যাপ্টা পুঁতিগুলোকে বলে বেইস (base)। ফর্মুলাটি মোটামুটি এইরকমঃ (চিত্র ৩.১)

এখন আমরা এরকম দুইটি চেইন পাই যারা একে অপরকে পেঁচিয়ে আছে- প্রতিটা একটা হেলিক্স (helix)- এবং চেইনের যে অংশ সুগার



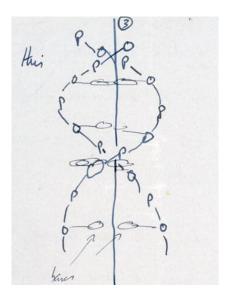
চিত্ৰ ৩.১

এবং ফসফরাস থাকে তারা হেলিক্সের বাইরের দিকে থাকে এবং বেইসগুলো ভেতরের দিকে থাকে। আমি খুব ভাল আঁকতে পারছিনা, কিন্তু এটি মোটের উপর এইরকমঃ (চিত্র ৩.২)

মডেলটা আসলে এরচেয়েও অনেক সুন্দর দেখতে।

এখন উত্তেজনাকর ব্যাপার হল, যেই চারটি বেইস আমরা খুঁজে পাই তারা একটি নিদ*ি*র্ষ্ট বিন্যাসে জোড়া (pair) তৈরি করে। এই বেইসগুলোর নামও আছে- এডিনিন, গুয়ানিন, থাইমিন এবং সাইটোসিন। আমি এগুলিকে ডাকবো যথাক্রমে- A, G, T এবং C। এখন আমরা খুঁজে পেয়েছি যে একটি চেইনের একটি বেইসের সাথে আরেক-টি চেইনের আরেকটি বেইসের মধ্যে জোড়াগুলি হয় এভাবেঃ (চিত্র ৩.৩)

শুধুমাত্র A এর সাথে T এবং G এর সাথে C।



চিত্ৰ ৩.২

fixed	, then	the	in	der on		
alo	hices .	For	ex	cample.		
goe l	then	the s	cand	umi do		
A		- 4	-	T		
T			-	A		
C	-	-4-	-	G		
A	- 1		,	T		
G			_	C		
Т				A		
Ť				A		

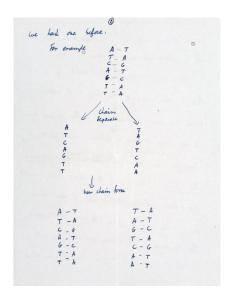
চিত্ৰ ৩.৩

এখন পযর্স্ত মনে হচ্ছে, (DNA দ্বিসূত্রক গঠনে) একটি চেইনের বেইসগুলি কোন নির্দিষ্ট বিন্যাস মানেনা; কিন্তু একটি চেইনের বিন্যাস যদি অনড় (fixed) রাখা হয় তবে অন্য চেইনের বিন্যাসটিও অনড় হবে। মনে করি, প্রথম চেইন যদি গঠিত হয় এভাবে (তীর চিহ্নু দিয়ে দেখানো হচ্ছে লেটারের বামপাশের চেইনটিকে) তবে দ্বিতীয় চেইনটা অবশ্যই এরকম হতে হবে (তীর চিহ্নু দিয়ে দেখানো হচ্ছে লেটারের ডানপাশের চেইনটাকে)।

এটা একটি কোড (code) বা সূত্রের মত। তোমাকে যদি একটি সেটের অক্ষরগুলি দেয়া হয় তবে তুমি অন্যটির অক্ষরবিন্যাসও লিখতে পারবে।

এখন আমরা বিশ্বাস করি DNA হলো একধরনের কোড। বেইসের বিন্যাসে পার্থক্য একটি জিন (DNA) থেকে আরেকটি জিনকে পৃথক করে (যেমন একটা বইয়ের পাতার প্রিন্ট আরেকটা পাতা থেকে ভিন্ন হয়)। তুমি এখন দেখতে পাবে কিভাবে প্রকৃতি জিনের কপি বা প্রতিলিপি তৈরি করে। যেহেতু DNA চেইনগুলি পোঁচানো অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে দুইটি একক চেইন তৈরি করতে পারে, এবং প্রতিটি চেইন অন্য একটি (বিপরীত বেইস দিয়ে তৈরি, যেমন A এর জায়গায় T, G এর যায়গায় C) চেইনকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে পারে, সেহেতু, অবশ্যই A এর সাথে T এবং G এর সাথে C জোড় বাঁধার নিয়মের কারনে আমরা দুইটি DNA এর প্রতিলিপি পাবো (যেখানের প্রত্যেকটি নতুন DNA তে [দ্বিসূত্রক] একটি নতুন চেইন থাকবে)। যেমনঃ (চিত্র ৩.৪)

অন্য কথায়, আমাদের মতে, আমরা এমন একটি মৌলিক প্রতিলিপি তৈরির পদ্ধতির সন্ধান পেয়েছি যা দিয়ে একটি জীবন থেকে আরেকটি জীবন তৈরি হয়। আমাদের মডেলটির সৌন্দর্য্য এই জায়গায় যে, মডে-লটির আকৃতির কারনে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট জোড়গুলিই (বেইসের) একটির সঙ্গে আরেকটি বন্ধন তৈরি করবে; বেইসগুলি হয়তো অন্যভাবে জোড়



চিত্ৰ ৩.৪

তৈরি করতে পারতো যদি তারা স্বাধীনভাবে ভেসে বেড়াতো। আমরা যে খুবই উত্তেজিত সেটা নিশ্চয়ই তুমি বুঝছো। আমাদের অবশ্যই দুই একদিনের মধ্যে একটি চিঠি 'নেচার' পত্রিকায় পাঠাতে হবে। খুব সতর্কতার সাথে এটা পড় যেন তুমি বুঝতে পারো। তুমি যখন বাসায় আসবে তোমাকে আমরা মডেলটি দেখাবো।

অনেক অনেক আদর, বাবা।



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

§ 8



সুন্দরবন বাঁচাও

ফৌজিয়া আহমেদ

ন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন। বাংলাদেশের একটি অমূল্য সম্পদ যার কোন কিছুর বিনিময়েই কোন ক্ষতি করা যায় না। অথচ আজ সামান্য বিদ্যুতের কি অন্ধ মোহে আমরা ভুলতে বসেছি এর অবদানকে। বছরের পর বছর এটি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঢাল হিসেবে কাজ করেছে। দেশের জন্য বারবার এনে দিয়েছে গৌরব ও সম্মান। ১৯৯২ সালের ২১শে মে সুন্দরবন রামসার স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৯৭ সালে ইউনেক্ষো এটিকে "বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান" এর অন্তর্ভুক্ত করে। সুন্দরবনে রয়েছে সামুদ্রিক স্রোতধারা, কাদা চর এবং ম্যানগ্রোভ বনভূমির লবণাক্ততাসহ ছোট ছৌপ। দেশের অন্তত ৪০ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল সুন্দরবনে জালের মতো ছড়িয়ে আছে ৪৫০টি নদী ও খাল। এর জীববৈচিত্র্যের ভান্ডার অন্যান্য অনেক বনকেও হার মানায়।

২০০৭ সালে "জলবায়ুর পরিবর্তন ও বিশ্ব ঐতিহ্যের পার্চ" শীর্ষক ইউনেক্ষোর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মানবসৃষ্ট অন্যান্য কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের যে ৪৫ সে.মি. উচ্চতা বৃদ্ধি হয়েছে, তা সহ মানবসৃষ্ট আরও নানাবিধ কারণে সুন্দরবনের ৭৫ শতাংশ ধংস হয়ে যেতে পারে (জলবায়ু পরিবর্তনের উপর আলোচনায় প্রকাশিত আন্তঃসরকার পরিষদের মত অনুযায়ী ২১ শতকের মধ্যেই)। এর আগেই আমরা নিজেরাই যেন নেমেছি সুন্দরবন ধ্বংসের পায়তারা করতে। গৃহপালিত পশু হিসেবে হরিণ পালনের অনুমোদন, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা কমে যাওয়া, সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে নৌযান চলাচল শুরু করার মতো ভ্রমকির পাশাপাশি বর্তমানে সুন্দরবনের জন্য সবচেয়ে বড় ভ্রমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে সুন্দরবন থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রস্তাব।

ভারতীয় কোম্পানি এনটিসিপির সাথে বাংলাদেশের যৌথ বিনিয়োগ চুক্তি হয় রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াটের কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের। সুন্দরবনের ওপর এর পরিবেশগত প্রভাব ভয়াবহ যা চুক্তি করার আগে বিবেচনায়ই আনা হয়নি। এর ফলাফল স্বরূপ ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাবে সুন্দরবন যাকে পরে শত চেষ্টাতেও আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। সামান্য বিদ্যুতের জন্য আমরা যা হারাচ্ছি তা কি আমরা জানি?

১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এর পাশাপাশি আমরা কি পাচ্ছি?

১) কৃষিক্ষেত্রে:

- প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার ৯৫ শতাংশই কৃষি জমি ও চারপাশের ১০ কি.মি ব্যাসার্ধের এলাকার ৭৫ শতাংশ কৃষি জমি যেখানে চিংড়ি, ধান ও অন্যান্য ফসল চাষ করা হয়। এছাড়া বনের সাথে সংযোগ থাকায় এলাকার নদী ও খাল স্বাদু ও লোনা পানির মাছের সমৃদ্ধ ভান্ডার। বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের ফলে প্রকল্প এলাকায় ধান, মাছ, গৃহপালিত পশুপাখি ইত্যাদির উৎপাদন ধ্বংস হবে।
- ৡ বিভিন্ন ধরণের নির্মাণ কাজ, ড্রেজিং, বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক ও তৈল নি:সরণ ইত্যাদির ফলে পশুর ও মাইদারা নদী, সংযোগ খাল, জোয়ার-ভাটার প্লাবণ ভূমি ইত্যাদি এলাকার মৎস আবাস, মৎস চলাচল ও বৈচিত্র ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ৮টি ইউনিয়নের প্রায় ৪০ টি ইউনিয়নের ৭/৮ হাজার পরিবার ক্ষতির শিকারহবে।

২) জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব:

ৡ জালের মতো ছড়িয়ে থাকা খাল ও নদী জৈববৈচিত্র্য ও ভারসাম্য রক্ষা করে। নৌযান চলাচল, তেল নি:সরণ, শব্দদূষণ, আলো, বর্জ্য নি:সরণ ইত্যাদির কারণে সুন্দরবনের জীববৈবিত্র্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিশেষ করে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, ডলফিন, ম্যানগ্রোভ বন ইত্যাদির উপর ক্ষতিকর প্রভাব

ফেলবে।

- ৡ রাতে জাহাজ চলের সময় জাহাজের সার্চ লাইটের আলো নিশাচর
 প্রাণী সহ সংরক্ষিত বনাঞ্চল সুন্দরবনের পশু-পাথির জীবনচক্রের
 উপর মারাত্বক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে ইত্যাদি।

৩) বায়ূ দূষণ:

যেমন আর্সেনিক, পারদ, সীসা, নিকেল, ভ্যানাডিয়াম, বেরিলিয়াম, ব্যারিয়াম, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, সেলেনিয়াম, রেডিয়াম মিশে থাকে।

8) পানি দূষণ:

- ৡ নির্মাণ স্থলের নিকটবর্তি নদী–খালের পানিতে নির্মাণ যন্ত্রপাতি ও

 যানবাহনের তেল নি:সরিত হয়ে পানি দৃষণ ঘটাতে পারে।
- ভুজিং এর ফলে নদীর পানি ঘোলা হবে। ড্রেজিং সঠিক ভাবে
 নিয়য়্রণ করা না হলে তেল গ্রীজ ইত্যাদি নি:সৃত হয়ে নদীর
 পানির দৃষিত হবে।
- ৡ পশুর নদী থেকে ঘন্টায় ৪০০০ মিটার পানি প্রত্যাহারের ফলে
 পানির লবণাক্ততা, নদীর পলি প্রবাহ, প্লাবন , জোয়ার ভাটা,
 মাছ সহ নদীর উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ ইত্যাদির উপর বিরূপ
 প্রভাব ফেলবে।

৫) শব্দ দূষণ:

নির্মাণ কাজের যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ব্যাবহারের ফলে শব্দ দূষণ হবে। এক্ষেত্রেও নির্মাণ পর্যায়ে শব্দ দূষণের মাত্রা সুন্দরবন ও প্রকল্পের চারপাশের পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।

৬) স্বাস্থ্যগত ঝুকি:

- ৡ সালফার ডা্ই অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে অ্যাসিড রেইন হওয়ার আশংকা বেড়ে যাবে। অ্যাসিড রেইন হলে এলাকার জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এলাকাবাসীর মধ্যে নানা ধরনের রোগ দেখা দেবে।
- ৡ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত ভারী ধাতুসমূহ ক্যান্সার সহ নানাবিধ রোগের কারণ যা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

সর্বোপরি বলা যায়, মাত্র ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের জন্য আমরা যা হারাবো তা কোন সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না। সুন্দরবন আমাদেরকে মায়ের মতো আগলে রেখেছে। আজ সামান্য স্বার্থে আমরা মাকে ভুলে গিয়ে ধ্বংসের চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছি যার ফলাফল আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তাই আমাদের নীতিনির্ধারকদের কাছে আকুল অনুরোধ, এখনো সময় আছে হিসেব নিকেশ করার, ধ্বংসের পথ থেকে সৃষ্টির পথে আসুন।

তথ্যসূত্র

EIA of 2x660 MW Coal Based Thermal Power
 Plant to be Constructed at Kalapara, Patuakhali
 Rural Power Company Limited.



§ &



সময় সুড়ঙ্গের নতুন দার

জি এম সাজ্জাদ হোসেন প্রিন্স

ੈসম্ভব কে সম্ভব করাই নাকি অনন্ত জলিলের কাজ। কিন্তু এইবার সেই অসম্ভব কেই সম্ভব করে দিলেন দুই বিজ্ঞানি Tippett (astrophysicist) এবং Tsang (Theoretical physicist)। Doctor Who প্রোগ্রাম টি যারা দেখেছে তারা হয়তো জানেন যে প্রোগ্রামটি তে একটা টাইম মেশিন তৈরি করে Doctor যিনি কিনা আসলে অন্য এক গ্রহ Gallifreyan এর বাসিন্দা, Gallifreyander কে সময়ের প্রভু বলা যায়। তাদের টেকনোলজি আমাদের চাইতে অনেক এগিয়ে থাকে। Doctor TARDIS নামের একটা টাইম মেশিনে করে সময়ের মাঝে ছুটে বেড়াতেন। কেউ যদি এখন ব্রিটেনে গিয়ে খোঁজ করে Doctor এর টাইম মেশিন দেখতে পাবেন, যা কিনা একটা পুলিশ বক্স এর আদলে এখনো ঠাঁয় দাড়িয়ে আছে। Doctor Who এর টাইম মেশিন বা বাস্তবিক এ সমভব বলে ইংগিত দিলেন এই দুই বিজ্ঞানি তাদের সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষনা পত্রে। তাদের গবেষনা পত্রের শিরোনাম TARDIS (Travesable Achronal Retregrade Domains In Spacetime; ভাবানুবাদ অনেকটা এমন: সময় কালের মাঝে অতীত-ভবিষ্যতে ভ্রমন করার দ্বার)।

তো চলুন ঘুরে আশি Gallifreyan দের রাজ্য থেকে, উন্মোচন করি সময় রহস্যের দ্বার। তার আগে আমাদের একটু Spacetime geometry এর দিকে তাকানো দরকার। Spacetime geometry দিয়ে খুব সহজেই আমাদের বাস্তবতার সময়ের বুনন কাঠামোকে ব্যাখ্যা করা যায়। আর একটু সহজ করে বললে অতিত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ-কে বিন্দু কল্পনা করে তার সাথে স্থানের জ্যামিতিক চিত্রই spacetime geometry, যার এক বিন্দু হতে অন্য বিন্দুতে অনায়াশেই যাওয়া সম্ভব।

আমাদের বিশ্বভ্রমান্ডের প্রকৃতি এই spacetime geometry তেই নিহিত। Tippett এবং Tsang তাদের গবেষনা পত্রে দেখিয়ে-ছেন কিভাবে এই কল্পনার TARDIS কে বাস্তবে রুপ দেয়া সম্ভব, যদিও হয়ত এখন সম্ভব না- কে জানে অদূর ভবিষতে হয়ত সম্ভব হবে। একটা TARDIS কে চালাতে হয় তাহলে সেটাকে এমন একটা ভ্রমান্ডে রাখতে হবে যেখানে CTCs গঠন করা সম্ভব (CTCs = Closed Timelike Curve; সময়কে গাণিতিক ভাবে প্রকাশ করলে যেখানে closed timelike curve সৃষ্টি হবে, মানে সময়ের মাত্রা নির্দেশকারী বক্র রেখা তার নিজের উপর পতিত হবে যার ফলশ্রুতিতে একটা লুপ সৃষ্টি হবে)। এখন কেউ যদি এই লুপ এর ভেতর ঢুকে যেতে পারে কিংবা তার চারপাশে এমন একটি লুপ তৈরী করতে পারে তাহলে সে খুব সহজেই সময়ের সামনে-পিছে ভ্রমন করতে পারবে।

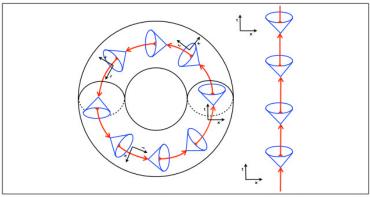


Figure 9: This spacetime diagram illustrates how lightcones will be oriented around the TARDIS geometry. Outside of the TARDIS, time is aligned in the vertical direction. Inside of the bubble, lightcones tip along a circular loop, and massive objects can travel backwards in time.

চিত্ৰ ৫.১: ছবি কৃতিত্ব Tippett/Tsang

Tippet এবং Tsang এর প্রস্তাবিত TARDIS টা ঠিক এমনি এক CTCs তৈরী করে সময়ের সমুদ্রে ডুব দেয়ার জন্যে। তবে কিছু সমস্যা আর বিপদ থেকেই যায় এই টাইম মেশিনে এ। এমন একটি TARDIS bubble তৈরী করতে হলে ভ্রমণকারীদের প্রথমেই Exotic matter (Exotic matter পদার্থবিজ্ঞানে কাল্পনিক এক পদার্থ যাদের ঋনাতক ভর থাকে) ব্যাবহারের প্রয়োজন পরবে যা পদার্থবিজ্ঞানের সাধারন ক্রিয়াকৌশল কে বৃদ্ধান্ধুলি প্রদর্শন করবে। এই প্রতিবন্ধকতাটা জয় করা

গেলেই TARDIS মেশিন টি বৃত্তাকারে স্থান কালে ভ্রমনের উপযো-গী হয়ে যাবে মানে অতিত থেকে ভবিষ্যুৎ আবার ভবিষ্যুৎ থেকে অতিতে।

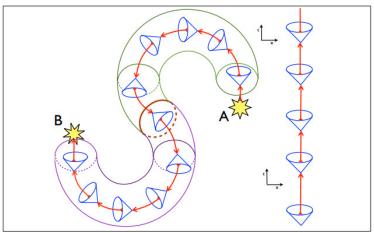


Figure 14: Sections of different TARDIS geometries (green and purple) can be spliced together (along the orange boundary) in order to put any point (A) in the immediate causal past of any other point (B).

চিত্র ৫.২: ছবি কৃতিত্ব Tippett/Tsang

এখন এই ভ্রমণকে আরো রোমাঞ্চকর করতে চাইলে এমন দুইটা TARDIS bubble এর প্রান্ত একসাথে জুড়ে দিলেই কেল্লা ফতে।

যখনই TARDIS, যার ভেতর আপনি বসে আছেন, তার দিক পরিবর্তন করবে, এটা নতুন একটা bubble এ প্রবেশ করবে। আরও খোলাসা করে বললে দুইটা পরপরযুক্ত TASDIS bubble এর এক প্রান্ত দিয়ে আপনি এই বিশ্ব ভ্রমান্ড থেকে প্রবেশ কর অপর প্রান্ত দিয়ে বের হলে হয়ত তা আপনাকে নিয়ে যাবে নতুন কোন বিশ্ব ভ্রমান্ড তে যা এন্টিম্যাটারে তৈরী!

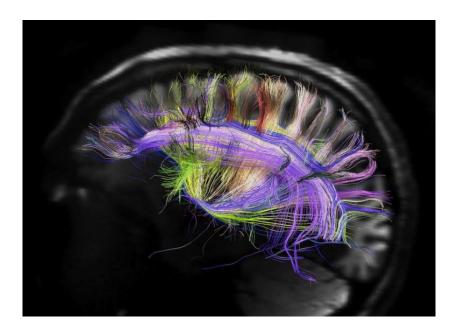
তথ্যসূত্র

- ♦ Benjamin K. Tippett, David Tsang. Traversable Achronal Retrograde Domains In Spacetime. 2013. arXiv:1310.7985.
- ♦ Joshua Filmer. Is TARDIS Travel Possible? According to Science, Yes... Maybe – Futurism.
- 🗞 ফিচার ছবিসূত্র: Wallpaper Cave.



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

§ &

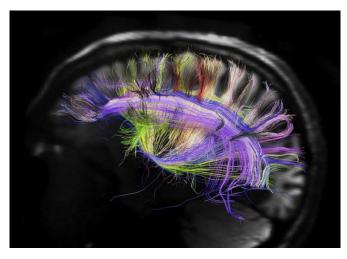


মস্তিষ্ক ও তার ধারণক্ষমতা

সৈয়দ মনজুর মোর্শেদ

রুন আপনার বয়স ৪০ বছর। ঘটনাবহুল জীবনে আপনি নানা ধরণের অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন। আর সবই সংরক্ষিত হয়ে আসছে আপনার ঘাড়ের উপরের যন্ত্রটিতে! কিন্তু ঠিক ৪০ বছর ১৩ দিন ২৫ মিনিট ১২ সেকেন্ডে আপনার মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা পূর্ণ হয়ে গেল। মানে এরপর থেকে আপনি কিছুই মনে রাখতে পারছেন না কারণ আপনার মস্তিষ্কের হার্ড ডিস্ক পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বিন্দুমাত্র জায়গা খালি নেই! ফলে আপনার জীবন হয়ে গিয়েছে স্থবির!

উপরের কল্পনাটি কেবলই কল্পনা! আজ পর্যন্ত কারোও সাথে এমনটি হয় নি। কিন্তু আসলেই কি এমনটা হওয়া সম্ভব। এখন আপনি যদি বলেন একটা মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে x পরিমাণ। তাহলে 'x' পরিমাণ তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার পর মস্তিষ্ক পূর্ণ হয়ে যাবে। ফলে সেই পরিমাণ তথ্য সংযুক্তির পর এ ধরণের ঘটনা সম্ভব! আমরা কিন্তু অনেকেই মজা করে বলি 'পড়তে পড়তে মেমরি ফুল হয়ে গেসে, আর কিছুই ঢুকে না মাথায়' এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কথাটার কি আসলেই কোন যৌক্তিকতা আছে?



চিত্র ৬.১: মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা আসলে কতটুকু?!

সম্প্রতি এই বিষয়টির উপর একটা লেখা পড়েছি সাইন্টিফিক আমেরিকানে। লেখাটি বেশ মজার! লেখাটিতে J. Hawes নামের একজন ব্যাক্তি ঠিক আমাদের মতই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন। উত্তর দিয়েছেন Paul Reber। তিনি নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক। Paul এর উত্তরটা এরকমঃ

মিস্টার Osborne, আমাকে কি ক্ষমা করা যায়? আমার মস্তিঙ্ক পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

Gary Larson এর ক্লাসিক বই 'Far side comic' এ একটা ছোট মাথাওয়ালা ছাত্র তার ক্লাস টিচারকে এ প্রশ্ন করেছিল। আমরা যদি মজা করে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই তাহলে বলতে পারি 'নিঃসন্দেহে তোমার মস্তিষ্ক প্রায় পূর্ণ বলা যায়, তাই বলে পুরোটা নয়' আমরা কি পরিমাণ তথ্য মস্তিষ্কে ধারণ করতে পারি তার একটা পরিমাণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেই পরিমাণটা অত্যন্ত বিশাল! তাই আমাদের জীবন-কালে মস্তিষ্ক পূর্ণ হয়ে যাবে কিনা এ নিয়ে দুশ্ভিরার কোন দরকার নেই।

মানুষের মন্তিক্ষে প্রায় একশ বিলিয়ন নিউরন আছে। আবার একটা নিউরন অন্যান্য নিউরনের সাথে প্রায় ১০০০ টি সংযোগ তৈরি করে। তাহলে মোট সংযোগ দাঁড়ায় ১ ট্রিলিয়ন! যদি একটি নিউরন কেবল একটি স্মৃতি ধারণ করে তাহলেও আমাদের মন্তিষ্কের ধারণক্ষমতা পূর্ণ করাটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে! ধরুন আপনার মন্তিষ্কে আইপড কিংবা ইউ এস বি ফ্ল্যাশ ড্রাইভের মত কয়েক গিগাবাইট জায়গা আছে! এখন আপনার মন্তিষ্কের নিউরন এতটাই সংযুক্ত যে প্রতিটা নিউরন একই সময়ে কয়েকটা স্মৃতি নিয়ে কাজ করে। ফলে আপনার সেই কয়েক গিগাবাইটের মন্তিষ্কের ক্ষমতা বেড়ে গিয়ে হয়ে যাবে প্রায় ২.৫ পেটাবাইট (১ মিলিয়ন গিগাবাইট) সেক্ষেত্রে আপনার মন্তিষ্ক যদি টেলিভিশনের ভিডিও রেকর্ডার হত সেটি তিন মিলিয়ন ঘণ্টার টিভি শো ধারণ করতে পারত। তার মানে ভিডিও রেকর্ডারটি পূর্ণ করতে আপনাকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তিনশ বছর টিভি চালিয়ে রাখতে হবে। (পুরো ব্যাপারটি

কিন্তু আপনার মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা কয়েক গিগাবাইট হলে যা হত তা!)

মস্তিষ্কের সঠিক ধারণক্ষমতা বের করা আসলেই কঠিন। এর প্রথম কারণ হলো আমরা জানি না কিভাবে মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতার হিসেব করতে হয়। দ্বিতীয়ত, কিছু স্মৃতির খুব বেশি বর্ণনা দরকার হয় ফলে তা বেশি জায়গা নেয়, আর কিছু স্মৃতি আমরা ভুলে যাই ফলে তাতে জায়গা খালি হয়। আবার কিছু স্মৃতি প্রথমবারে মনে করা যায় না। (হয়তো অতটা দরকারি নয় বলে)

বলা যেতে পারে মস্তিষ্কের এ ব্যাপারগুলো আমাদের জন্যে ভালো খবর। কারণ এইসব কারণে মস্তিষ্ক আমাদের অর্জিত নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। এখন আমাদের আয়ুস্কাল যদি অসম্ভব পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয় তাহলে কি মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা পূর্ণ করা সম্ভব হবে? আমি জানি না। আরও একশ বছর পরে জিজ্ঞেস করলে উত্তর পেলেও পেতে পার!

তথ্যসূত্র

♦ What Is the Memory Capacity of the Human Brain? – Scientific American.



§ 9



মগজের ঘড়িবিদ্যা

রুহশান আহমেদ

ময় এবং স্রোত, কারো জন্য অপেক্ষা করেনা। তাই প্রতিটা মুহুর্তে সময়ের সঠিক ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য।
এই সঠিক ব্যবহারের জন্য, সঠিক সময়টা জানা আমাদের
প্রয়োজন। সঠিক সময়টা অবিরাম জানান দিয়ে যাচ্ছে ঘড়ি নামক
যন্ত্রটি। আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনকে সচল ও নিয়মতান্ত্রিক
রাখার জন্য যেটুকু সময়জ্ঞান দরকার তা আমরা ঘড়ি, ক্যালেন্ডার
এদের সাহাযেই পেয়ে থাকি। মানুষ বা অন্যান্য প্রানীর দেহে যে
জটিল-জটিল সব কার্যকলাপ চলছে, তার জন্যও সময়ের একটা হিসাব
থাকা দরকার। ঘড়ি দেখে আপনার রুটিন অনুযায়ী খেতে বসতে
পারেন, বা ঘুমাতে যেতে পারেন। কিন্তু ঘড়ি না দেখলেও আপনার
শরীর একসময় খেতে চাইবেই, কিংবা ক্লান্ত হবেই। ক্রিকেট খেলায়
ছুটে আসা বলটি ক্যাচ ধরতে তার গতি এবং সময়ের সম্পর্ক বোঝার যে জটিল হিসাবটা মগজ করে ফেলে তখন ঘড়িটা কোথায় থাকে?



রং, তাপমাত্রা, আলো এদের অস্তিত্ব কিভাবে আমরা অনুভব করতে পারি সেটা জানি। যেমন, আলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন তরংগদৈর্ঘ্যের আলো চোখের রেটিনার বিভিন্ন কোষকে সংবেদী করে তোলে, এই সংকেত কর্টিকাল অঞ্চলের নিউরন দিয়ে বিশ্লেষিত হয়ে একটা নির্দিষ্ট রঙ্গের আলোর অনুভূতি পাই। সময় বুঝার জন্য আমাদের কোন সংবেদী অঙ্গ, রিসেপ্টর কোনটাই নেই। তারপরও আমরা অল্প সময় এবং দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। সময়ের প্রবাহে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারি, তার মানে কিছু একটা আছে যার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আমাদের দেহ সময়কে মেপে চলছে।

আমরা এমন একটা যুগে বসবাস করছি যখন প্রযুক্তির কল্যানে আমরা ১৬ টি এককে সময়কে হিসাব করতে পারি। পারমানবিক ঘড়ির ন্যানো-সেকেন্ডের হিসাব, যা স্যাটেলাইট অথবা রাডারে সংকেত আদান-প্রদানের সূক্ষতম পার্থক্য ধরিয়ে দেয় কিংবা ৩৬৫ দিনের বিশাল একটা হিসাব, যা সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসার(প্রায়) সময় বুঝায়। এর মধ্যে মিনিট এবং ঘন্টার হিসাবটাই ব্যবহারিক জীবনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রানীও কয়েক মাইক্রোসেকেন্ড থেকে বছরের ঋতুগুলোর দৈর্ঘ্য পর্যন্ত চিহ্নিত করতে পারে। স্তন্যপায়ী কিংবা পাখিরা খুব সহজেই বুঝতে পারে একটি শব্দ ডান দিক থেকে আসছে, নাকি বাম দিক থেকে। এটা সম্ভব হচ্ছে কারন তাদের মগজ এক কান থেকে আরেক কানে শব্দ প্রবেশের যে সৃক্ষ সময়ের পার্থক্য রয়েছে সেটা ধরতে পারছে। মানুষের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য প্রায় ৬০০ মাইক্রোসেকেন্ড। প্রানীদের মধ্যে এরকম অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় ঘড়িবিদ্যার পাশা পাশি ঘন্টার স্কেলে সময় হিসাবের ক্ষমতা আছে, যা তাদের ঘুম/জেগে থাকা কিংবা ক্ষুদা-পিপাসার চক্র নিয়ন্ত্রন করে। আবার অনেক প্রানী সপ্তাহ কিংবা মাসের এককে সময়কে হিসাব করে মৌসুম পরিবর্তন বুঝতে পারে. যা তাদের প্রজনন অথবা শীতনিদ্রার চক্র নিয়ন্ত্রনে সহায়ক।

আধুনিক প্রযুক্তি এবং জীবন্ত প্রানীকূল প্রত্যেকেরই বিভিন্ন মাত্রায় সময় হিসাব করা প্রয়োজন। তবে মজাটা এখানেই যে, দুই ক্ষেত্রেই সময় সমস্যার সমাধান সম্পূর্ন আলাদা। মানুষের তৈরি যান্ত্রিক ঘড়ির সাথে, সময়ের জৈবিক পরিমাপের পদ্ধতির পার্থক্য হলঃ জৈবঘড়িতে এক একক থেকে পরের এককে সময় বলার কারিগরী আলাদা, কিন্তু যন্ত্রের ক্ষেত্রে তা প্রায় একই। আপনার মগজ যেই ঘড়ি ব্যবহার করে মোটামুটি হিসাব করে ফেলেছে এই বিরক্তিকর লেখাটা পড়তে কতক্ষন লাগতে পারে এবং ঘুম/জেগে থাকা চক্রের জন্য যেই ঘড়ি ব্যবহার করে কিংবা শব্দের এক কান থেকে আরেক কানে প্রবেশের পার্থক্য হিসাবের

জন্য মগজ যেই ঘড়িটা ব্যবহার করছে। এদের মধ্যে কোনই সম্পর্ক নাই। আরেক ভাবে বলা যায়, আপনার দেহের 'সার্কেডিয়ান ক্লক' যা খাওয়া-ঘুম নিয়ন্ত্রন করে তার কোন সেকেন্ডের কাটা নাই (এই এককে সময় হিসাবের তার দরকার হয়না) , আবার যেই ঘড়ি ব্যবহার করে মগজ শব্দের উৎসের অবস্থান নির্নয় করে- তার কোন মিনিটের কাটা নাই (সেকেন্ডের বড় এককে হিসাব তার কোন কাজে লাগেনা)।

অর্থাৎ বোঝা গেল, মগজ একেক ধরনের কাজে একেক ধরনের সময় গননাযন্ত্র ব্যবহার করে। এবং এই সবের মধ্যে 'সার্কেডিয়ান ক্লক'-এর ব্যাপারটাই সম্ভবত সবচেয়ে সহজে বোঝা যায়। মানুষ, ফ্রুট-ফ্লাই এমনকি এক কোষী ব্যাক্টেরিয়াও প্রতিদিন আলো-আঁধারের চক্রের হিসাব রাখতে পারে। প্রশ্ন হতে পারে, যেই লোকের কোষই মাত্র একটা- তার আবার আলো অন্ধকার নিয়ে এত চিন্তা কিসের? এর উত্তর এমন হতে পারে যে, 'সার্কেডিয়ান ক্লক' এর বিবর্তনের একটি শক্তিশালী প্রভাবক সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুনী রশাে, যা কােষ বিভাজনের জন্য গুরুত্বপূর্ন একটি ধাপ 'ডিএনএ রেপ্লিকেশন' পর্যায়ে মিউটেশন ঘটাতে পারে। এককোষী জীবের চামড়া বা এই ধরনের কোন প্রতিরক্ষামূলক ব্যাবস্থা না থাকায়, এরা আলো-ঘটিত রেপ্লিকেশন ক্রটি মোটেই সহ্য করতে পারেনা। তাই রাঁতের বেলা প্রজনন/বিভাজন ঘটানোই তাদের জন্য সুবিধাজনক, একার-নেই আলোর অনুপস্থিতির সময়টাকে বুঝতে পারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বেশ সুবিধা দিচ্ছে। গবেষনা করে জানা গেছে, বেশিরভাগ জীবেই 'সার্কেডিয়ান ক্লক' এর মূলনীতি মোটামুটি একই। ডিএনএ এক ধরনের প্রোটিন তৈরি করে, একটা নির্দিষ্ট ঘনমাত্রায় পৌছার পর প্রোটিনটি সংশ্লেষন বন্ধ হয়ে যায়। আবার নির্দষ্ট সময় পর প্রোটিন যখন দ্রবীভূত হয়ে যায়, তখন আবার সংশ্লেষন শুরু হয়। ব্যাপারটা কাকতালীয় হলেও সত্য, এই প্রোটিন-প্রোটিন খেলার সময়কাল ২৪ ঘন্টার কাছাকাছি।

তাহলে যখন আরো সূক্ষ সময় নিয়ে কাজ করা লাগে, তখন কি হয়? ছুটে আসা বলটির পরবর্তী অবস্থান অনুমান করে লাফ দেয়ার আগে সময়ের হিসাবটা কিভাবে হয়? কিংবা মোর্স কোড ব্যবহারকারীরা কিভাবে শর্ট (ডট) এবং লং (ড্যাশ) সংকেত এর মধ্যে পার্থক্য করে? মগজের যেই কারিগরী বিভিন্ন প্রানী এবং মানুষকে প্রায় মিলিসেকেন্ড এককে সময়ের অনুভূতি প্রদান করে সেটা এখনো একটা রহস্য। তবে কিছু হাইপোথেসিস প্রচলিত আছে। যেমন, নির্দিষ্ট কিছু নিউরন পর্যাবৃত্ত-ভাবে একটি সংকেত তৈরি করতে থাকে, অন্য আরেক ধরনের নিউরন এই প্রতিটা সংকেতকে একেকটি 'টিক' হিসেবে গননা করে। ব্যাপারটা অনেকটা মানুষের তৈরি ঘড়ির মত হয়ে গেল। আবার, আরেকটি হাইপোথেসিস প্রচলিতে, যে সময়ের হিসাবের ব্যাপারটা মগজের অন্তর্নিহিত গতিবিদ্যার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত। আপনি একটা শান্ত পুকুরের কথা চিন্তা করুন, যার সামনে দাড়ালেই পানিতে ঢিল ছুড়তে ইচ্ছা করে। এখন আপাতত ঢিল ছোড়া বাদ দিয়ে যদি আপনার হাতে দুটো ছবি ধরিয়ে দেয়া হয় যেগুলো একটি ঢিল ছোড়ার পর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তোলা হয়েছে, আপনার বুঝতে একটুও সমস্যা হবেনা যে কোন ছবিটা আগের তোলা। ছড়িয়ে পড়া ঢেউয়ের ব্যাস দেখেই এটা বলা সম্ভব। অর্থাৎ, ঘড়ি ছাড়াও একটা পুকুরের পানির গতিবিদ্যা আমাদের সময় বলতে পারে। নিউরনের নেটওয়ার্ক একটি জটিল গতিশীল সিস্টেম। এই হাইপোথেসিস বলে, যখন সময় 'শূন্য' তখন সক্রিয় নিউরনগুলো একটা প্যাটার্ন তৈরি করে, ঠিক যেমন ঢিল ছোড়ার আগে শান্ত পুকুর। এই প্যাটার্ন সময় চলার সাথে সাথে মগজের ভেতরের এবং বাহিরের নানান উদ্দীপনার কারনে পরিবর্তন হয়, যেমন ঢিল ছোড়ার পর (ঢিলটা এখানে উদ্দীপক) ঢেউ বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে। যেকোন সময়ে এই প্যাটার্ন কি অবস্থায় আছে বিবেচনা করে সময়ের একটা ধারনা পাওয়া অসম্ভব নয়। তবে এই সুক্ষ সময়ের হিসাব সম্পর্কে সঠিক ধারনা পেতে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

সময় সংক্রান্ত বিষয়ে মগজের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, মগজের বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্দেশ্য ছিল জীবকে সম্ভাব্য খাদ্যের উৎস এবং বিপদের উৎস সনাক্ত করতে সাহায্য করা। সেই অবস্থায় সময় ব্যাপারটা তেমন গুরুত্ব পায়নি। ধীরে ধীরে নানান প্রকৃয়ার মধ্য দিয়ে সময় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় যুক্ত হতে থাকে। তবে অন্যান্য

বিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্যের মত, সময় বলার ক্ষমতাটাও তেমন নিয়ম মেনে যুক্ত হয়নি। অনেক খুটিনাটি বিষয়ই দেখা যাচ্ছে অসম্পূর্ন রয়ে গেছে। ৩ বিলিয়ন বছর ধরে মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করছে, কিন্ত বিংশ শতকের আগে কয়েক ঘন্টায় অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে আসার নজির রূপকথা ছাড়া কোথাও নেই। তাই, 'সার্কেডিয়ান ক্লক'-এর উপর কোন বিবর্তনীয় চাপ ছিলোনা যে তাকে দ্রুত 'রিসেট' হওয়া শিখতে হবে। তার কারনেই, 'জেট লেগ' এর মত বিরক্তিকর একটা ব্যাপার আমাদের ভোগ করতে হয়।

এইবার একটা মজার এক্সপেরিমেন্টের কথা বলব, 'মার্শমেলো (একধরনের খাবার) এক্সপেরিমেন্ট'! ষাটের দশকে ওয়াল্টার মিশেল নামক একজন মনবৈজ্ঞানিক এই এক্সপেরিমেন্টটি করেন। একটি ৪ বছরের বাচ্চার সামনে কিছু মার্শমেলো রাখা হয় এবং তার সাথে পরীক্ষকরা কথা বার্তা বলতে থাকেন। এক পর্যায়ে বাচ্চাটিকে জানানো হয়, পরীক্ষককে একটু বাহিরে যেতে হবে এবং খুব দ্রুতই তিনি ফিরে আসবেন। এর মধ্যে সে চাইলে মার্শমেলো খেতে পারে, কিন্তু- যদি পরীক্ষক ফিরে আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে। তাহলে তাকে দিগুন মার্শমেলো উপহার দেয়া হবে। একই বয়সী অনেকের মধ্যে এই এক্সপেরিমেন্টটি করা হয়। ফলাফলে জানানো হয়, ওই মার্শমেলো গড়ে ৩ মিনিট অক্ষত ছিল, কয়েকজন সাথে সাথই খেয়ে নিয়েছে আবার কয়েকজন ১৫ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে।



বিবর্তনের রহস্যময় পথের নানা বাক-প্রতিবাক পার হয়ে মানুষ এবং

অন্যান্য প্রানী কয়েক রকম জৈবিক সময় যন্ত্র পেয়েছে। এদের প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট মাত্রায় সময় পরিমাপ করতে পারে। বিভিন্ন রকমের কর্মপন্থা ব্যাবহার করে মগজ যেভাবে সময়কে জানে এবং জানায়- তা আমাদের মোর্স কোড বুঝা, ট্রাফিক লাইট কি বেশি সময় নিচ্ছে- সেটা অনুমান, কিংবা একটা বোরিং লেকচার শেষ হতে আর কতক্ষন... এসবের একটা উপলব্ধি দিয়ে থাকে। এই ধরনের জটিল জটিল কাজকর্মের মধ্যে জেট লেগ ছাড়াও, আরো কিছু ফাঁক-ফোকড় রয়ে গেছে, যার কারনে দৈর্ঘ্য সংকোচন, কাল দীর্ঘায়ন, স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিনামের গুরুত্ব বিচারে ব্যার্থতার মত কিছু 'ব্রেইন বাগ' আমাদের বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। মার্শমেলো এক্সপেরিমেন্টটা শেষ 'বাগ'এর উদারহরন।

আদিকালে যখন জীবন ছিল নানান রকম দূর্যোগ আর অনিশ্চয়তায় ভরা, তখন দীর্ঘমেয়াদী চিন্তাভাবনা বাস্তবায়নের চিন্তা করাও ছিল বোকামীর সামিল। কালের পরিক্রমায় মানুষ এগিয়ে গিয়েছে, নিজের চারপাশের নিয়ন্ত্রনের দক্ষতা অর্জন করেছে। যেসব দক্ষতা বিশেষত ফ্রন্টাল কর্টেক্সের বৃদ্ধির সাথে জড়িত। এই বর্ধিত অংশ শুধু অতীত, ভবিষ্যতের মত বিমূর্ত ব্যাপারগুলোই ধারন করেনা- তাৎক্ষনিক কিংবা স্বল্পমেয়াদী ফলাফল পছন্দকারী মগজের অংশকে নিরুৎসাহী করে। তারপরও দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা-ভাবনা ব্যপারটা হাটা-চলা কিংবা কথা বলার মত কোন সহজাত দক্ষতা নয়। সংস্কৃতি, পরিবেশ, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এদের দ্বারা এই ব্যাপারটা অর্জন করে নিতে হয়। এখন যেই প্রতিযোগীতার সময়ে বসবাস করছি, তাতে দীর্ঘমেয়াদী চিন্তাভাবনা ছাড়া ব্যাক্তিগত, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় কোন ক্ষেত্রেই সত্যিকারের উন্নতি সম্ভব নয়। আশির দশকে 'মার্শমেলো এক্সপেরিমেন্ট' এ অংশগ্রহনকারীদের নিয়ে আরেকটি অনুসন্ধান চালানো হয়। ততদিনে অংশগ্রহনকারী বাচ্চারা কৈশর পার করে এসেছে। খোঁজ নেয়ার পর, কে কতক্ষন অপেক্ষা করেছিল সেটার সাথে তাদের SAT স্কোরের একটা আন্তঃসম্পর্ক পাওয়া গেল। যাদের স্কোর অপেক্ষাকৃত ভালো, তাদের অনেকেই 'দীর্ঘসময় অপে-ক্ষা'-করার দলে ছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

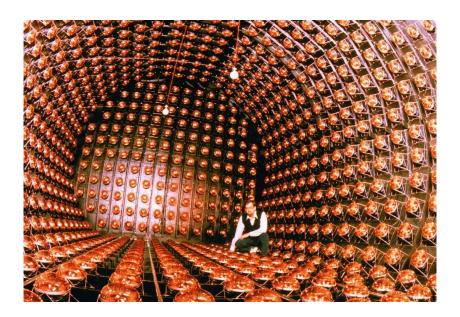
দৈর্ঘ্য সংকোচন, কাল দীর্ঘায়ন পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনা করা হয়ে বলেই এতদিন জানতাম। নিউরোসায়েন্স এবং সাইকোলজির দৃষ্টিভঙ্গিতে জানার আগ্রহ থাকলে তথ্যসূত্রের আর্টিকেল দুটো পড়ে দেখতে পারেন।

তথ্যসূত্র

- ♦ Dean Buonomano. "How Do Brains Tell Time?" In: Brain Bugs: How the Brain's Flaws Shape Our Lives (2011).
- ⊗ Buehner, Marc J., and Gruffydd R. Humphreys. "Causal contraction: Spatial binding in the perception of collision events." Psychological Science 21.1 (2010): 44-48. DOI: 10.1177/0956797609354735.
- ♦ Van Wassenhove, Virginie, et al. "Psychological and neural mechanisms of subjective time dilation." Frontiers in Neuroscience 5 (2011): 56. DOI: 10.3389/fnins.2011.00056.



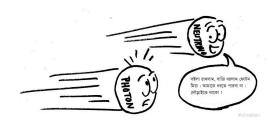
§ 6



নিউট্রিনো: মহাবিশ্বের ভূত

সিরাজাম মুনির শ্রাবণ

০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা, তখনকার সময়ে নিয়মিত বিভিন্ন পত্রিকার সাপ্তাহিক বিজ্ঞান পাতার মাঝে ঘুরাঘুরি করে বেড়াতাম। সেই সময়ে এমন একটা খবর বেরিয়েছিল যার কারণে সারা দুনিয়ায় হুলস্থূল পড়ে গিয়েছিল। খবরটি ছিল এরকম-"নিউট্রিনো ছোটে আলোর চেয়ে বেশি গতিতে"।



যারা বিজ্ঞানের হালচালের অল্প স্বল্প খোঁজখবর রাখে তাদের জন্য তো এটা অবাক করা ঘটনাই, পাশাপাশি যারা বিজ্ঞানের ছাত্র নয়, তাদেরও যেন অবাক করা অবস্থা। সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব-সূত্র না জানলেও আইনস্টাইন যে একটা যুগান্তকারী কিছু করেছিলেন সেটা জানে। আইনস্টাইনের অত্ত্ব অনুসারে আলোর বেগের চেয়ে বেশি বেগ অর্জন সম্ভব নয়। সেই আইনস্টাইনের কথাকে যদি ভুল বলা হয় তাহলে অবাক হবারই কথা। কি হল কিনা? কি দেখা যায় কিনা? এসব কী শুনছি? সত্যি বলছে তো? কারণ এই তথ্য সঠিক হয়ে থাকলে বিজ্ঞানের অনেক সূত্রই লিখতে হবে নতুন করে। উচ্চশ্রেণীর আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের অনেক কিছুর সাথেই এই তথ্য বিরোধ অবস্থানে যায়। তার মানে আইনস্টাইন ভুল। কিন্তু এত নির্ভরযোগ্য স্ব-য়ং সার্নের বিজ্ঞানীরা দাবী করছে এই কথা, তাই ফেলেও দেয়া যায় না।



বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

মনে হয় সম্ভবত সারা দুনিয়ার সকল পত্রিকাই এক খবরটা ফলাও করে ছাপিয়েছে। ছাপাবে না কেন? পুরো বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়েই টান দেয় যেন! পরে অবশ্য আরও সূক্ষ পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে যে এটা আসলে ভুল ছিল, যান্ত্রিক ক্রটির কারণে পরীক্ষার ফলাফলেও সামান্য ক্রটি ছিল। এই গবেষণাটি সার্নের একটি স্বতন্ত্র প্রজেক্টের আয়তাধীন ছিল। প্রজেক্টের নাম 'অপেরা'। অপেরার অধীনেই এই পরীক্ষা করা হয় এবং ভুল ফলাফলের জন্য জনগণের দাবির মুখে অপেরার প্রধানকে অপসারণও করা হয়। এই ভ্লস্তুল পাকানো জিনিসটি একটি কণা, নিউট্রিনো। এই কণাটি বিজ্ঞানীদের কাছে তার উপস্থিতি নিশ্চিত করার পর থেকেই এমনসব আচরণ করে যাচ্ছে, এমনসব ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে যার জন্য সকলে তাকে "ভূতুড়ে কণা" বলে ডাকে। তার কর্মেও দেখা যায় আসলেই সে একটি ভুতুড়ে কণা। নিউট্রিনো তাঁর আবিষ্কারের জন্মলগ্ন থেকেই অদ্ভুত আচরণ করে যাচ্ছে। এই নিউট্রিনোর সাথে সাথে এত সব কণা আবিষ্কার হয়েছে তাদের নাড়ি-নক্ষত্র সব জানা হয়েছে কিন্তু এই হতচ্ছাড়া নিউট্রিনো সম্বন্ধে তেমন ভাল কিছু জানা যায় নি এখনো। এ নিয়ে পদার্থবিদদের মাঝে যেন একটা স্থায়ী অসন্তোষ।

শুরুর কথা

অগ্রসরমান বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ আমরা জানি প্রোটন ও নিউট্রন কোনো মৌলিক কণা নয়। এ দুটোই গঠিত কোয়ার্ক দিয়ে। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল যে পরমাণু বা মহাবিশ্বের সকল কিছু শুধু ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে গঠিত। তিরিশের দশকের গবেষণায় বিজ্ঞানীরা নিউট্রন নিয়ে গবেষণা করতে করতে এক সময় একটি অজানা কণার ধারণা পান। তারা আঁচ করতে পারেন এই তিনটি কণা ছাড়াও একটি কণা থাকতে পারে। যদি কল্পনায় একটি কণাকে ধরে নেয়া না হয় তাহলে দেখা যায় ভরের ও শক্তির নিত্যতা সূত্র ভুল হয়ে যায়। পরমাণু থেকে

নিউট্রনকে অবমুক্ত করে রাখলে দেখা যায় নিউট্রনটি আর নিউট্রন থাকছে না। সেটি ভেঙ্গে নিজেকে পাল্টে নিচ্ছে ইলেকট্রন ও প্রোটনে। এই পাল্টানোর সাথে সাথে তাঁর ভরেরও পরিবর্তন হয়। আদি অবস্থায় যে ভর ছিল তা থাকে না, কমে যায়। যদি কমেই যায় তবে সে গেল কই? ভর ও শক্তির নিত্যতা সূত্র অক্ষুপ্প রাখতে বাধ্য হয়েই ধরে নিতে হল একটি অজানা কণার অস্তিত্ব। তখনকার সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে হয়তো তাদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। পরের বছর পদার্থবিজ্ঞানের আরেক দিকপাল এনরিকো ফার্মি এই অজানা কণাটির নাম দেন নিউট্রিনো। এই গড়বড়ে অবস্থা দিয়েই নিউট্রিনোর শুরু।

আজব আজিব!

নিউট্রিনোর সবচে রহস্যময় জিনিসটা মনে হয় তাঁর গতি। শুধু গতি বললেই শেষ হবে না বলতে হবে দুর্দমনীয় গতি। এটি আলোর বেগে ছুটে চলে। সাধারণ কোনো আলোর কণা যখন ছুটে চলে তখন পথিমধ্যে কোনো অস্বচ্ছ বাধা/প্রতিবন্ধকতা পড়লে আলো আর তা ভেদ করে যেতে পারে না। সেখানেই ঘটে তাঁর যাত্রার সমাপ্তি। বড়জোর প্রতিফলিত হয়। কিন্তু নিউট্রিনো এমন এক আজব জিনিস যেটার সামনে হাজার প্রতিবন্ধকতা থাকলেও তা ভেদ করে অনায়াসে চলে যেতে পারে। পৃথিবীর মাটির ভেতর দিয়ে এক প্রান্ত থেকে কোনো নিউট্রিনোকে অপর প্রান্তে ছুড়ে মারলে তা এক সেকেন্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগেই অতিক্রম করে যাবে। পৃথিবী যে এত্ত বড় বাধা, প্রতিবন্ধকতা তাকে যেন বুড়ো আঙ্গুলই দেখিয়ে দেয়! শীতের কুয়াশার ভিতর দিয়ে একটু বুলেট যেমন অনায়াসেই তা পার হয়ে বনবন করে ছুটে যেতে পারে নিউট্রিনোও যেন তেমনই ভাবে পুরো পৃথিবীকে ভেদ করে যেতে পারে। আর সে নিউট্রিনো প্রতিনিয়ত পৃথিবীকে এরকম অতিক্রম করে যাচ্ছেই। বিরামহীন ভাবে। আমরা যে পৃথিবীর মাটিতে হাঁটছি সে হাটার সময় আমাদের পায়ের পাতা দিয়ে যে কী বিশাল

পরিমাণ নিউট্রিনো ছুটে যাচ্ছে তাঁর আনুমানিক সংখ্যাটা শুনলে বিশ্বাস হতে চায় না। পায়ের পাতা দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ট্রিলিয়ন পরিমাণ নিউট্রিনো ছুটে যাচ্ছে। আমরা বুঝতেও পারছি না, অথচ বিরামহীনভাবে আমাদের এফোঁড় ওফোঁড় করে চলছেই। এমনকি এই মুহূর্তে আমাদের হাতে ধরা কোনো বই বা ম্যাগাজিন কিংবা ধরে রাখা মোবাইলের ল্যাপটপের পর্দার মধ্যে দিয়েও ছুটে যাচ্ছে। ছুটে যাচ্ছে আলোর বেগে।

নিউট্রিনোর এই বেগ নিয়েও একটা ধাঁধায় পড়তে হয় বিজ্ঞানীদের। যদি নিউট্রিনোর ভর থাকে তবে সে আলোর বেগে ছুটে কি করে? ভর থাকলে তো আলোর বেগে ছুটা সম্ভব নয়। কোনো কণার ভর যদি শূন্য হয় তবে তাকে অবশ্যই আলোর বেগে ছুটতে হবে, এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। ঠিক এই কথাটাকেই উল্টে বলা যায় কোনো কিছু যদি আলোর বেগে ছুটতে চায় তবে তাকে অবশ্যই ভরশূন্য হতে হবে। রাজনীতিবিদরা যেমন মাঝে মাঝে নাকানি চুবানি খায় বিজ্ঞানীদেরও তেমন নাকানি চুবানি খেতে হল এই নিউট্রিনোর বদৌলতে। পরে অবশ্য এই সমস্যার সমাধান হয়েছে। কয়েক প্রকারের নিউট্রিনো আবিষ্কার হয়েছে। কারো কারো ভর আছে আবার কারো নেই।

Newtrino		$ u_e$		$ u_{\mu}$		$\nu_{ au}$	
Charged	Partner	Electron	(e)	Muon	(μ)	Tau	(τ)

সারণী ৮.১: বিভিন্ন ধরনের নিউট্রিনো

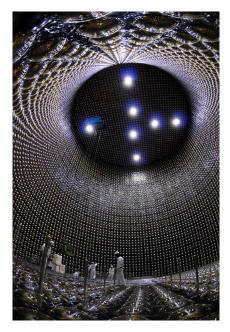
সম্ভাবনা

যোগাযোগ ব্যবস্থায় পৃথিবীকে দিন দিন ছোট করে ফেলাই যেন পৃথিবীর বিজ্ঞানী-প্রকৌশলীদের অন্যতম লক্ষ। সেকেন্ডের ভেতরেই তথ্য আদান প্রদান করা চাই। যেহেতু নিউট্রিনো এমন বাধাহীনভাবে চলে তাই এই নিউট্রিনোর মাঝে তথ্য দিয়ে তাকে প্রেরণ করা যেতে পারে না? ধরা যাক পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে কোনো বার্তা অপর প্রান্ত পাঠানো লাগবে, তাঁর জন্য যেটা করতে হবে সেটা হল স্যাটেলাইটের সাহায্য নেয়া, কিংবা তার অথবা সাবমেরিন ক্যাবলের সাহায্য নেয়া। মোটামুটি বেশি সময় না লাগলেও ভালই সময় লাগে তাতে। এখানে যদি নিউট্রিনো দিয়ে কাজটা করা যায় তবে কতই না সহজ হয়ে যায়। নিউট্রিনো মাটি ভেদ করে যেতে পারবে সেকেন্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগে। লাগবে না কোনো তাঁর। উপযোগী একটা ট্রান্সমিটার আর রিসিভার হলেই হল। ট্রান্সমিটার হতে তথ্য প্রেরণ করা হবে আর গ্রাহকের কাছে রিসিভারে সে তথ্য গ্রহণ করা হবে। আমরা যে টেলিফোন, মোবাইল ব্যাবহার করি সেখানেও তড়িৎচুম্বক তরঙ্গের বদলে ব্যবহার করা যেতে পারে এই নিউট্রিনো প্রযুক্তি।

কিন্তু ওই যে বিজ্ঞানীদের নাকানি চুবানি খাওয়ানো কণা সে কি আর সহজে ধরা দিবে? এখানেও আছে ঝামেলা। নিউট্রিনো সে অনায়াসেই ভেদ করে যাবে রিসিভার। রিসিভারকে সাড়াই দিবে না। স্বয়ং পৃথিবীকে ভেদ করে চলে যায় আর এটা তো একটা রিসিভার মাত্র! কোনো একটা হিসেবে এমন সংখ্যাও দেখেছিলাম নিউট্রিনোর গতিকে থামাতে হলে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল (তিন লক্ষ কিলোমিটার) লম্বা নিরেট ধাতব পাত দরকার! সামান্য একটা কণাকে ধরতে এত বিশাল আঁকারের ডিটেক্টর তৈরি করতে হয় যে সে ডিটেক্টরকেও মোটামুটি এক ভৌতিক কারখানা বলে মনে হয়।

তবে আমরা আশা করতেই পারি এবং এর জন্য অপেক্ষা করতেই পারি, একসময় সহজলভ্য এমন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হবে যা দিয়ে খুব সহজেই নিউট্রিনোকে বাগে আনা যাবে। এবং তার সাথে সাথে এটি দিয়ে জগতকেই পাল্টে ফেলা যাবে, মানুষের জীবনযাত্রার সহজতর হয়ে যাবে। যদি আমরা দৃশ্যমান আলোকের বিকিরণের বদলে নিউট্রিনোর বিকিরণে দেখি তাহলে রাতের অন্ধকারেও পৃথিবীকে দিনের মতই দেখা যাবে। সে জন্য দরকার উপযুক্ত প্রযুক্তি। সত্যি কথা বলতে কি নিউট্রিনোকে ব্যবহার

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র ৮.১: নিউট্রিনোকে ধরার জন্য তৈরি করা বিশাল ডিটেক্টর

করে যে কি পরিমাণ সুবিধা পাওয়া যেতে পারে সেটা আমরা ভাব-তেই পারি না। অনেক অনেক সম্ভাবনাময় একটা জিনিস এই নিউট্রিনো।

কোথা থেকে আসে এরা?

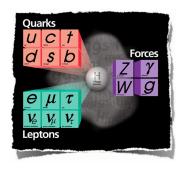
নিউট্রিনোর সবচে বড় আঁধার বলা যায় সকল নক্ষত্রকে। তাঁর মাঝে আমাদের সূর্যও তো একটা নক্ষত্র। এই সূর্যেও প্রতিনিয়ত অসংখ্য নিউট্রিনো তৈরি হচ্ছে। সূর্যে প্রতিনিয়ত আগুন জ্বলছে আর সে আগুনে কোনো প্রকার অক্সিজেন লাগে না। যেটা হয় সেখানে তা হল নিউক্রিয়ার বিক্রিয়া। নিউক্রিয়ার বিক্রিয়ায় অসংখ্য নিউট্রন মুক্ত হচ্ছে, আর নিউট্রন থেকেই তৈরি হয় নিউট্রিনো। প্রতিনিয়ত সেই নিউট্রিনো ছুটে আসছে আমাদের দিকেও। একেকটা সুপারনোভা বিক্ষোরণে কি পরিমাণ নিউট্রিনো

অবমুক্ত হয় তার সংখ্যা কল্পনা করে নেয়াও সাধ্যের অতীত। কথায় বললে মোটামুটি এরকম দাড়ায় একশ বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন...। আমাদের পৃথিবীর মাঝে যে নিউক্লিয়ার বোমা ফাটানো হয় তাতেও তৈরি হয় অনেক নিউট্রিনো। পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট থেকেও নিউট্রিনো উৎপন্ন হয়। তাছাড়াও কণা নিক্ষেপকে (Particle Accelerator) একাধিক কণার পারস্পরিক সং-ঘর্ষের মাধ্যমেও তৈরি হয় নিউট্রিনো। প্রত্যেকটা নক্ষত্রের মৃত্যুতে অবমুক্ত হয় অসংখ্য নিউট্রিনো। সুপার-নোভার বিস্ফোরণে বের হয় নিউট্রিনো। মহাবিশ্বের সেই জন্মলগ্ন থেকেই নানান মহাজাগতিক ঘটনার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে সে। সেই আদি মহাবিশ্বের (Baby universe) সাক্ষীরূপে পাওয়া যায় এই নিউট্রিনোকে। কত কাল কত বছর ধরে তারা ছুটেই চলছে এবং চলতে চলতে একসময় কোনো কোনোটি আমাদের পৃথিবীর মাঝে দিয়েও যাচ্ছে। যেটা পটভূমি বিকিরণ (Background Radiation) নামে পরিচিত। মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় তার বয়স যখন খুব অল্প ছিল তখন প্রোটন, ইলেক্ট্রন, নিউট্রিনো একসাথে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় ছিল। সময়টা বিগ ব্যাং এর এক সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ পরের কথা। মহাবিশ্বের বয়স যখন এক সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ থেকে দশ ভাগের এক ভাগে এসে পড়ে তখন এই কণাগুলোর মাঝে থাকা দুর্বল মিথস্ক্রিয়া কমে যেতে থাকে। আর এর ফলে নিউট্রিনোগুলো মুক্ত হয়ে ছড়িয়ে যেতে লাগলো মহাবিশ্বের চারিদিকে। এই ছড়িয়ে পড়া নিউট্রিনোগুলোই ভেদ করে যাচ্ছে আমাদেরকে। এর চেয়ে অবাক করা জিনিস আর কিই বা হতে পারে যে আমরা এমন একটা জিনিসের সংস্পর্শে আসতে পারছি যা কিনা সৃষ্টির শুরুর প্রতিনিধিত্ব করে।

নিউট্রিনো কী?

আমরা আগেই দেখেছি প্রোটন ও নিউট্রন কোনো মৌলিক কণা নয়। যে তিনটি কণা ইলেকট্রন, প্রোটন, ও নিউট্রন নিয়ে মহাবিশ্বের সকল কিছু গঠিত বলে ধরা হত তাঁর মাঝে ইলেকট্রনই শুধু আজ পর্যন্ত মৌলিক কণা হিসেবে টিকে আছে। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের প্রমিত মডেল বা স্ট্যান্ডার্ড মডেল অনুসারে মহাবিশ্ব গঠিত হয়েছে তিন শ্রেণীর কণা দিয়ে। সেগুলো হচ্ছে-

- ১. কোয়ার্ক
- ২. বোসন
- ৩. লেপটন



এর মাঝে তিন নম্বর শ্রেনী লেপটন আবার দুই প্রকার। এক প্রকার ইলেকট্রন আরেক প্রকার নিউট্রিনো। নিউট্রিনোর কোনো চার্জ নেই। যেহেতু কোনো চার্জ নেই তাই সে কোনো প্রকার চুম্বক ক্ষেত্র, বিদ্যুৎ ক্ষেত্র দ্বারাও প্রভাবিত হয় না। আর সেজন্য এই নিউট্রিনো নিয়ে গবেষণা করতে বিজ্ঞানীদের নানান হ্যাপা পোহাতে হয়। চার্জহীন বলেই তাঁর এরকম নাম। নিউট্রিনো নামটার সরল বাংলা তর্জমা করলে এরকম দাঁড়ায় চার্জহীন অতিক্ষুদ্র কণা। এই কণাটিকে প্রকাশ করা হয় গ্রীক বর্ণ ν (নিউ) দিয়ে। এই কণা কারো সাথে বিক্রিয়াও করে না। এই মুহূর্তে এই অযথা(!) বকবকানি যার দ্বারা পড়া হচ্ছে তাঁর শরীরের ভেতর দিয়েও সেকেন্ডে হাজার কোটি নিউট্রিনো পার হয়ে যাচ্ছে। কই? কেও কি টের পাচ্ছে? একদিকে বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় না আরেক দিকে কোনো ধরণের বিক্রিয়াও করে

না, তাই এটা নিয়ে কাজ করতে গেলে বিজ্ঞানীদের সমস্যা হবারই কথা!
নিউট্রিনো তিন প্রকার। হিসেবের মাঝে তিন প্রকার নিউট্রিনোর দরকার
পড়ে তিন প্রকার ইলেকট্রনের জন্য।

- ৡ ইলেকট্রন-ইলেকট্রন: যাকে বলে "ইলেকট্রন" (সত্যিকারের 'আসল' ইলেকট্রন)
- ৡ মিউ-ইলেকট্রন: যাকে বলে "মিউওন"
- ⊗ টাউ-ইলেকট্রন: যাকে বলে "টাউওন"

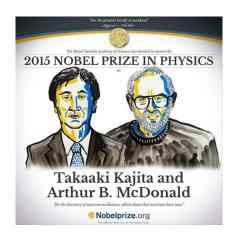
এই প্রতিটি কণার সাথে আছে একটি করে নিউট্রিনো।

- ⊗ ইলেকট্রন নিউট্রিনো
- 🗞 মিউ নিউট্রিনো
- ⊗ টাউ নিউট্রিনো

এক পলকে নিউট্রিনোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

- ১৯৩১- বিজ্ঞানী উলফগ্যাং পাউলি নিউট্রিনোর অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা করেন ও ভবিষ্যদ্বাণী করেন। ইলেকট্রনের ভর, শক্তি, ভরবেগ ইত্যাদির হিসাব মিলাতে গিয়ে তিনি এটি লক্ষ করেন।
- ১৯৩২- এনরিকো ফার্মি এর নাম দেন নিউট্রিনো।
- ১৯৩৪- এনরিকো ফার্মি নিউট্রিনোকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি তত্ত্ব দাড করান।
- ১৯৫৬- পরীক্ষার মাধ্যমে সর্বপ্রথম নিউট্রিনো আবিষ্কার করা হয়।

- ১৯৬২- নিউট্রিনোর অন্য একটি প্রকারভেদ 'মিউ নিউট্রিনো' আবি-স্কার।
- ১৯৬৮- সূর্য থেকে আগত নিউট্রিনো খুঁজে পেতে বিজ্ঞানীরা প্রথম কোনো পরীক্ষা চালায়।
- ১৯৭৮- স্ট্যানফোর্ড লিনিয়ার নিক্ষেপকে টাউ লেপটন আবিষ্কৃত হয়। তাতে টাউ নিউট্রিনোর অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা করা হয়। এবং তাতে সে কণার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়।
- ১৯৮৫- নিউট্রিনোর ভর শূন্য নয় এমন ফলাফল প্রকাশ করা হয়। গবেষণায় ছিল আই.বি.এম. ও রাশিয়ান টিম।
- ১৯৮৭- ক্যামিওক্যান্ড ও রাশিয়ান টিম সুপারনোভা থেকে আগত নিউট্রিনো শনাক্ত করে।
- ১৯৮৮- ৬২ সালের নিউট্রিনোর একটি প্রকারভেদ আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানীদের নোবেল পুরস্কার প্রদান।
- ১৯৮৯- ক্যামিওক্যান্ড আরেকটি গবেষণায় সূর্য থেকে আগত নিউ-ট্রিনো পরিমাপ করে এবং দেখতে পায় সূর্য থেকে যে পরিমাণ নিউট্রিনো ছুটে আসার কথা সে পরিমাণ আসে না। কম আসে। তিন ভাগের এক ভাগ।
- ১৯৯০- আই.বি.এম. সূর্যের আগত তিন ভাগের এক ভাগ নিউট্রিনো বিষয়ক সমস্যার সঠিক কারণ খুঁজে পায়।
- ১৯৯৮- এই সময়ে বিজ্ঞানীরা একেবারে নিশ্চিত হয়ে ঘোষণা করলেন যে নিউট্রিনোর ভর আছে।
- ২০০০- ভবিষ্যদ্বাণী করা টাউ নিওট্রিনোকে খুঁজে পাওয়া যায়।
- ২০০২- সূর্যের নিউট্রিনো সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীদের নোবেল পুরষ্কার দেয়া হয়।
- ২০১৫- নিউট্রিনোরা যে নিজেদের সত্ত্বা পরিবর্তন করে, মানে এক প্রকার নিউট্রিনো থেকে আরেক প্রকার নিউট্রিনোতে পালটে যেতে পারে এই ব্যাপারটা আবিষ্কারের জন্য তাকাকি কাজিতা ও আর্থার ম্যাকডোনাল্ডকে নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়।



এবার ২০১৫ সালেও পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরষ্কার নিউট্রিনোর উপর গেলো। এই একটি মৌলিক কণার উপর চার চারটি নোবেল গিয়েছে-১৯৮৮, ১৯৯৫, ২০০২ ও ২০১৫। অন্য কণার উপর এত পরিমাণ নোবেল কমই গিয়েছে। ফোটন আর ইলেকট্রন বাদে। এত পরিমাণ নোবেল পুরষ্কার এই কণা নিয়ে গবেষণার উপর গিয়েছে তার একমাত্র কারণ কণাটির রহস্যময়তা। অনায়াসেই বলা যায় ভবিষ্যতেও এর উপরে নোবেল যাবে। এই কণাটি নিয়ে একটি রহস্যের কিনারা হয়, তো আরো দশটি রহস্যের সূচনা হয়। একটি প্রশ্নের সমাধান হয় তো, পরে ঐ সমাধানের হাত ধরে আরো দশটি প্রশ্নের উদয় হয়।

একেকটি রহস্যের সমাধানের সাথে পদার্থবিজ্ঞানের, মহাকাশ বিজ্ঞানের অনেক অজানা রহস্যের সমাধান হয়। এই কারণেই এই কণার উপর গবেষণা খুব মূল্যবান হিসেবে দেখা হয়।

তথ্যসূত্র

♦ Frank Close. Ghost of the Universe (2011) – Soapbox Science.

- Martin Hirsch, Heinrich Päs, Werner Porod. Neutrino Experiments Light the Way to New Physics (2013) − Scientific American.
- 🗞 ড. এ.এম. হারুন অর রশীদ. অপ্রকাশলোকের সন্ধানে.
- 🗞 বিজ্ঞান প্রজন্ম প্রথম আলো.
- ♦ Neutrino Wikipedia.
- 象 মুহম্মদ জাফর ইকবাল. আরও একটুখানি বিজ্ঞান (2010).
- ♦ Geoff Brumfiel. "Neutrinos not faster than light" (2012) - Nature News.
- ♦ The Nobel Prize in Physics 2015 nobelprize.org.
- ♦ All Nobel Prizes in Physics nobelprize.org.

দ্রষ্টব্য: লেখাটি মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী 'জিরো টু ইনফিনিটি'র নভেম্বর ২০১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

§ à



বাংলাদেশে ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ

আমানুল ইসলাম

ধূমকেতু শব্দের মানে ধোঁয়ার নিশান। ওর চেহারা দেখে নামটার উৎপত্তি। গোল মুন্ড আর তার পিছনে উড়ছে উজ্জ্বল একটা লম্বা পুচ্ছ। এই পুচ্ছটা অতি সৃক্ষ্ম বাষ্পের।

> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বপরিচয়

বীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিশ্বপরিচয় গ্রন্থে ধূমকেতুর পরিচয় ঠিক এভাবেই তুলে ধরেছেন। ধূমকেতু সৌরজগতের আদি বস্তুসমূহের অন্যতম। যেসব বছর আকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে সেবছরগুলো জ্যোতির্বিদ ও আকাশপ্রেমীদের জন্য থাকে খুব আনন্দের। বেশিরভাগ ধূমকেতুর আলো খালি চোখে দেখতে পাবার মতো তেমন উজ্জ্বল হয়না। এটি উজ্জ্বল না অনুজ্জ্বল দেখা যাবে তা নির্ভর করে সূর্য, পৃথিবী এবং এর নিজের দূরত্বের উপর। সেক্ষেত্রে আকাশে যে ধূমকেতু দেখা দিয়েছে তা সাধারণ লোকে জানতেও পারেনা। তাই আকাশে ধূমকেতু দেখতে পাওয়াটা এমনিতে বিরল সুযোগ। স্বাধীনতার পর থেকে এপর্যন্ত নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বাংলাদেশ থেকে যেসব ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের কথা জানা গেছে এখানে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

হ্যালির ধূমকেতু (১৯৮৫-১৯৮৬)

হ্যালি একটি অতি পরিচিত ও বিখ্যাত ধূমকেতু। এডমন্ড হ্যালি নামে সতের-আঠার শতকের একজন ইংরেজ জ্যোতির্বিদের নামে এর নামকরণ। প্রতি ৭৫-৭৬ বছর পর পর এটি পৃথিবীর আকাশে দেখা দেয়। এজন্য একে বলা হয় প্রত্যাবর্তনশীল ধূমকেতু। ১৯৮৬ সালের ১১ এপ্রিল তারিখে এই ধূমকেতু পৃথিবীর কাছাকাছি অর্থাৎ ছকোটি কিলোমিটারের মধ্যে পৌছায়।

১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসের দিকে ঢাকার মেরুল বাড্ডা থেকে বিজ্ঞান সংগঠন অনুসন্ধিৎসু চক্রের সদস্যরা প্রথম হ্যালির ধূমকেতু সনাক্ত করেন। ধূমকেতুটি তখন তুলনামূলক অনুজ্জ্বল ছিলো। প্রায় দুইমাস চেষ্টার পরে তারা ধূমকেতুটি খুজে পান। অ. চক্রে তখন ছিলেন ড. এ.আর.খান, মো. শাহজাহান মৃধা বেনু, সিরাজুল ইসলাম সিজার, আজহারুল হক সেলিম, আতাউল হাকিম, আরকানউল্লাহ হারুনী ও রফিকুল্লা সেলিম। ধূমকেতুটি পর্যবেক্ষণের জন্য চক্রের উদ্যোগে সেসময় একটি সাড়ে সাত ইঞ্চি টেলিস্কোপ তৈরি করা হয়। টেলিস্কোপটি তৈরিতে যে লেন্স ব্যবহার করা হয় সেটি ১৯৬৫ সালে ড. এ.আর. খান লন্ডনে যখন গবেষণার কাজে গিয়েছিলেন সেখানে একটি নিলামের দোকান থেকে একটি জার্মান ক্যামেরা কিনেছিলেন তা থেকে নেয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীতে এই ক্যামেরাগুলো তৈরি হয়েছিলো আকাশ থেকে গোপন যুদ্ধক্ষেত্রে ছবি তোলার জন্য। যাই হোক, এই টেলিস্কোপে বাংলাদেশে প্রথম হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরে এটি ব্যবহার করে ধূমকেতুটির ছবি তোলা হয়। একই সময়ে অ. চক্রের সহযোগিতায় জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘর আট ইঞ্চি টেলিস্কোপ কিনে নিয়ে আসে। এই দুটি টেলিস্কোপ দিয়ে প্রতিদিন রাতে নিয়মিত ধূমকেতু দেখানো হত। ফলে দেশে হ্যালির ধূমকেতু দেখার উৎসাহ সৃষ্টি হয়। ১৯৮৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত টেলিস্কোপে হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করা হয়। শেষের দিকে সূর্য উদয়ের পর পুবাকাশে খালি চোখেই হ্যালির ধূমকেতু দেখা যেতো। অনুসন্ধিৎসু চক্র ঢাকার তিতুমীর কলেজ, কাচপুর, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ আটটি স্থানে হ্যালীর ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করে। জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘর কর্তৃপক্ষও ঢাকায় ক্যাম্প পরিচালনা করে। ক্যাম্প চলাকালীন সময় ড. এ.এফ.এম.এ. গনি হ্যালীর ধূমকেতুর ছবি তোলেন। এতে তিনি আট ইঞ্চি স্মিডট টেলিস্কোপের সহযোগিতা নেন।

হেল-বপ ধূমকেতু (১৯৯৬-১৯৯৭)

হেল-বপ ছিলো গত শতাব্দীর উজ্জ্বলতম ধূমকেতু। এলান হেল ও টমাস বপ ধূমকেতুটির আবিষ্কারক। ১৮ মাস ধরে এটি খালি চোখে দৃশ্যমান ছিলো। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে সৌখিন জ্যোতির্বিদ সৈয়দ আশরাফউদ্দিন শুভ বাংলাদেশ থেকে প্রথম হেল-বপ ধূমকেতুটি খুঁজে পান। এসময় ড.এ.আর.খানের সহযোগিতায় ধূমকেতুটির একটি এফিমেরিস তৈরি করা হয়। এরপর ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ থেকে বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশনের সদস্যরা হেল-বপ ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করেছে। পর্যবেক্ষণে বাইনোকুলার থেকে সর্বোচ্চ তিন ইঞ্চি প্রতিসরণ টেলিস্কোপ এবং একটি ৪.৫ ইঞ্চি প্রতিফলক টেলিস্কোপ ব্যবহার করা হয়।

হায়াকুতাকা ধূমকেতু (১৯৯৬)

জাপানের ইউজি হায়াকুতাকা ধূমকেতুটির আবিষ্কারক। বিগত দুইশত বছরের মধ্যে হায়াকুতাকা ধূমকেতুটির মতো আর কোন ধূমকেতু পৃথিবীর এতো নিকট দিয়ে অতিক্রম করেনি। বছরের মার্চ ও এপ্রিল মাসে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃপক্ষ হায়াকুতাকা ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করে। বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশনও ধানমন্তি মাঠে এপ্রিল মাসে ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করে। জ্যোতির্বিদ ড.এ.আর.খান ২৪ মার্চ, ১৯৯৬ তারিখে হায়াকুতাকা ধূমকেতুর একটি ছবি তোলেন। তাঁর তোলা ছবি দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকায় ছাপা হয়।

আইসন ও লাভজয় ধূমকেতু (২০১৩)

বিগত অনেক বছরের মধ্যে ও আগামী বহু বছরের মধ্যে দেখা যাওয়া উজ্জ্বল ধূমকেতুটির মধ্যে আইসনকে (ISON) অন্যতম ধরা হয়েছিলো। এই ধূমকেতু সৌরজগতের একেবারে শেষপ্রান্তে ওর্ট মেঘ অঞ্চল থেকে দশহাজার বছর আগে যাত্রা শুরু করে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে টেলিস্কোপে পৃথিবীর মানুষের চোখে ধরা পড়ে। ওর্ট মেঘ থেকে আগত বেশিরভাগ ধূমকেতুই পুনরায় আর ফিরে আসেনা। বাংলাদেশ থেকে ISON ধূমকেতুটি সনাক্তকরণ ও ছবি তুলতে সক্ষম হয় একমাত্র

অনুসন্ধিৎসু চক্র। টেলিস্কোপ ব্যবহার করে প্রায় দেড় মাস চেষ্টার পর ধূমকেতুটি খুঁজে পায় সংগঠনের সদস্যরা। অনুসন্ধিৎসু চক্রের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি মো: শাহজাহান মৃধার নেতৃত্বে প্রথম পর্যায়ে ২০১৩ সালের ৩ নভেম্বর রবিবার ভোর পাঁচটায় মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার শিমুলিয়া গ্রামে (অক্ষাংশ-৯০°১৮মি. পূর্ব ও দ্রাঘিমাংশ-২৩°২৮মি. উত্তর বা কর্কটক্রান্তি রেখা) চক্র আয়োজিত আকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প থেকে আইসন ধূমকেতু সনাক্ত করা হয়। ISON ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ দলে আরো ছিলেন অ. চক্রের আজীবন সদস্য আজহারুল হক, আরাফাত রহমান, নিয়াজ মোর্শেদ, জাহাঙ্গীর আলম দীপু ও আল ইমরান চৌধুরী। দিতীয় পর্যায়ে, অ. চক্রের পর্যবেক্ষণ দলের কর্মীরা মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার খইরা গ্রামে রাতের বেলা পরবর্তী ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পে ৮ ইঞ্চি মিড ক্যাসিগ্রেইন টেলিস্কোপ ও ক্যানন EOF 5D ক্যামেরা দিয়ে আইসন ধূমকেতুর ছবি তুলতে সক্ষম হন তারা। ছবির এক্সপোজার সময় ছিলো- ৩ মিনিট। আইসন ধূমকেতুটির বিষয়ে আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য উক্ত ছবিটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থার নিকট প্রেরণ করে নিশ্চিত করা হয়। সহযোগিতা করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত জ্যোতির্বিদ ড. দীপেন ভট্টাচার্য। আইসনের উজ্জ্বলতা সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে যেরকম ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছিলো, ধূমকেতুটি সে অনুপাতে উজ্জ্বল ছিলোনা। পর্যবেক্ষণকালে আইসনের উজ্জ্বলতা ছিলো ৭.৫।

পরে ঢাকা থেকেও আইসন ধুমকেতু দেখতে সক্ষম হয় অনুসন্ধিৎসু চক্রের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগ। অনুসন্ধিৎসু চক্রের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের সদস্যরা ১৬ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে ভোর সাড়ে চারটার দিকে কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম থেকে আকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প থেকে ৮ ইঞ্চি প্রতিফলক টেলিক্ষোপ ও ক্যানন ক্যামেরা দিয়ে আইসন ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ ও ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে সক্ষম হয়। এরপরই দেশের আকাশ থেকে সর্বসাধারণকে আইসন ধূমকেতু পর্যবেক্ষণে সহযোগিতা করার জন্য নিয়মিত বিভিন্ন তথ্য ও ভ্রমণপথ বিষয়ে অবহিত করা হয় অনুসন্ধিৎসু চক্রের পক্ষ থেকে। জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন সংবাদ মাধ্যম সমূহ এ বিষয়ক খবর প্রকাশ করে।

২৮ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখ ছিলো ধূমকেতু আইসনের সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি 'অনুসূর' বিন্দুতে থাকার দিন। সেমসয় আইসন সূর্য পৃষ্ঠের মাত্র ১১ লক্ষ কিলোমিটার কাছে ছিলো। সূর্যের এত কাছ দিয়ে যায় বলে এ ধরনের ধূমকেতুকে সূর্যস্পর্শী ধূমকেতু বলা হয়। আশা করা হচ্ছিল, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই খালি চোখে দেখতে পাওয়া যাবে ধূমকেতু আইসনকে। কিন্তু সূর্যের বেশী কাছে চলে যাওয়াতে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তা।

২০১৩ সালে আকাশে যখন ধূমকেতু আইসন তখন আরেকটি ধূমকেতু আলোড়ন তুলেছিল আকাশমোদী মানুষের মাঝে। ধূমকেতুটির নাম লাভজয়। অস্ট্রেলিয়ান পর্যবেক্ষক টেরি লাভজয় ধূমকেতুটি আবিষ্কার করেন বলে নাম হয়েছে লাভজয়। অনুসন্ধিৎসু চক্রের ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ দলের সদস্যরা ১১ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে ১২/এ, ইস্কাটন গার্ডেনের ১৯ তলা ভবনের ছাদ থেকে রাত দুইটার দিকে ৮ ইঞ্চি মিড প্রতিফলক দুরবিন দিয়ে ধূমকেতুটি খুঁজে পান। তারা সেই দুরবিন ও ক্যানন ক্যামেরা দিয়ে লাভজয় ধূমকেতুটির ছবি তোলেন। ছবির এক্সপোজার সময় ছিলো ১০ সেকেন্ড। ছবি তোলার সময় ধূমকেতুটি সিংহ তারামন্ডলের কাপ্পা লিওনিস তারার নিকটে অবস্থান করছিলো। ১৯ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে ধূমকেতুটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে। লাভজয় ধূমকেতুটির পরবর্তী অনুসূরের জন্য প্রায় ৭০০০ বছর অপেক্ষা করতে হবে।

তথ্যসূত্র

- ৡ তারা পরিচিতি, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার; ২য় প্রকাশের ভূমিকা,
 ১৯৯৪; বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশন।
- ⊗ ৩০ আগস্ট, ২০০৩; দৈনিক জনকণ্ঠ।

😵 ধানশালিকের দেশ (ধূমকেতু সংখ্যা); ২৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৯৭; বাংলা একাডেমী।

সৌজন্যে: অনুসন্ধিৎসু চক্র বিজ্ঞান সংগঠন



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

§ 30



আইনস্টাইনের ডেস্ক ও রহস্যময় জড়পদার্থ

হিমাংশু কর

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

জ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর, বিশ্বের সব পত্রিকায়ই একটি অগোছালো ডেক্ষের ছবি ছাপা হয়। ডেস্কটি
স্বয়ং আলবার্ট আইনস্টাইনের। ডেক্ষের ছবির সাথে পত্রিকার
শিরোনাম করা হয়, "The unfinished manuscript of the
greatest work, of the greatest scientist of our time"।
পুরো বিশ্বই তখন এই কিংবদন্তী বিজ্ঞানীর আলোচনায় মুখর। কিন্তু
বিজ্ঞানে আগ্রহী যেকোনো লোকেরই কৌতৃহল জাগবে, কি সেই অসমাপ্ত
কাজ? আর কেনই বা তার মত একজন কিংবদন্তী বিজ্ঞানী তা শেষ
করে যেতে পারলেন না? আইনস্টাইন তার জীবনের শেষ ৩৫ বছর
এই অসমাপ্ত কাজ শেষ করার চেস্টা করে গেছেন, কিন্তু কোনভাবেই
কুল-কিনারা করতে পারেন নি। সাধারন মানুষের কাছে তাই সবচেয়ে
বড় ধাধা ছিল, কি এমন কাজ যা আইনস্টাইনের মত একজন বিজ্ঞানী তার জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত চেস্টা করেও সফল হতে পারলেন না!



চিত্র ১০.১: আলবার্ট আইনস্টাইনের ডেস্ক

আইনস্টাইন বেচে থাকতেই তার নামে অনেক মিথ প্রচলিত ছিল। বেশি-রভাগ মানুষেরই ধারনা ছিল, তিনি মহাবিশ্ব সম্পর্কে এমন কিছু বুঝতে সক্ষম যা সাধারন মানুষ কখনই বুঝতে পারবে না। তার আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়েও অনেক কল্পকাহিনী প্রচলিত ছিল। তবে এটিও সত্য যে, সে সময়ে তার 'আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব' বোঝার মত লোক খুব কমই ছিল।বিজ্ঞানী এডিংটন ছিলেন তার আপেক্ষিক তত্ত্বের একজন জোরালো

সমর্থক। জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও আপেক্ষিক তত্ত্বের বক্তৃতা দিয়ে ততদিনে তার বেশ সুনামও হয়ে গেছে। একদিন এডিংটনকে বলা হল, 'আপনিসহ মোট তিনজন ব্যক্তি আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব বুঝতে পারে'। একথা বলার পর এডিংটন কিছুক্ষন কোন কথা বললেন না। তখন সবার মনে হয়েছিল, এডিংটন বুঝি বিনয় দেখিয়ে চুপচাপ আছে। বিষয়টি বুঝতে পেরে এডিংটন বলল, 'আসলে আমি ভেবে পাচ্ছিনা, তৃতীয় ব্যক্তিটি কে?'

এডিংটনের পরবর্তী সময়ের কারো মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, কেমন সেই তত্ত্ব, আইনস্টাইনের মত লোকও যার সমাধান করতে চেয়ে কোন সুবিধা করতে পারেন নি! তিনি যে তত্ত্বের জন্য তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে গেছেন তার নাম, ইউনিফাইড ফিন্ড থিওরি (Unified Field Theory) বা 'সমন্বিত ক্ষেত্র তত্ত্ব'। তিনি এমন একটি তত্ত্ব গঠন করতে চেয়েছিলেন, যা প্রকৃতির জানা সকল বল ও ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে; এমন একটি সমীকরণ, যা দিয়ে প্রকৃতির সবকিছু বর্ণনা করা যায়। আইনস্টাইনের বিশ্বাস ছিল, এমন একটি তত্ত্ব অবশ্যই আছে, যা দিয়েই প্রকৃতির সবকিছু বর্ণনা করা যাবে। কিন্তু সে সময়ের বিজ্ঞানীরা তার এই চিন্তাকে তেমন একটা গুরুত্ব দেননি। তারা মনে করেছিল, এমন কোন তত্ত্বের সন্ধান করা সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই না।

আসলে আইনস্টাইন ছিলেন তার সময়ের চেয়ে অনেক অগ্রগামী। তার সময়ের বিজ্ঞানীরা সে সময় এমন একটি তত্ত্বের গুরুত্বই বুঝতে পারে নি। কিন্তু আইনস্টাইন মারা যাবার দশক দুয়েক পরেই বেশ কিছু বড়সর পরিবর্তন আসে। ষাটের দশকের শেষের দিকে বিজ্ঞানীরা এমন একটি তত্ত্বের প্রয়োজন অনুভব করেন। তখন নতুন নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে পরমানুর জগত ও মহাকাশের অনেক অজানা রহস্য উন্মোচিত হতে থাকে। এসময় তাদের প্রধান লক্ষ হয়ে দ্বারায় এমন একটি তত্ত্ব নির্মাণ করা, যা প্রকৃতির সবগুলো বলকে একিভূত করতে পারে। মূলধারার গবেষকরা বুঝতে পারেন, প্রকৃতিতে যে চারটি মৌলিক বল আছে তাদের একীভূত না করতে পারলে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না। আর প্রকৃতিকেও বোঝা সম্ভব না। আইনস্টাইনের স্বপ্লের

'ইউনিফাইড ফিন্ড থিওরি' তখন বিজ্ঞানীদের বাস্তব প্রয়োজন হয়ে দ্বারায়।

রহস্যময় গুপ্ত পদার্থ ও রহস্যময় শক্তি

কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়, আমাদের মহাবিশ্বের সবকিছু কি দিয়ে গঠিত? তাহলে সবাই বলবে. কেন পরমাণু দিয়ে গঠিত! যারা বিজ্ঞান সম্পর্কে অল্পকিছু জানে তারা বলবে- ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে সকল পরমানু গঠিত, তাই সবকিছুই এই ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রন দিয়েই গঠিত। এতসব কথা আমরা জেনেছি সেটি কিন্তু খুব বেশি দিন আগে নয়। দার্শনিক এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিঃপূঃ) মনে করতেন, আমাদের মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তা সবই 'মাটি', 'পানি', 'আগুন' আর 'আগুন' এই চারটি মৌলিক জিনিস দিয়ে গঠিত। তিনি এমনই প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন যে, তার মৃত্যুর পরও প্রায় দুই হাজার বছর মানুষ এই কথাই মেনে নিয়েছিল। তবে ভিন্ন মত যে একেবারেই ছিলনা তা নয়।ডেমোক্রিটাস নামে এক গ্রিক মনে করতেন ব্যাপারটি এমন নয়। তিনি ভাবতেন, কোন পদার্থকে ভাঙ্গলে দেখা যাবে এরা খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কনা দিয়ে গঠিত।^১ তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে. এসব কনাকে আর ভাঙ্গা যাবে না। তিনি এসব অবিভাজ্য কনার নাম দেন এটম বা পরমানু। কিন্তু এরিস্টটল বা ডেমোক্রিটাস কারও কথার পক্ষেই কোন প্রমান ছিল না।

১৯১১ সালে আর্নেস্ট রাদারফোর্ড নামে একজন পদার্থবিজ্ঞানী পরি-ক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি পরমানু মডেল প্রস্তাব করেন। পরবর্তীতে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেই মডেলের উন্নতি করা হয়। আর একথাও প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সকল পদার্থই পরমানু দিয়ে গঠিত; তবে এসব পরমানুও অবিভাজ্য নয়। পরমানুগুলো ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন

^{ু &#}x27;ডেমোক্রিটাস ছাড়াও ভারতীয় দার্শনিক কনাদ মনে করতেন, প্রকৃতির সব বস্তুকনিকাই অবিভাজ্য কণিকা দ্বারা গঠিত।

নামে মৌলিক কনিকা দিয়ে গঠিত।

প্রকৃতিকে প্রথমে যতটা সহজ সরল বলে ভাবা হয়েছিল, দেখা গেল ব্যাপারটা মোটেই সেরকম না। বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন, কোন সহজ উপায়েই পরমানুর ভেতরে থাকা অতি-পারমানবিক কনাদের আচরন ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। গবেষণা চলতেই থাকল। পরবর্তী গবেষণায় বেরিয়ে এল আরও আশ্চর্য তথ্য। প্রোটন, নিউট্রনকে আমরা যেমন অবিভাজ্য ও মৌলিক কনা বলে ভেবে এসেছি, সেগুলো আসলে অবিভাজ্য না। প্রোটন ও নিউট্রনগুলো 'কোয়ার্ক' নামে এক ধরনের কনা দিয়ে গঠিত। তিনটি কোয়ার্ক মিলে তৈরি হয় একটি প্রোটন বা নিউট্রন। পার্টিক্যাল এক্সিলারেটরের ভিতর পরমাণুর নিউক্রিয়াসকে ভেঙ্গে আরও অনেক অস্থায়ী অতিপারমানবিক কনিকার অন্তিত্ব পাওয়া গেল। তবে এরা সবাই কিন্তু পদার্থের কনিকা। এটুকু আমরা জানতে পারলাম, সকল প্রকার পদার্থ পরমাণু দিয়েই গঠিত আর এসব পরমাণু বিভিন্ন অতি-পারমানবিক কনা দিয়ে তৈরি।

ব্যাপারটি কিন্তু এমন না যে, শুধু আমাদের পৃথিবী বা অন্য গ্রহণ্ডলো এই মৌলিক কনিকা দিয়ে গঠিত। বিজ্ঞানীরা দেখলেন আমাদের সৌর-জগৎ, মিক্কিওয়ে গ্যালাক্সি এমনকি মহাবিশ্বে যত নীহারিকা,ধুমকেতু বা মহাজাগতিক ধূলিকণা আছে তার সবকিছুই আমাদের চেনাজানা পদার্থ দিয়েই গঠিত। দূর মহাকাশের কোন নক্ষত্র থেকে আসা আলোর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বলে দিতে পারেন সেই নক্ষত্রটিতে কি কি উপাদান আছে।তার মানে দাঁড়াচ্ছে, আমাদের মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তা মুলত এই পরমাণু বা তার অতি-পারমাণবিক কনিকার সমন্বয়েই গঠিত।

সবকিছু ঠিকই ছিল। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের প্রথম দিকে, ভেরা রুবিন নামে একজন বিজ্ঞানী আমাদের মিক্ষিওয়ে গ্যালাক্সির ঘূর্ণন নিয়ে গবেষণা করার সময়, একটি আশ্চর্য জিনিস দেখতে পেলেন। রুবিন দেখলেন, আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী নক্ষত্রগুলোর গতি যেমন হবার

কথা, সেগুলোর গতি মোটেই সে রকম না। মূলত নিউটনের মহাকর্ষ সুত্র অনুসারে গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে যত দূরে যাবার কথা, নক্ষত্রগুলোর গতিও তত কমে যাওয়া উচিত। কারন কোন বস্তু থেকে যত দূরে যাওয়া যায়, মহাকর্ষ বলের পরিমান ততই কমতে থাকে। তাই একটি নক্ষত্র গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে যত দূরে হবে, তার গতিবেগও তত কম হবে। আমাদের সৌরজগতের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটাই ঘটে। আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে আছে সূর্য। আর যে গ্রহ সূর্য থেকে যত বেশি দূরে, তার গতিবেগও তত কম। তাই আমাদের গ্যালাক্সির ক্ষেত্রেও এমনই হবার কথা।কিন্তু রুবিনের পর্যবেক্ষণ থেকে দূরবর্তী নক্ষত্রগুলোর গতিবেগ তো কম পাওয়া গেলই না, বরং দেখা গেল একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের পর সব নক্ষত্রের বেগই প্রায় একই রকম। প্রথমে মনে করা হয়েছিল রুবিনের গননায় হয়ত কোন ভুল আছে। কিন্তু পরে দেখা গেল শুধু আমাদের মিল্কিওয়েই না, আমাদের পাশে এন্ডুমিডা নামে যে সর্পিল গ্যালাক্সিটি আছে তার অবস্থাও একই রকম। এই রহস্যময় গতি লক্ষ্য করার পর বিজ্ঞানীরা এই বিষয়টি নিয়ে আরও অনেক অনুসন্ধান করতে থাকলেন। পরবর্তীতে গ্যালাক্সির ঘূর্ণন, এদের ছড়িয়ে পরার বেগ, গ্যালাক্সি ক্লাস্টার, মহাকর্ষীয় লেন্সিং, মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করে বোঝা গেল, গ্যালাক্সির ভিতরে আমাদের চেনাজানা পদার্থের বাইরেও বিপুল পরিমাণ রহস্যময় কোন পদার্থ আছে। এদের নাম দেওয়া হল 'ডার্ক ম্যাটার' বা গুপ্ত পদার্থ।

ভার্ক ম্যাটার শুধু নামেই ডার্ক না, এরা আসলেই পুরোপুরি অদৃশ্য। কোন ভাবেই এদের পর্যবেক্ষণ করার কোন উপায় নেই।তাদের উপস্থিতি জানার একমাত্র উপায় হল তাদের মহাকর্ষ বল। আমাদের মিক্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে যে পরিমাণ ডার্ক ম্যাটার আছে তাদের মহাকর্ষ বল এতো বেশি যে, আমাদের গ্যালাক্সির সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র মিলিয়ে তার দশ ভাগের এক ভাগও না (৯৫% ডার্ক ম্যাটার, ৫% পদার্থ)। তাহলে বোঝা যাচ্ছে কি বিশাল পরিমাণ ডার্ক ম্যাটার লুকিয়ে আছে আমাদের মহাবিশ্বে। বিজ্ঞানীদের বর্তমান গবেষণা বলছে আমাদের মহাবিশ্বের মোট শক্তি ও পদার্থের ২৩% ই হল এই ধরনের ডার্ক ম্যাটার। বিজ্ঞানীরা



চিত্র ১০.২: ডার্ক ম্যাটারের ত্রিমাত্রিক মানচিত্র

ইতিমধ্যে গ্যালাক্সির মধ্যে কোথায় কোথায় এই ডার্ক ম্যাটার আছে তার একটি ত্রিমাত্রিক মানচিত্রও তৈরি করে ফেলেছেন।

যদিও বিজ্ঞানীদের গননা অনুসারে বর্তমান মহাবিশ্বের মোট ভরের প্রায় ২৩% এই রহস্যময় গুপু পদার্থ, কিন্তু তারা এটাও ধারনা করছেন-মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুর সময়গুলোতে এই ডার্ক ম্যাটারের পরিমাণই ছিল বেশি, প্রায় ৮০ থেকে ৯০ ভাগ। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুর দিকের সবকিছু ভাল মত বোঝার জন্য এই রহস্যময় জড় পদার্থগুলোর আচরন বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এত গেল রহস্যময় গুপ্ত পদার্থের কথা। কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আরও এক ধরনের রহস্যময় বিষয় আবিষ্কার করেছেন। আইনস্টাইনের দেওয়া সুত্র অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা জানেন যে, মহাকর্ষ বল ক্রিয়াশীল থাকলে আমাদের মহাবিশ্বের প্রসারনের তীব্রতা এক সময় কমে আসবে। এই প্রসারন কতটা দ্রুত বাড়ছে বা কমছে তার উপরই নির্ভর করছে আমাদের মহাবিশ্বের ভবিষ্যুৎ। ১৯৯৮ সালে বিজ্ঞানীদের দুটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ, সুপার নোভা বিক্ষোরণ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাদের গবেষণায় এক আশ্বর্য বিষয় বেরিয়ে আসল। তারা লক্ষ্য করলেন আমাদের মহাবিশ্বের প্রসারনের হার তো কমছেই না বরং

দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে! মহাকর্ষ বল সবসময়ই আকর্ষনধর্মী। আর সে কারনেই মহাকাশের ছড়িয়ে থাকা হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম তাদের নিজেদের মধ্যে আকর্ষণের কারনে নিজেদের উপরই চুপসে পড়ে। এভাবে চুপসে যাবার ফলে তাদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, ফলে তাপমাত্রাও বাড়তে থাকে। এই তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে যখন নিউক্লীয় বিক্রিয়া হবার মত উপযোগী তাপমাত্রায় পৌছায়, তখনই জন্ম নেয় নক্ষত্র। আমাদের সূর্যও ঠিক এভাবেই মহাকাশের জমে থাকা হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের ধূলিকণা থেকে জন্ম নিয়ে এখন একটি সাম্যাবস্থায় আছে।এর হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে নিজের ভিতরে চুপসে যাচ্ছে, আর ভিতরের ঘটতে থাকা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া, সব কিছুকে বাইরের দিকে ঠেলে একে সাম্যাবস্থায় রেখেছে। নিউক্লীয় বিক্রিয়ার ভর ক্ষয় হতে হতে যখন মহাকর্ষের টান কমে যাবে, তখন ভিতরের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার ফলে তৈরি হওয়া শক্তির পরিমাণ যাবে অনেক বেড়ে। তাই সে তখন আর সাম্যাবস্থায় থাকবে না। সু-পার নোভা বিক্ষোরণের মাধ্যমে তার জ্বলজ্বলে জীবন শেষ করে ফেলবে।

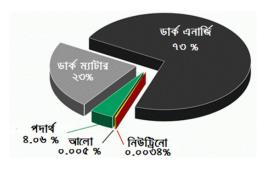
আবার কোন বস্তুকে পৃথিবী থেকে উপরে ছুরে দিলে দেখা যায়, ধীরে ধীরে তার বেগ কমে আসছে। বস্তুটির উপর মহাকর্ষ বল কাজ করে বলেই তার বেগ কমতে থাকে। আমাদের মহাবিশ্বের সব বস্তুগুলোও একটি বিক্ষোরণের ফলে চারদিকে ছুটে যেতে শুরু করেছিল। আর এই মহাকর্ষের কারনেই মহাবিশ্বের প্রসারণে হারও ধীরে ধীরে কমে আসা উচিত। কিন্তু বিজ্ঞানীরা দেখলেন ব্যাপারটি আসলে তেমন ঘটছে না। কোন এক রহস্যময় শক্তির প্রভাবে মহাকর্ষের আকর্ষণ কাটিয়ে, মহাবিশ্ব তার প্রসারণের হার বাড়িয়েই চলেছে। পরবর্তীতে আরও পর্যবেক্ষণ ও পরিক্ষা করে বিজ্ঞানীরা এই রহস্যময় শক্তির ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন। এই রহস্যময় শক্তির নাম দেওয়া হয়েছে 'ডার্ক এনার্জি'। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হল, কোন ভাবেই এই 'ডার্ক এনার্জি' বা গুপ্ত শক্তির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। আরও অবাক করা তথ্য হল, আমাদের মহাবিশ্বের ৭৩% ই গঠিত এই ডার্ক এনার্জি দিয়ে!



চিত্র ১০.৩: ডার্ক এনার্জির কারনে মহাবিশ্বের প্রসারণের হার দিন দিন বাড়ছে

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি মহাবিশ্বের ২৩% ডার্ক ম্যাটার আর ৭৩% ডার্ক এনার্জি হয় তাহলে পদার্থের পরিমাণ কতটুকু?

বিজ্ঞানীদের বর্তমান পর্যবেক্ষণ ও গননা অনুযায়ী মহাবিশ্বের মোট পদার্থ ও শক্তির ৭৩% ই হল ডার্ক এনার্জি, ২৩% ডার্ক ম্যাটার, ৩.৬% মুক্ত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম (মহাজাগতিক ধূলিকণা) ও ০.৪% পদার্থ (যা দিয়ে উপগ্রহ,গ্রহ, নক্ষত্র,ধুমকেতু ইত্যাদি গঠিত)।



চিত্র ১০.৪: মহাবিশ্বের কেবন শতকরা ৪% ভাগ আমাদের চেনাজানা পদার্থ দিয়ে গঠিত। আর বাদবাকি সবই, ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমরা যাকে পদার্থ বলি তা মহাবিশ্বের মাত্র ৪ শতাংশ। আর বাদবাকি ৯৬% শতাংশই রহস্যময় গুপু পদার্থ আর গুপু শক্তি দিয়ে ভর্তি। আসলে আমরা মহাবিশ্বের দিকে তাকিয়ে যেসব জায়গাকে শুন্য বলে ভাবছি সেগুলো আসলে আক্ষরিক অর্থেই শুন্য না। আমাদের চেনা জানা পদার্থ দিয়ে তৈরি গ্রহ-নক্ষত্রগুলোই বরং এই অজানা বস্তুগুলোর মধ্যে ছোট্ট দ্বিপের মত নগন্য কিছু!

কারো কৌতৃহলী মনে যদি প্রশ্ন জাগে ডার্ক ম্যাটার আসলে কেমন? কেমন এই রহস্যময় শক্তি? তাহলে উত্তর দেওয়াটি কিন্তু একটু কঠিন হবে। কারন গতানুগতিক পদার্থবিদ্যার সাহায্যে এর উত্তর দেওয়া মুশকিল।পদার্থবিজ্ঞান এতদিন শুধু আমাদের চেনাজানা পদার্থ নিয়েই কাজ করে এসেছে। তাই আমাদের এমন একটি তত্ত্ব প্রয়োজন, যা আইনস্টাইনের 'ইউনিফাইড ফিন্ড থিওরির' মত এই মহাবিশ্বের সকল পদার্থ ও শক্তির ব্যাখ্যা করতে পারে। পদার্থবিজ্ঞান যে এসব গুপু পদার্থ ও শক্তির ব্যাখ্যা দিতে চেস্টা করছে না এমন নয়, কিন্তু গতানুগতিক তত্ত্ব দিয়ে এসব পদার্থের ব্যাখ্যাগুলো মোটেই আশানুরূপ নয়।

আইনস্টাইন তার আপেক্ষিক তত্ত্বের সফলতা নিয়ে খুশি ছিলেন না। তার ইচ্ছা ছিল প্রকৃতিকে আরও গভীর ভাবে বুঝতে পারা। প্রায় সময়ই বলতেন, তিনি ঈশ্বরের মন বুঝতে চান। তার সময়ে জানা দুটি মৌলিক বলকে ব্যাখ্যা করার জন্য দুটি তত্ত্ব ছিল। তড়িৎ-চুম্বক বলকে ব্যাখ্যা করার জন্য ছিল ম্যাক্সওয়েল তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্বের সমীকরন। এই সমীকরণগুলো স্থানের যেকোনো বিন্দুতে এই বলের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে পারত। আর মহাকর্ষ বল ও স্থান-কালের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য ছিল আইনস্টাইনের নিজের 'আপেক্ষিকতার সাধারন তত্ত্ব'। কিন্তু এই দুটি তত্ত্বকে কোনভাবেই একটির সাথে অন্যটিকে সমন্বিত করা যাচ্ছিল না। দুটি তত্ত্বই পৃথকভাবে খুবই সফল, কিন্তু দুটিকে এক করার কোন উপায় তিনি খুজে পাচ্ছিলেন না। আইনস্টাইনের বিশ্বাস ছিল এই দুটি তত্ত্বকে এক করতে পারলে আমরা আরও মৌলিক কোন তত্ত্ব পাব।যার সাহায্যে প্রকৃতির আরও গভীরের প্র-বেশ করা যাবে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, সেই তথাকথিত 'ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরি' গঠন করা সম্ভব হলে তিনি ঈশ্বরের মন বুঝতে পা-রবেন। আমরা পরে জানব তার সময়ে এটি কোনভাবেই সম্ভব ছিল না।

এখন প্রশ্ন হল, আমাদের হাতে কি এমন কোন একক তত্ত্ব নেই যা

ডার্ক ম্যাটারের মত অজানা বস্তু সহ সকল প্রকার পদার্থ ও শক্তির ব্যাখ্যা দিতে পারে? উত্তর হল হ্যাঁ। আমাদের কাছে এমন একটি তত্ত্ব আছে; আর সেটিই হল - স্ট্রিং থিওরি (String Theory) বা তার তত্ত্ব। স্ট্রিং থিওরিই একমাত্র তত্ত্ব যা প্রকৃতির সকল বস্তুকনার আচরণ ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি প্রকৃতিতে বিদ্যমান চারটি মৌলিক বলকেও একীভূত করতে পারে।

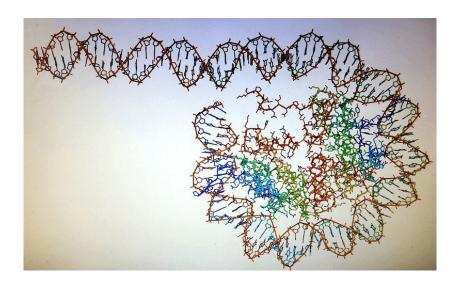
এই তত্ত্ব শুধু সকল প্রকার পদার্থ ও শক্তিকে বর্ণনাই করে না, পাশাপাশি এই মহাবিশ্ব কেন আছে তারও উত্তর দেয়। আরেকভাবে বললে বলা যায়, স্ট্রিং থিওরি আমাদের 'বিগ ব্যাঙ' বা মহাবিশ্ব সৃষ্টিরও আগে নিয়ে যায়। এই তত্ত্ব সেইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে চায়, হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ যার খোজ করে যাচছে। কেন এই মহাবিশ্ব? কেন কোনকিছু না থাকার বদলে কিছু আছে? এই সিরিজে আমি দেখানোর চেস্টা করব স্ট্রিং থিওরির এমন সব বৈশিষ্ট্য আছে যাতে এটি নিজেকে সবকিছুর তত্ত্ব বা 'Theory of Everything' বলে দাবি করতে পারে। আর এটিও বলতে পারে কেন এই মহাবিশ্ব?

বিঃদ্রঃ এই নিবন্ধটি মূলত স্ট্রিং থিওরি (২০১৫) বইয়ের জন্য লেখা।



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

8 22



আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর

অতনু চক্রবর্ত্তী

আকাশ ভরা, সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ, তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান...

ত্যি তাই। আকাশ জুড়ে অনন্ত নক্ষত্রের মেলা, যুগপৎ ভাবেই মহাবিশ্বে প্রতিটি জীবের অবস্থান কি অনন্ত বিশ্বয়ের আর কি অপরিসীম তাৎপর্যের! ভাবতেও অবাক লাগে। ভাবনার সাথেই মনের কোণে জেগে ওঠে অসংখ্য প্রশ্ন, শত ধারায় উৎসারিত হয় অফুরন্ত আবেগ। হদয়ের গভীরতম সেই তৃষ্ণার্ত প্রশ্ন গুলিকে জীববিজ্ঞান দেখাচ্ছে আলোর পথ। অপরিসীম সৌন্দর্যে ভরপুর বিজ্ঞানের এই শাখাটির চর্চার বদান্যতায়ই বিশ্বকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নতুন রূপে। মহাবিশ্বে সকল জীবকে উপলব্ধি করছি এক নতুন চেতনার সংমিশ্রণে!

রবিঠাকুরের "আবেদন"

১৩০২ বংগাব্দের কথা। বাইশে অগ্রহায়ণ শিলাইদহ অভিমুখে যাত্রা অভিমুখে লিখেছিলেন তাঁর আবেদন কবিতাখানি। যার কিছুটা এরকম:

ভূত্য: নানা কর্ম নানা পদ নিল তোর কাছে নানা জনে; এক কর্ম কেহ চাহে নাই, ভূত্য-'পরে দয়া করে দেহো মোরে তাই– আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর। রাণী: মালাকর?

ভূত্য: ক্ষুদ্র মালাকর.....র রাণী:কি কাজে লাগিবি?

ভূত্য:শত শত আনন্দের আয়োজন

.....রচি সে বিচিত্র মালা

রাণী:আবেদন তব করিনু গ্রহণ.....

তুই মোর মালঞ্চের হবি মালাকর।

প্রকৃতপক্ষে জীবনের অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিও সজ্জিত হয়ে আছে এরকম একটি দ্বিসূত্রক মালায়। এক চক্র আর দ্বি চক্রের বিভিন্ন পুঁতির সন্নিবেশে মালার গঠন। কিন্তু তাতেই কি অকল্পনীয় সুন্দর এটি! কি অপরিসীম বৈচিত্রোর ধারক!

পুরোনো সেই দিনের কথা



চিত্র ১১.১: বিজ্ঞানী মিয়েশ্চার

সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহরের কথা। জোহান ফ্রেডেরিখ মিশ্চেয়ার (১৮৪৪-১৮৯৫) ২৪ বছর বয়সে যখন চিকিৎসাবিজ্ঞানের ডিগ্রিটি যখন নিলেন তখন তাঁর মামা উইলহেলম হিজ উপদেশ দিলেন জৈবরসায়নের উপর শিক্ষা গ্রহণ করতে। মামার কথামতো মিশ্চেয়ার ভর্তি হলেন জার্মানর টুবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় এ। গবেষণা করতে লাগলেন বিখ্যাত জার্মান জীব রসায়নবিদ ফেলিক্স হপে সেলারের গবেষণাগারে। আমরা অনেকেই কিন্তু জানিনা যে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন জীবরসায়ন গবেষণাগারটিছিল জার্মানির নেকার নদীর তীরে এক বিশাল দুর্গে! দুর্গের প্রশস্ত দেয়ালে ছোট একটু জানালার সামান্য আলোয় প্রায়েন্ধকার উঁচু ছাদবিশিষ্ট স্যাঁতস্যাঁতে বিরাট ঘরে ফ্রাংকো প্রুশিয়ান যুদ্ধে আহত সৈনিকদের পুঁজ মাখা ব্যান্ডেজ নিয়ে কাজ করতে করতে একদিন মিশ্চেয়ার আবিষ্কার

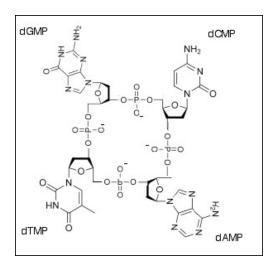
করলেন এমন এক জৈব রাসায়নিক বস্তু যাকে তিনি আখ্যায়িত করলেন Sui-Generis নামে। যার অর্থ অনেকটা - "এর কোন দ্বিতীয় রূপ নেই"। আসলে এটিই পরবর্তীতে আত্মপ্রকাশ করে নিউক্লিক এসিড নামে। এর সেই সূত্র ধরে প্রায় দেড় যুগ পরে আলব্রেখসৎ কোজেল নামে একজন বিজ্ঞানী অর্জন করেন নোবেল পুরস্কার। তিনি নোবেল পান "In recognition of the contributions to our knowledge of cell chemistry made through work on proteins, including the nucleic substances"। আসলে এই পথ ধরেই উন্মোচিত হতে থাকে মানব জীবনের রহস্য প্রকাশের রঙ্গমঞ্চের পর্দার । আর এভাবেই জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারা।

ফ্রেডরিখ মিয়েশ্চার হয়তো জানতেনই না যে তিনি সেই আলো আঁ-ধারি স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে যে আলোর সন্ধান দিয়েছিলেন সেই আলোকে আলোকজ্জ্বল হয়ে থাকবে পরবর্তী জীব রাসায়নিক গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্র!



চিত্র ১১.২: রূপকথার আলো এসেছিল এইখানেই

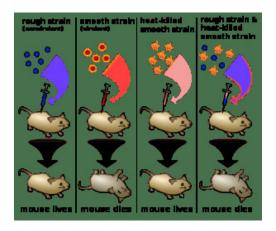
নিউক্লিক অ্যাসিড নিয়ে কাজ তখন সবে শুরু। নিউক্লিক অ্যাসিডের গঠন নিয়ে এর পরে কাজ করলেন ফিবাস লেভেন ,নিউ ইয়র্কে রকফেলার ইন্সটিটিউটে। ইনি কোমে পাওয়া নিউক্লিক অ্যাসিডের রা-সায়নিক উপাদানগুলোকে আলাদা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিউক্লিক অ্যাসিডের চার উপদান – অ্যাডেনিন(A), থিয়ামিন(T), সাইটোসিন(C)আর গুয়ামিন(G)। কিন্তু তিনি ক্রোমোজমের নিউক্লিক অ্যাসিডের সঠিক কাঠামো বলতে পারেন নি। ১৯২৯ সালে ডি-এন-এ বা ডি-ওক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড আবিষ্কার করার পরে উনি দাবী করেন যে এটি মাত্র চারটি নিউক্লিওটাইড নিয়ে গঠিত (ছবিতে লিভানের প্রস্তাবিত গঠন)। লেভেনের এই আবিষ্কার ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা ব্যাপার তখন বিজ্ঞানীদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে বংশগতির বাহক যাহেতু খুবই জটিল বার্তা বহন করে তাই তার রাসায়নিক গঠনও জটিল হবে । লেভেনের আবিষ্কারের পরে বোঝা গেল ডি-এন-এ এর কাঠামো এই জটিল বার্তা ধারণের পক্ষে উপযোগী হবে না। তাই বিজ্ঞানীরা মনে করতে থাকলেন প্রোটিনই হবে সেই বার্তাবাহক। ২০ রকমের বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরী বলে প্রোটিনের বিভিন্ন রূপ ধারণ করা সম্ভব আর বার্তা বহনের কাজও সহজ। অপরদিকে, মাত্র চারটে ভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দিয়ে তৈ-রী চার শৃঙ্খলার অণু কিছুতেই অত জটিল বার্তা বহন করতে পারে না।



চিত্র ১১.৩

এই ভুল ধারণা আরো অনেক দিন রয়ে যেত, যদি না আরেক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পরীক্ষাগারে এক অঘটন না ঘটিয়ে ফেলতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে নিউমোনিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেষ্টায় ফ্রেডেরিক গ্রিফিথ গবেষণা করছিলেন নিউমোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া নিয়ে। এই ব্যাকটেরিয়া দুধরণের – একটা মারাত্মক ধরণের আরেকটা নির্বিষ। প্রথম ধরণের ব্যাকটেরিয়াকে বলা হত $\mathrm{S}(\mathrm{Smooth})$ আর দ্বিতীয়টিকে $\mathrm{R}(\mathrm{Rough})$ । এই S ব্যাকটেরিয়া ইঁদুরের শরীরে প্রবেশ করালে তার দ্রুত মৃত্যু হত। কিন্তু R ব্যাকটেরিয়া কোনো ক্ষতিই করতে পারত না। দেখা গেল, S ব্যাকটেরিয়ার কোষের বাইরের দিকে উপস্থিত একটি বিশেষ পদার্থের আচ্ছাদন কোষকে রক্ষা করত, R ব্যাকটেরিয়ার কোষে এরকম কিছু ছিল না। এবার উনি কিছু মৃত S ব্যাকটেরিয়া ঢুকিয়ে দেখলেন ইঁদুর মরে না। সবশেষে মৃত S ব্যাকটেরিয়ার সাথে সাথে R ব্যাকটেরিয়া ঢুকিয়ে দিয়ে দেখা হল। কিন্তু গ্রিফিথকে অবাক করে দিয়ে ইঁদুরটা মরে গেল (ছবিতে)। কি ভাবে মৃত ব্যাকটিরিয়াগুলো বেঁচে উঠে ইঁদুরটাকে মেরে দিল? দুই ভিন্ন ধরণের ব্যাকটেরিয়া কি ভাবে ষড়যন্ত্র করে মেরে ফেলল ইঁদুরটাকে? মৃত ইঁদুরের শরীর থেকে সংগৃহীত ব্যাকটেরিয়াগুলো দেখা গেল সব S ব্যাকটেরিয়া। এর মানে জিনগত ভাবে বদলে গেছে ব্যাকটেরিয়া। কিন্তু কি ভাবে এরকম হল? মানবসভ্যতার ইতিহাসে, চোখের সামনে প্রজাতির রূপ পরিবর্তন করা আগে দেখা যায় নি। গ্রিফিথই প্রথম সে সৌভাগ্য অর্জন করলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, কি ভাবে এটা ঘটে? মৃত ব্যাকটেরিয়া থেকে কি এমন উপাদান সং-গ্রহ করে জীবন্ত ব্যাকটেরিয়াগুলো যাতে তারা রূপ পরিবর্তন করতে পারে?

সেই সূত্র উদ্যাটন করলেন অসওয়ান্ড আভেরী, অনেক পরে, ১৯৪৪ সালে সেই রকফেলার ইসটিটিউটেই (ছবিতে)। উনি বিজ্ঞানী ম্যাকলয়েড আর ম্যাককার্টির সাথে মিলে প্রমাণ করে দিলেন যে উপাদান সংগ্রহ করে এই রূপান্তর ঘটে তা হল ডিএনএ। গ্রিফিথ যে কাজটা মৃত S ব্যাকটেরিয়া দিয়ে করেই বিস্মিত হয়েছিলেন, সেটাকেই এই বিজ্ঞানীরা কয়েক ভাগে ভেঙে নিলেন। প্রথমে মৃত S ব্যাকটেরিয়াগুলোর বাইরের আচ্ছাদন সরানো হল আর তারপরে আগের প্রক্রিয়া চালানো হল —



চিত্ৰ ১১.৪: Griffith experiment

তাতেও রূপান্তর হল। তার মানে বাইরের আচ্ছাদনের কোনো ভূমিকা নেই রূপান্তরে। একই ভাবে উনি এর পরে একে একে মৃত S ব্যাকটেরিয়াণ্ডলো থেকে প্রোটিন ও আর-এন-এ সরিয়ে দিয়ে দেখলেন রূপান্তর হচ্ছে। সবশেষে ডি-এন-এ কোষ থেকে সরিয়ে দিতেই দেখা গেল আর কোনো রূপান্তর হচ্ছে না। তার মানে গল্পটা এরকম দাঁড়ালো - মৃত S ব্যাকটেরিয়াণ্ডলোর ডি-এন-এ জীবিত R ব্যাকটেরিয়াণ্ডলো গ্রহণ করে পরিবর্তিত হচ্ছে - নতুন রূপ ধারণ করছে। তার মানে, ডি-এন-এই হল জীবের বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক - অন্য কথায় ডি-এন-এ জিনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আভেরীর মত সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হল না। আভেরী, ম্যাকলয়েড আর ম্যাককার্টি – কেউই কোনোদিনও নোবেল পুরস্কার পেলেন না। (অনেক পরে বাংলাদেশে কলেরা নিয়ে গবেষণাকেন্দ্রের প্রধানরূপে নিযুক্ত হলেন ম্যাকলয়েড । বাংলাদেশের সেই কলেরা গবেষণা কেন্দ্র এখন পরিচিত ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়েরিয়া ডিসিসেস রিসার্চ নামে।) ততদিনে প্রোটিন নিয়ে বংশগতির ধারণা বিজ্ঞানীদের মধ্যে এতটাই গেঁথে গেছে যে অনেক বিজ্ঞানীই তার মত পাত্তাই দিলেন না। এই পাত্তা না দেবার দলে ছিলেন সুইডিশ রসায়নবিদ এইনার

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

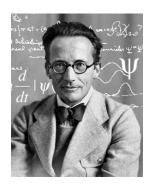


চিত্র ১১.৫: অসওয়াল্ড আভেরি

হ্যামারস্টেনও। কিন্তু হ্যামারস্টেন আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে বসলেন (সূত্র – জেমস ওয়াটসনের ডি-এন-এ বইটি), নোবেল কমিটিতে আভেরীর নমিনেশনের বিরোধিতা করলেন। পঞ্চাশ বছর পরে নোবেল আর্কাইভ থেকে জানা গেল এই নির্মম সত্য। মজার কথা, হ্যামারস্টেন নিজেও কিন্তু ডি-এন-এ নিয়েই কাজ করতেন। অথচ তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পাননি এর কি মহিমা হতে পারে। উনি আর বেশীরভাগ বিজ্ঞানীর মত মনে করলেন প্রোটিনই হবে বোধহয় বংশগতির বাহক। আর এর ফলে নোবেল পুরষ্কার থেকে বঞ্চিত হল একটি মৌলিক গবেষণা ও গবেষক। ডি-এন-এ-এর প্রকৃত কাঠামো জানা যাবার কয়েক বছরের মধ্যেই উনি মারা যান। জেমস ওয়াটসন তার বইতে লিখেছেন – হয়ত আর কয়েক বছর বাঁচলে উনি নোবেল পুরষ্কার পেয়েই যেতেন। আরেক নোবেলজয়ী জীববিজ্ঞানী আর্নে টিসেলিয়াসের মতে নোবেল না জেতা বিজ্ঞানীদের মধ্যে আভেরীই ছিলেন সবথেকে যোগ্য বিজ্ঞানী।

অনেকসময়েই বিজ্ঞানের একাধিক শাখা একে অপরের সাথে জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু আজকের স্পেশালাইজেশনের যুগে দেখা যায় ক্রস-ডিসিপ্লিন নলেজ বা একাধিক শাখায় দক্ষ লোকের সংখ্যা কমেই চলেছে। তবে যখনকার কথা বলছি, তখন এই সমস্যাটা এত গভীর ছিল না। তাই জ্ঞান বিনিময়ের জন্য বিজ্ঞানীদের অভাব হত না। তাও কিছু কিছু বিজ্ঞানী এদের মধ্যে আলাদা করে জায়গা করে বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

নিতে পারেন। আর কেউ কেউ পারেন এক শাখার বিজ্ঞানীদের অন্য শাখায় উৎসাহিত করে তুলতে। শেষোক্ত কাজটিই করেছিলেন অস্ট্রিয়ান নোবেলজয়ী পদার্থবিদ আরভিন শ্রোডিংয়ার।



চিত্র ১১.৬: আরভিন শ্রোডিংয়ার

শ্রোডিংয়ার কিন্তু সম্পূর্ণরূপে একজন নিবেদিতপ্রাণ পদার্থবিদই ছিলেন। ১৯৪৩ সালে ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে উনি বক্তৃতা দিতে গিয়ে জানালেন যে বিষয়বস্তু পদার্থবিদ-দের অতি পরিচিত গাণিতিক সমীকরণের খুব একটা ধার ধারে না। এই বক্তৃতাটিতেই উনি প্রথম জীবন ও তার অর্থ বোঝার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা বলেন। এরপরে, ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত ''হোয়াট ইজ লাইফ" নামক তার বইতে তিনি লিখেছিলেন যে জীবনের উদ্দেশ্য হল কিছু তথ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ আর প্রবাহ। এভাবে ক্রোমোসোম হল এই তথ্যের ধারক। বংশানুক্রমিক ভাবে আসা এই তথ্য ক্রোমোসোমের জটিল অণুদের বিন্যাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তাই জীবন কি সেটা বুঝতে গেলে আগে ওই বিন্যাস বুঝতে হবে। এটাই ছিল তার মূল বক্তব্য।

এদিকে একই সময়ে পদার্থবিদেরা কোয়ান্টাম তত্ত্বের মত জটিল তত্ত্ব দিয়ে পরমাণুর গঠন ও তাদের আচার আচরণ নিয়ে গবেষণা করছেন। অথচ, যা পরমাণুর চেয়েও অনেক বেশী জরুরী তা হল আমাদের জীবন-কে বোঝা। তা নিয়ে গবেষকের আকাল। ট্র্যাডিশনাল জীববিজ্ঞানীরা অধিকাংশই পর্যবেক্ষণ নিয়েই মগ্ন থাকেন, গাণিতিক হিসাবনিকেশ করে বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

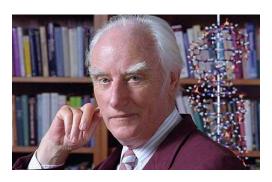
দেখেন না বা পরিসংখ্যানেও ততটা দক্ষ নন। শ্রোডিংয়ারের বই অনেক পদার্থবিদ ও রসায়ন-বিজ্ঞানীকেই এই জীবনের তথ্য উদ্ঘাটনের পথে আনতে সক্ষম হল। মজার কথা, ডি-এন-এ আবিষ্কারের নাটকের কুশীলবদের অধিকাংশই এই বই পড়েই জীবন নিয়ে গবেষণার পথে আসেন ।



চিত্র ১১.৭: মরিস উইলকিন্স

যেমন ধরা যাক মরিস উইলিকসের কথা। এই পদার্থবিদ পরমাণু বোমা তৈরীতে ম্যানহাটান প্রজেক্টের সাথে জড়িত ছিলেন। বোমার আসল রূপ হিরোশিমা-নাগাসাকিতে দেখে তার বোধোদয় হল। তিনি একরকম পাগল হয়েই প্যারিসে চলে যাবেন ভাবছিলেন চিত্রকর হবার শখে। এই সময়েই তার হাতে এসে পড়ে শ্রোডিংয়ারের বইটি। বই পড়ে উনি উৎসাহিত হন জীবন সংক্রান্ত গবেষণায় আসতে। তিনিই সর্বপ্রথম এক্স-রে ডিফ্রাকশন টেকনলজি ব্যবহার করে ডি-এন-এর গঠন পর্যবেক্ষণ করার কথা বলেন। একজন পদার্থবিদ ছাড়া এই চিন্তা মাথায় আসা সাধারণ জীববিজ্ঞানীদের কাছে অসম্ভব। আরেকজন ছিলেন ফ্রান্সিস ক্রিক। যিনি মূলত ছিলেন পদার্থবিদ্যার ছাত্র কিন্তু তার পদার্থবিদ্যার মত যুক্তিনির্ভর ও মডেল-ভিত্তিক গবেষণার অভ্যাসও এই ডি-এন-এর গঠন আবিষ্কারে বড় ভূমিকা রাখে।

এ তো গেল গত শতাব্দীর কথা। ডি এন এ আবিষ্কার, মালঞ্চের দ্বিসূত্রক মাল্যের আবিষ্কারের পেছন দিকের কথা! তো এখন আসা যাক ডি এন এ এর দ্বিসূত্রক গঠন সজ্জার বিস্তৃত কথায়-



চিত্র ১১.৮: ফ্রান্সিস ক্রিক

মালঞ্চের দ্বি-সূত্রের মাল্যের গঠনের গল্প

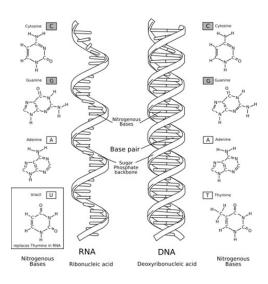
হ্যারি পটারের জাদু কিংবা আলিফ লায়লার গল্পের চাইতেও অদ্ভুত কিছু আছে! এখন শুরু হবে তার কথা! যা হার মানাবে আলিফ লায়লার কল্পকাহিনীকে বা হ্যারি পটারের জাদুর কাহিনীকেও!

ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) একটি নিউক্লিক এসিড যা জীবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রনের জিনগত নির্দেশ ধারন করে। সকল জীবের ডিএনএ জিনোম থাকে। একটি সম্ভাব্য ব্যতিক্রম হচ্ছে কিছু ভাইরাস গ্রুপ যাদের আরএনএ জিনোম রয়েছে, তবে ভাইরাসকে সাধারণত জীবন্ত প্রাণ হিসেবে ধরা হয় না। কোষে ডিএনএর প্রধান কাজ দীর্ঘকালের জন্য তথ্য সংরক্ষন। জিনোমকে কখনও নীলনকশার সাথে তুলনা করা হয় কারণ, এতে কোষের বিভিন্ন অংশে যেমনঃ প্রোটিন ও আরএনএ অণু, গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী থাকে। ডিএনএর যে অংশ বংশগতি তথ্য বহন করে তাদের বলে জিন, কিন্তু অন্যান্য ডিএনএ ক্রমের গঠনগত তাৎপর্য রয়েছে অথবা তারা জিনগত তথ্য নিয়ন্ত্রনে ব্যবহৃত হয়।

ইউক্যারিয়ট যেমন প্রাণী ও উদ্ভিদে, ডিএনএ নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকে, তবে প্রোক্যারিয়ট যেমন ব্যাকটেরিয়াতে, ডিএনএ কোমের সাইটোপ্লাজমে

থাকে। উৎসেচকের মত ডিএনএ অধিকাংশ জৈবরসায়ন বিক্রিয়ায় সরাসরি অংশ নেয় না; মূলত, বিভিন্ন উৎসেচক ডিএনএর উপর কাজ করে এর তথ্য নকল করে রেপ্লিকেশনের মাধ্যমে আরো ডিএনএ তৈরি করে। ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিন প্রোটিন যেমন হিস্টোন ডিএনএকে ঘনসন্নিবেশিত ও সংগঠিত করে, যা নিউক্লিয়াসের অন্যান্য প্রোটিনের সাথে এর আচরণ নিয়ন্ত্রনে সাহায্য করে।ডিএনএ নিউক্লিওটাইড অণুর সমম্বয়ে গড়া একটি লম্বা পলিমার জীবদেহে ডিএনএ একটি একক অনু হিসেবে থাকে না, বরং চাপাচাপি করে জোড়া-অণু হিসেবে থাকে। এই লম্বা সূত্র দুইটি আঙ্গুরের মত প্যাচানো থাকে, যা দ্বৈত হেলিক্সের মত হয়। একটি ডিএনএ সূত্রে থাকে নিউক্লিওটাইড যা ডিএনএ মেরুদন্তকে ধরে রাখে, এবং একটি ক্ষার যা অন্য ডিএনএ সূত্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এই নিউক্লিওটাইড ও ক্ষারের পুনরাবৃত্তিতেই ডিএনএ সূত্র গঠিত। সাধারনভাবে একটি ক্ষার যদি একটি চিনি অণুর সাথে যুক্ত[°] থাকে তাকে বলে নিউক্লিওসাইড এবং একটি ক্ষার যদি একটি চিনি ও এক বা একাধিক ফসফেট অণুর সাথে যুক্ত থাকে তাকে বলে নিউক্লিওটাইড। যদি একাধিক নিউক্লিওটাইড একসাথে যুক্ত থাকে, যেমন ডিএনএতে, তবে এই পলিমার কে বলে পলিনিউক্লিওটাইড।

ডিএনএ সূত্রের মেরুদন্ড ফসফেট ও চিনি অণুর পুনরাবৃত্তিতে গঠিত। ডিএনএর চিনি হচ্ছে পেন্টোজ (পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট) ২-ডিঅক্সিরাইবোজ। এই চিনি ফসফেট গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়ে পাশাপাশি চিনির অণুর মধ্যে তৃতীয় ও পঞ্চম কার্বন পরমাণুর স্থানে ফসফোডিয়েসটার বন্ধন গঠন করে। এই অপ্রতিসম বন্ধন বোঝায় যে ডিএনএ অণুর মেরু বা দিক আছে। দ্বৈত হেলিক্সে এক সূত্রের নিউক্লিওটাইডের দিক অন্য সূত্রের ঠিক বিপরীত দিকে থাকে। ডিএনএ সূত্রের এই ধরনের বিন্যাসকে প্রতিসমান্তনরাল বলে। ডিএনএর অপ্রতিসম প্রান্তকে বলে ৫' (ফাইভ প্রাইম) এবং ৩' (খ্রি প্রাইম) প্রান্ত। ডিএনএ ও আরএনএর মধ্যকার একটি প্রধান পার্থক্য হলো চিনিতে, যেখানে ডিএনএতে ২-ডিঅক্সিরাইবোজ ব্যবহৃত হয়।

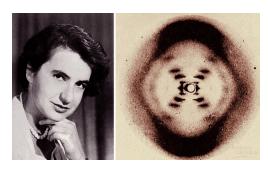


চিত্র ১১.৯: মালঞ্চের মাল্য আর মালাকর!

ডিএনএর দ্বৈত হেলিক্স হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে স্থির থাকে, যা দুটি সূত্রের মধ্যে সংযুক্ত থাকে। ডিএনএতে যে চারটি ক্ষার পাওয়া যায় তা হল এডেনিন (সংক্ষেপে A), সাইটোসিন (C), গুয়ানিন এবং থাইমিন (T)। নিম্নে এইচারটি ক্ষার দেখানো হয়েছে যারা চিনি/ফসফেটের সাথে যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিউক্লিওটাইড গঠন করে, যেমনঃ এডিনোসিন মনোফসফেট।

এই ক্ষারগুলো দুই ভাগে ভাগ করা যায়; এডেনিন ও গুয়ানিন হল পিউরিন নামক ৫- ও ৬- কার্বনচক্রের হেটারোসাইক্লিক যৌগ এবং সাইটোসিন ও থাইমিন হল পাইরিমিডিন নামক কার্বনচক্রের যৌগ। ইউরাসিল নামে পঞ্চম আরেকটি পাইরিমিডিন ক্ষার আছে যা সাধারণত আরএনএতে থাইমিনের বদলে থাকে। থাইমিনের সাথে এর পার্থক্য হচ্ছে কেবল একটি মিথাইল গ্রুপের অনুপস্থিতি।

ডিএনএর স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় রোজালিন্ড এক্সরে পরীক্ষা থেকে। উনি পরীক্ষায় দেখলেন ডিএনএ মূলত দুটো রূপে পাওয়া যায় – যাদের নাম দিলেন এ আর বি আকার। এ আকারের ডিএনএ হল আর্দ্র – লম্বা আর সরু সরু। বি আকারেরটি হল শুষ্ক, মোটা আর বেঁটে। রোজালিন্ড গবেষণা চালিয়ে গেলেন বি আকারের ডিএনএর ওপর,অসীম ধৈর্য নিয়ে দিনরাত খেটে রোজালিন্ড একের পর এক অসাধারণ এক্সরে ছবি বের করলেন ডিএনএর। এর জন্য তিনি দীর্ঘসময় টানা পর্যবেক্ষণে রেখে ডিএনএ ক্রিস্টালকে ধীরে ধীরে গরম বা ঠান্ডা, আর্দ্র বা শুষ্ক করতেন। ফলস্বরূপ উনি একটা এমন এক্সরে ডিফ্র্যাকশন প্যাটার্নের ছবি পান যেটা এককথায় অতুলনীয়।



চিত্র ১১.১০: রোজালিন্ড, এক বঞ্চিত বিজ্ঞান নায়িকা

লিস মিটনারের মতই রোজালিভ বঞ্চিত এক বিজ্ঞান নায়িকা! তাঁর কথা না হয় আরেকদিন শুনব...

আজকের গল্পের ইতি

এই আমাদের মালঞ্চের মাল্যের গল্প! এই মাল্য প্রবহমান নদীর মতন, আমাদের বংশগতির বৈশিষ্ট্য নদীর মতই প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম তে বহন করে এই মাল্য! অসম্ভব কিছু প্রতিভাবান মানুষ, কিছু অসাধারণ বিজ্ঞানীদের জন্যে আমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হয় এই মালঞ্চের মাল্যের গল্প, এই দ্বি সূত্রের গল্প। তাঁদের আজীবন পরিশ্রম আর গবেষণায় আমরা আজ জীবনের গল্প পড়তে পারছি নতুন ভাষায়। তাই তাঁদের প্রতি আমাদের একটি কথাই বলতে ইচ্ছা হয় – ''আমি তব

মালঞ্চের হব মালাকর"।

আজকে জীববিজ্ঞানের জন্যে ভালবাসার গল্প, এই মালঞ্চের মাল্যের মালাকরের গল্প! সত্যিই অনেক বিচিত্র, অনেক অসাধারণ। জীববিজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক ভূবনলোক। জীবনের জয় হোক, জীববিজ্ঞানের জয় হোক। বিজ্ঞানব্লগে আবার জীবনের গল্প,জীববিজ্ঞানের ভালবাসার গল্প শুনানোর প্রতীক্ষায় থাকলাম...

Whole of This sequence is for Arpita who inspires me everytime

তথ্যসূত্র

- ৡ ডারউইন থেকে ডিএনএ এবং সাড়ে চারশ কোটি বছর ─ ড.

 নারায়ণ সেন
- 🗞 দ্য ডাবল হেলিক্স জেমস ডি ওয়াটসন
- 🗞 জীবনের গল্প ডা. সৌমিত্র চক্রবর্তী
- ৡ সেলফিশ জিন রিচার্ড ডকিন্স
- 🗞 হোয়াট ইজ লাইফ আরভিন শ্রোডিংয়ার
- 🗞 ফিচার ছবি সূত্র: Flickr



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

§ 32



মিউটেশন: কল্পনা, এক্স-ম্যানের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা

কামরুজ্জামান ইমন

[►]থিবীর সব মানুষই কি একরকম? না, বলতে গেলে কেউই কারো মত নয়। শুধু মানুষের ক্ষেত্রে নয় অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যদিও প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা পার্থক্যটুকু তেমন একটা ধরতে পারি না। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই বৈচিত্রটুকু আমরা ঠিকই বুঝতে পারি। আমরা দেখি যে, আমাদের চারপাশের মানুষের আচার-আচরণ, চেহারায় একজনের সাথে অন্যজনের প্রায় মিল নেই। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন মানুষের বা অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়? অনেকেই অবাক হয়ে বলবেন যে, এ আবার কেমন কথা হলো? একজনের সাথে অন্যজনের মিল কেন থাকবে বরং মিল থাকাটাই তো আশ্চর্য! আসলে ব্যাপারটা সেরকম না। আমরা জানি যে মানুষ সহ অন্যান্য সকল প্রাণী একটি মাত্র ক্ষুদ্র কোষ জাইগোট থেকে বিভাজনের মাধ্যমে পরিণত জীবে রূপ নেয়। এই জাইগোট হল ডিপ্লয়েড অর্থাৎ দুইটা একক বা হ্যাপ্লয়েড কোষ মিলিত হয়ে গঠিত হয়। এই দুই কোষের একটি পিতা অন্যটি মাতা থেকে আসে। সে অনুযায়ী ঐ জাইগোট থেকে সৃষ্ট জীব মাতা পিতার অনুরূপ হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না! দেখা যায় যে, নতুন সৃষ্ট এই জীবের অনেক আচরন পিতা মাতার সাথে মিল থাকলেও তার কিছু আচরণে সম্পূর্ণ অমিল পাওয়া যায়। কিন্তু এমনটা কেন হয়?

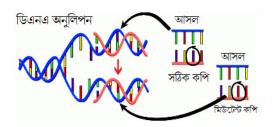


চিত্র ১২.১: মিউটেশনের ফলে হাতের গঠনে পরিবর্তন

পার্থক্য কেন হয় সেটা জানার আগে চলুন আমরা একটু মজার উদাহরণ নিয়ে একটু মজা করে নেই। আমরা অনেকেই হলিউডের বিখ্যাত সাই-ফাই 'এক্স-ম্যান' মুভিটা নিশ্চই দেখেছি। এই মুভিটাতে এরকম পার্থক্যের মানুষ দেখানো হয়েছে। আসলে এরকম পার্থক্য হওয়াকে বলে মিউটেশন। আমরা মুভিটাতে হিরোদের বিভিন্ন ক্ষমতা দেখতে পাই। মুভিটাতে কেউ প্রচন্ড বেগে ছুটতে পারে, কেউ মন পড়তে পারে আবার কেউ ইস্পাতকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেহেতু এটা সাই-ফাই মুভি তাই নিশ্চিত ভাবেই এখানে সবকিছুই একটু অতিরঞ্জন করেই দেখানো হয়েছে। যাই হোক, ঐ মুভির মত ঐরকম ক্ষমতা পাওয়া সম্ভব না হলেও মিউটেশনের মাধ্যমে তার অনেকটা কাছাকাছি ক্ষমতা কিন্তু পাওয়া অসম্ভবের কিছু না! হ্যাঁ, আমার কথাটা একেবারেই সত্য। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আচ্ছা দাড়ান আপনাদের এর কিছু বাস্তব উদাহরণ দিয়ে দেয়া যাক। আপনাদের মনে আছে কি, কিছু দিন আগে মার্ভেল ইউনিভার্সের স্রষ্টা স্টেনলি ডিসকভারি চ্যানেলে একটা ডকুমেন্টরি করেছিলেন যার নাম ছিল 'সুপার হিউম্যান'। যারা ডিসকভারি চ্যানেল দেখে থাকেন তারা নিশ্চই মনে করতে পেরেছেন। ঐ প্রোগ্রামে প্রকৃতির অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষদেরকে খোঁজা হত এবং তাদের ক্ষমতা দেখান হত। পরে তাদেরকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেইসব ক্ষমতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাঁড় করান হত। সূতরাং দেখা গেল যে, প্রকৃতিতে এমন কিছু অসাধারণ মানুষ আসলেই আছে। আর এসবের কারন হল 'মিউটেশন'। এবার চলুন আমরা মিউটে-শন ব্যাপারটা আসলে কি সেটা বোঝার চেষ্টা করি। তো চলুন জানা যাকঃ

মিউটেশন কিঃ এক কথায় বলতে গেলে, কোনো কারণে প্রাণীর জিনোমের পরিবর্তনকে মিউটেশন বলে। বিস্তারিত ভাবে বললে এভাবে বলতে হয়ঃ আমরা জানি যে, প্রাণী ক্ষুদ্র জাইগোট থেকে পরিণত প্রাণীতে রূপ নেয়।

তখন জাইগোটের বিভাজনের প্রয়োজন পড়ে। জাইগোটের বহু বিভাজনের সময় একইসাথে ডিএনএ (ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড) এর বিভাজন হয়। এই বিভাজনের সময় সাধারণত সৃষ্ট কোষ বা ডিএনএ মাতৃ



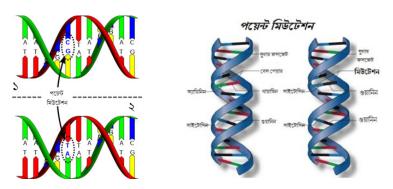
চিত্র ১২.২: ডিএনএ অনুলুপন

কোষ বা ডিএনএর অনুরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু ভুল সব ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। কোষের বিভাজনের কারনে অনেক সময় দেখা যায় যে কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ক্রোমোজোমের সংখ্যায় পরিবর্তন সাধিত হয়। আবার অনেক সময় ডিএনএর ক্ষারগুলোর মধ্যে এই পরিবর্তন হয়ে থাকে। এভাবেই পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবে বৈচিত্র আসে যাকে বলা হয় মিউটেশন।

মিউটেশনের মধ্যে ডিএনএ মিউটেশন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই এটা নিয়ে আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। মিউটেশন মূলত দুই প্রকার হয়ে থাকে। একটা হল স্বতঃস্ফূর্ত আর অন্যটা কৃত্রিম। সাধারণত স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন প্রকৃতিতে খুবই বিরল। বলতে গেলে প্রায় ১০০,০০০ তে মাত্র ১। সূর্যের আলোর পার্থক্য, গামা রিশা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এসব কারনে স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন হয়ে থাকে। আর মানুষের প্রয়োজনে কৃত্রিম মিউটেশন করান হয়। আসুন দেখে নেই কিভাবে ডিএনএর অনুলিপনের সময় মিউটেশন হয়।

পয়েন্ট মিউটেশনঃ সাধারণত ডিএনএ অনুলিপনের সময় ডিএনএ ক্ষা-রগুলোর মধ্যে পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে যে মিউটেশন ঘটে তাকে পয়েন্ট মিউটেশন বলে। আসুন ডিএনএর গঠনটা একটু মনে করা যাক।

আমরা ছবিতে দেখি যে ডিএনএ হল প্যাঁচানো সিঁড়ির মত। আসলেই সেটা এরকম। ডিএনএ কোষের কেন্দ্রে ক্রোমোজোমে থাকে। আর



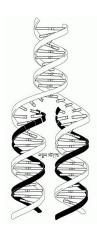
চিত্র ১২.৩: ডিএনএর গঠন ও পয়েন্ট মিউটেশন

ডিএনএর কোডকে বলা হয় জিন।

যাই হোক, এই ডিএনএতে প্যাঁচানো সিঁড়ির মত দুইটা হাতল দেখা যায়। এর এক একটি হাতলকে পলিনিউক্লিওটাইড বলে। এর দুটি হাতলের একটি পিউরিন আর অপরটিকে পাইরিমিডিন বলে। পিউরিনে আবার থাকে অ্যাডিনিন ও গুয়ানিন নামক বেস। আর পাইরিমিডিনে থাকে সাইটোসিন ও থায়ামিন নামক বেস। একটি হাতল অপর হাতলের সাথে এই চারটি বেসের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে অ্যাডিনিনের সাথে ৩ টি কার্বন বন্ধনের মাধ্যমে থায়ামিন যুক্ত হয়। এবং সাইটোসিন ২ টি কার্বন বন্ধনের মাধ্যমে গুয়ানিনের সাথে যুক্ত হয়। এভাবে পরস্পর দুই-টি হাতল যুক্ত থাকে। কোষের মত এই ডিএনএরও বিভাজন হয়ে থাকে।

ডিএনএ যে পদ্ধতিতে বিভাজিত হয় তাকে বলে অর্ধরক্ষণশীল পদ্ধতি। কারন এক্ষেত্রে প্রতিটি হাতল প্রথমে আলাদা হয়ে যায়। এবং পরে প্রতিটি হাতল তার পরিপূরক হাতলের তৈরি করে। অর্থাৎ পিউরিন আলাদা হয়ে যায় এবং সাথে নতুন করে পাইরিমিডিন তৈরি করে। এভাবে পাইরিমিডিনও আলাদা হয়ে পিউরিন তৈরি করে। অর্থাৎ একটি নতুন আর একটি পুরাতন বেস মিলিত হয়ে তৈরি করে নতুন ডিএনএ। কিন্তু ঠিক এই সময়তেই কখনো কখনো ঘটে বিপত্তি। অর্থাৎ মাঝে মাঝেই ডিএনএ অনুলিপনের সময় ভুল হয়ে যায়। এসময় অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন আর থায়ামিনের যে বিন্যাস তার পরিবর্তন সাধিত

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

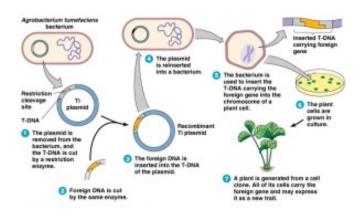


চিত্র ১২.৪: ডিএনএ অর্ধরক্ষণশীল পদ্ধতি

হয়ে যায়। আর এ কারনেই তৈরি হয়ে যায় নতুন বৈশিস্ট। ফলে জীবের জিনোমেও পরিবর্তন আসে।

উপরে আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে ডিএনএ অনুলিপনের সময় সামান্য ভুলের মাধ্যমে মিউটেশন ঘটে। কিন্তু সবসময় এই ভুলের মাণ্ডল কিন্তু দিতে হয় না। কারন অনেক সময়ই মিউটেশন আমাদের প্রচ্ছন্ন জিনের মধ্যে হয়ে থাকে। তাই সেটা আমাদের গঠন বা ব্যবহারে প্রভাব ফেলে না। তবে এই পরিবর্তন যদি হয় প্রকট জিনে তখনই জীবে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আবার অনেক সময়ই এই পরিবর্তন জীবের জন্য ক্ষতি বয়ে আনে। ফলে জীবের বিনাশ হয়ে যাবারও আশংকা থাকে। তবে ইতিবাচক পরিবর্তন হলে সেটা জীবের জন্য সুখবর বয়ে আনে। এভাবেই কিন্তু মিউটেশনের মাধ্যমে আজ আমাদের এই মানব রূপ প্রাপ্তি বা আমাদের উন্নত রূপে পদার্পণ। আর একেই বলা বিবর্তন। স্বাভাবিকভাবে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে, বিবর্তন সবক্ষেত্রেই বিদ্যমান। আর এই বিবর্তন হয়ে থাকে সামান্য ভুল থেকে। যেমন আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ, ভাষা, শিক্ষাব্যাবস্থা, জীবন যাপন সবকিছুরই বিবর্তন হচ্ছে বা উন্নত রূপে লাভ করছে। বিবর্তনে ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হল 'যোগ্যতমরাই টিকে থাকবে'। অর্থাৎ

পরিবেশের সাথে যে যত বেশি খাপ খাওয়াতে পারবে সে তত বেশি স্থা-য়ী হবে। তাই বিবর্তনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইতিবাচক মিউটেশনই গ্রহণযোগ্য।



চিত্র ১২.৫: জিন প্রকৌশল

মিউটেশনের প্রয়োগ ও সম্ভাবনাঃ মিউটেশন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। এটি কিন্তু উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। আমরা ইতিমধ্যেই উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মিউটেশনের ব্যাপক পেয়েছি। বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর উন্নতিকল্পে কৃত্রিম উপায়ে সুবিধাজনক মিউটেশন সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়। এভাবে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাডানো সম্ভব হয়েছে। ছত্রাক থেকে মূল্যবান ঔষধ পেনিসিলিন তৈরী হয়। এই ঔষধ যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন খুব কম পরিমাণে ঔষধ পাওয়া যেত। পরে বিকিরণ প্রয়োগ করে এমন ছত্রাক পাওয়া গেছে যার উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশী। বিজ্ঞানী এইচ স্টাবি (H. Stubbe) দেখিয়েছেন, মিউটেশনের মাধমে উৎপাদিত বার্লির উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রেটিনের পরিমাণ বেশী। আমেরিকায় চিনাবাদাম গাছে এক্সরে প্রয়োগ করে অধিক উৎপাদনশীল পাওয়া গেছে। M.S. Swaminathan গমে আলট্রা ভায়োলেট ও প্রয়োগ করে দ্রুত ফলনশীল ও অধিক প্রোটিনযক্ত উদ্ভিদ পেয়েছিলেন। এই উদ্ভিদে লাইসিনের পরিমাণ বেশী হয়। এছাডা সর্ষে গাছে তেলের পরিমাণও মিউটেশনের মাধ্যমে বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। স্বপরাগী উদ্ভিদে বিশেষত যে সব উদ্ভিদে সহজে সংকরায়ণ করা যায়না তাদের বেলায় কৃত্রিম উপায়ে মিউটেশনের মাধ্যমে উন্নতি করা সম্ভব (পাট)। মিউটেশনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ানো সম্ভব হয়েছে (চীনাবাদাম)। মিউটেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফলের উৎকর্ষ সাধন হয়েছে (বীট)। ফুলে বৈচিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে (ডালিয়া)।

বর্তমানে প্রাণীর ক্ষেত্রেও মিউটেশনের প্রয়োগের জন্য পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। আমরা সবাই হয়ত জীন প্রকৌশলের কথা মোটামুটি জানি। এক্ষেত্রে প্রাণীর জীন-কণার মধ্যে কৃত্রিমভাবে পরিবর্তন আনা হয় বা নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করা হয়। এভাবে উন্নত ফসল ও প্রাণী তৈরি করা যায়। ইতিমধ্যেই এ পদ্ধতিতে ভেড়া, গরু আর মাছের উন্নতি সম্ভব হয়েছে।



চিত্র ১২.৬: রিয়েল লাইফ জোকস

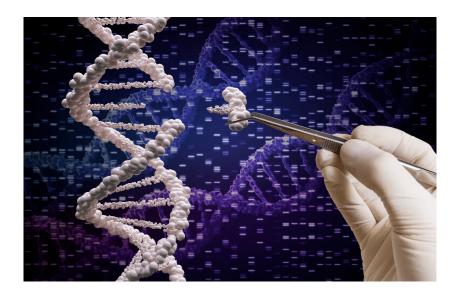
কিছু ভাবনা ও কল্পনাঃ আমরা মানবদেহ ডিজাইন সমস্যার কথা জানি। আমাদের দেহে বেশ কিছু অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ রয়েছে সাথে কিছু ভুল ডিজাইন। অপ্রয়োজনীয় অঙ্গের একটি হল আমাদের পাজড়ের কাছে থাকা অ্যাপেন্ডিক্স। আর আমরা আমাদের কোমড়, মাথা আর চোখের ক্ষেত্রে কিছু ভুল ডিজাইন দেখতে পাই। আপাত দৃষ্টিতে এগুলো ভুল বলে মনে হলেও হয়ত এগুলো ভুল নয়। তবুও যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে হয়ত মিউটেশনের মাধ্যমে এসবের বিবর্তন হতে পারে নতুবা আমরা নিজেরাই প্রয়োজনে মিউটেশন করিয়ে নিতে সক্ষম হব। আর এভাবে আমরা আমাদের নিজেদেরকে আরো উন্নত ও বুদ্ধিমান সত্ত্বায় রূপান্তরিত করতে পারব।

সবশেষে বলতেই হয় যে, মিউটেশন কিন্তু সর্বদা মঙ্গল বয়ে আনে না। অনেক সময় এটি ধ্বংসের কারন হয়ে দাঁড়ায়। তবে আমরা আশাবাদী যে একদিন হয়ত আমরা আমাদের প্রযুক্তিকে ব্যাবহার করে মিউটেশনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। এসবই কেবল ভবিষ্যতই আমাদের বলতে পারে। তাই ভবিষ্যতের অপেক্ষায়...



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

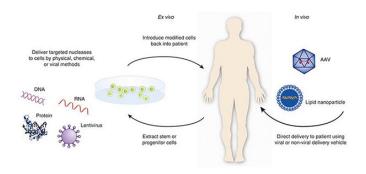
§ 30



জিন থেরাপি: চিকিৎসা বিজ্ঞানের শেষ অধ্যায়

মডার্ণ এইপ

উকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে তার কাছে সবথেকে মূল্যবান জিনিস কি, সে যদি নিতান্তই বোকা না হয়ে থাকে তাহলে বলবে যে তার "জীবন"। এটাই মনে হয় জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা। সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ ভেবে এসেছে যে কিভাবে সে এই প্রকৃতিতে বেশি দিন টিকে থাকবে, ভালভাবে টিকে থাকবে, বেশি দিন বেঁচে থাকবে। শুধু মানুষই নয়, আসলে এটাই যেন প্রতিটা জীবের চিরন্তন আশা-আকাক্ষা। এর প্রধান কারণ সম্ভবত, আপাত দৃষ্টিতে প্রকৃতি কাওকেই অফুরন্ত সময় দেয়নি বেঁচে থাকার জন্য। তাতে আবার বিভিন্ন প্রকার রোগ-বালাই প্রকৃতির এই কাজটা আরও সহজ করে দিচ্ছে যেন দিন কে দিন। যত দিন যাচ্ছে, ততই বিভিন্ন প্রকার রোগের উদ্ভব হচ্ছে এবং সবথেকে কঠিন সত্য হচ্ছে রোগগুলো আরও কঠিনতর হচ্ছে। ভাবটা এমন যেন, রোগেরও যেন ঘিলু (Brain) জিনিসটা আছে তাই তারা বুঝে শুনে নীরবে আমাদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে। আজ যে অসুখটার প্রতিষেধক বের হয়েছে, কাল আবার এই রোগটি অন্যভাবে মাথা চাডা দিয়ে উঠছে। তাই আমাদেরও তাদের মত করে ওষুধের ডোজ বাড়িয়ে বা পরিবর্তন করে পাল্লা দিতে হচ্ছে কিন্তু এভাবে আর কতদিন! প্রতিনিয়ত চলছে মানুষ এর সাথে এইসব রোগ-বালাই এর যুদ্ধ কিন্তু এর তো একটা শেষ থাকা প্রয়ো-জন এবং সেই সময়টা সম্ভবত এসে গেছে। এই নিয়েই আজকের লেখা।



চিত্র ১৩.১: জিন থেরাপির প্রকারভেদ

জিন থেরাপি কি?

প্রত্যেকটা জীবদেহ অসংখ্য কোষ দিয়ে তৈরি এবং প্রত্যেকটা কোষ নির্দিষ্ট ও সমপরিমাণ জিন বহন করে। জিনগুলো কোষের ভিতরে খুব সূক্ষ্মভাবে কাজ করে। একটি জীবের বৃদ্ধি ও পরিক্ষুরনের সময় উক্ত জিনসমূহ প্রতিটি পৃথকভাবে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধ্য থাকে। জিনগুলো এসব বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায় বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন উৎপাদনের মাধ্যমে। এখন প্রশ্ন হল যদি এইসব জিনে কোন ক্রটি থাকে তাহলে কি হতে পারে! সহজেই অনুমেয়, ত্রুটিপূর্ণ জিন দ্বারা উৎপাদিত প্রোটিনও ত্রুটি যুক্ত হবে এবং ফলাফল হিসাবে এর প্রভাব পড়বে বৈশিষ্ট্য প্রকাশে। এভাবে জিনের পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন প্রকার জিনগত রোগের সৃষ্টি হতে পারে। জিন থেরাপি আসলে এক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বংশগত বা জিনগত রোগ নিরাময় করা হয়। অন্যভাবে বললে জিন প্রকৌশলের (Genetic Engineering) মাধ্যমে মানুষের ত্রুটিপূর্ণ কোন জিনকে স্বাভাবিক জিন দ্বারা প্রতিস্থাপন করাকে জিন থেরাপি (Gene Therapy) বলে। এ প্রক্রিয়ায় রোগের জন্য দায়ী জিনটা বাদ দেয়া হয় অথবা সেটাকে একটা ভাল জিন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। আর ঠিক এ কারণেই জিন থেরাপি খুবই নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা। জিন থেরাপি সাধারণ রোগ নিরাময় পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কারণ বিভিন্ন প্রকার ওষুধ প্রয়োগে শুধু রোগের লক্ষণ ও বাহ্যিক সমস্যা গুলো কমে যায় কিন্তু অসুখটি পুরাপুরি নিরাময় হয়না, যে কারণে পরে আবার রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। কিন্তু জিন থেরাপির মাধ্যমে নির্দিষ্ট রোগের জন্য দায়ী ত্রুটিপূর্ণ জিন গুলিকে ভালো জিন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। যাতে করে ক্ষতিকর প্রোটিনের স্থলে শরীর সঠিক এনজাইম (Enzyme) বা প্রোটিন (Protein) উৎপাদনে সক্ষম হয়। প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে এই চিকিৎসা পদ্ধতির পার্থক্য হলও জিন থেরাপির মাধ্যমে শুধু রোগের উপশমই করা হয় না জিনের বৈশিষ্ট্য-গত ত্রুটি দূর করে একে সমূলে নিবারণ করা হয়।

১৯৯০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে আশান্তি দেসিল্ভা নামের ৪ বছরের এক বালিকার উপরে সর্বপ্রথম জিন থেরাপি প্রয়োগ করা হয়। দেসিল্ভার শরীর জন্মগত ভাবে এডেনোসিন ডিএমাইনেজ (Adenosine Deaminase) তৈরিতে অক্ষম ছিল যা দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য অতীব জরুরী। দেসিল্ভার দেহে জিন থেরাপির সফল প্রয়োগ হয়েছিল তবে ফলাফল স্থায়ী হয়নি। বর্তমানকালে জিন থেরাপি কয়েকটি রোগের ক্ষেত্রে বেশ ভালো ফলাফল দিয়েছে যদিও এখনো তা গবেষণার আওতাধীন, সেগুলো হল: সিস্টিক ফাইব্রো-সিস (Cystic Fibrosis), ক্যান্সার (Cancer), এইডস (AIDS), সিকেল সেল অ্যানেমিয়া (Sickle Cell Anemia), অস্টিওপরেসিস (Osteoporosis), হিমোফিলিয়া (Hemophilia), পারকিনসন্স ডিজিজ (Parkinson's Disease) ইত্যাদি।

জিন থেরাপির প্রকারভেদ

কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে জিন থেরাপি প্রধানত দুইভাবে ভাগ করা যায়: দেহকোষ জিন থেরাপি (Somatic Cell Gene Therapy) এবং জননকোষ জিন থেরাপি (Germline Gene Therapy)।

দেহকোষ জিন থেরাপি

নাম থেকেই অনুমান করা কঠিন নয় যে এই জিন থেরাপি দেওয়া হয় দেহকোষে (Somatic Cell)। অর্থাৎ, জিন থেরাপি যখন দেহকোষের ক্রোমোজোমে দেওয়া হয় তখন সেটাকে দেহকোষ জিন থেরাপি বলা হয়। দেহকোষ জিন থেরাপিতে রক্ত কোষ বা ত্বকের কোষ জাতীয় শরীরের কোষে পরিবর্তন আনা হয়। এই পদ্ধতিতে শরীর থেকে কোষ সংগ্রহ করে তাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে তাকে আবার শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয় অথবা শরীরে অবস্থিত কোষেই সরাসরি

পরিবর্তন আনা হয়। হ্যামোফিলিয়া (Hemophilia) বা থ্যালাসেমিয়া (Thalassemia) রোগের চিকিৎসায় এই পদ্ধতি বেশ কার্যকর। এই পদ্ধতিতে কয়েক বিলিয়ন সংখ্যক হাড়ের কোষ সংগ্রহ করা হয়। তারপর তাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে তাকে আবার শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়। এতে নতুন করে যেসব রক্ত কোষ তৈরি হয় তাতে পরিবর্তিত জিনের বৈশিষ্ট্য গুলো প্রকাশ পায়। দেহকোষ জিন থেরাপির মাধ্যমে কৃত পরিবর্তন গুলো শুধুমাত্র রোগীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, বংশগতির ধারাকে প্রভাবিত করে না। অর্থাৎ, পরবর্তী বংশধরে রোগটি আবার ফিরে আসতে পারে।

জননকোষ জিন থেরাপি

অনুরূপ ভাবে, জিন থেরাপিতে যখন জননকোষ ব্যবহার করা হয় তখন সেটাকে জননকোষ $(Germ\ Cell)$ জিন থেরাপি বলা হয়। জননকোষ জিন থেরাপিতে জননকোষ দুটিকে স্বাভাবিকভাবেই নিষিক্ত হতে দেওয়া হয় তারপর নিষিক্ত ডিম্বাণুতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে তাকে আবার মাতৃগর্ভে প্রতিস্থাপন করা হয়। অতঃপর এই নিষিক্ত ডিম্বাণুটি যে জ্রণ গঠন করবে তার সমস্ত কোষে উক্ত ভাবে পরিবর্তিত জিনটি ছড়িয়ে যাবে ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সফল হলে নবজাতকের সমস্ত কোষে পরিবর্তিত জিনটি উপস্থিত থাকে এবং প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনে সক্ষম হয়, কারণ আমরা জানি নিষেকের ফলে উৎপন্ন ডিপ্লয়েড (2n)এককোষী কোষ থেকেই কোষ বিভাজনের মাধ্যমে পূর্ণ প্রাণীটি বিকশিত হয়। ধারণা করা হয় জননকোষ জিন থেরাপির মাধ্যমে সকল বংশগত রোগ (Genetic Disease) পুরোপুরি ভাবে বিতাড়িত করা সম্ভব এবং এই প্রক্রিয়ায় করা পরিবর্তন পরবর্তী বংশধরে স্থানান্তরিত হয় তাই রোগের পুনরায় ফিরে আশার সম্ভাবনা নাই। আর তাই এই ধরনের পরিবর্তন চিরস্থায়ী এবং বংশগতির ধারাকে সরাসরি প্রভাবিত ও পরিবর্তন করে।

আবার কাজের ধরনের উপর ভিত্তি করে জিন থেরাপি কে প্রধানত দুই ভাবে ভাগ করা যায়। নিচে উভয় পদ্ধতিতে সম্পর্কে সামান্য বর্ণ-না দেওয়া হল: এক্স ভিভো ($\rm Ex~Vivo$) এবং ইন ভিভো ($\rm In~Vivo$)।

এক্সভিভো জিন থেরাপি

এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে দায়ী জিন ধারণকারী কোষ বা টিস্যুটিকে কেটে বাহিরে আনা হয়, এবং গবেষণাগারে উপযুক্ত পরিবেশে এই কোষের উপর জিন থেরাপি দেওয়া হয়। ফলাফল ভালো হলে কোষ বা টিস্যুটিকে পুনরায় দেহে স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত নন-ভাইরাল বাহক ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিটি সর্বাপেক্ষা উত্তম কিন্তু যথেষ্ট জটিলতা এবং সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

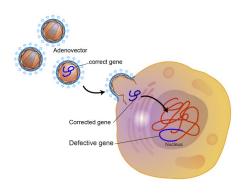
১৩.০.১. ইনভিভো জিন থেরাপি

এই প্রক্রিয়ায় কোষ দেহে থাকা অবস্থাতেই থেরাপি দিতে হয়। এক্ষেত্রে জিনটি সরাসরি রোগীর দেহে প্রবেশ করাতে হয় এবং তা প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হয়। বাহক হিসাবে ইনভিভো জিন থেরাপিতে বিভিন্ন প্রকার ভাইরাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

জিন থেরাপির মুল প্রক্রিয়া

ক্ষতিকর জিনটি ভালো জিন দিয়ে প্রতিস্থাপন করাই জিন থেরাপির মুল কাজ কিন্তু এটি তো মুখে বললেই হয়ে যাবেনা, এর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি। তবে রিসেসিভ (Recessive) জিনের ক্ষেত্রে শুধু জিনটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসালেই হয় কিন্তু ডমিন্যান্ট (Dominant) জিনের ক্ষেত্রে শুধু খারাপ জিনটির প্রতিস্থাপনই শেষ নয়, বরং পাশাপাশি জিনটি জিনোম থেকে পুরোপুরি অপসারণ করতে হয় বা অকার্যকর

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র ১৩.২: এডিনো ভাইরাস দিয়ে নির্দিষ্ট ডিএনএ লক্ষ্যকোষে প্রবেশ করানো হচ্ছে

করতে হয়। এখন কাজ হল, ত্রুটিপূর্ণ জিনটির স্থলে কাঞ্চ্চিত ভালো জিনটির প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে সেটি নিউক্লিয়াসে অনুপ্রবেশ করানো এবং ক্রোমোজোমের (Chromosome) সাথে সংযুক্তকরন। এটা করার জন্য প্রধানত বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস (Virus) ব্যবহার করা হয় যাদের কে বাহক (Vector or Carrier) বলা হয়। ভাইরাস রোগ সৃষ্টি করে তাই বাহক হিসাবে ব্যবহারিত ভাইরাসটির যে জিনটি ক্ষতিকর সেটা রি-ইঞ্জিনিয়ারিং (Recombinant DNA Technology) করে বাদ দেওয়া হয় তবে স্বাভাবিক আক্রমণের ক্ষমতা অটুট রাখা হয় এবং কাঙ্ক্ষিত ভালো জিনটি বাহকের জিনোমের সাথে যোগ করা হয়। অতঃপর ভাইরাসটিকে রোগীর দেহে অনুপ্রবেশ করানো হয়। এরপর ভাইরাসটি তার নিজস্ব ক্ষমতায় বা প্রক্রিয়ায় টার্গেট কোষকে আক্রমণ করে এবং তার জিনোমটি কোষের নিউক্লিয়ার ক্রোমোজোমের সাথে সংযোজন করে অথবা কোষে স্বাধীন ভাবে অবস্থান করে জিনের প্রকাশ ঘটায়। এক্ষেত্রে ভাইরাস দিয়ে শুধু মাত্র সেই সকল কোষগুলো কে আক্রান্ত করা হয় যা রোগের জন্য দায়ী যেমন ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে ইনসুলিন তৈরি করা জিনটিতে ত্রুটি থাকার ফলে ঠিক মতো তৈরি হয়না বা ইনসুলিনের রাসায়নিক কাঠামো (Chemical Structure) পরিবর্তনের কারণে ঠিকঠাক কাজ করেনা। ইনসূলিন তৈরি করে অগ্ন্যাশয়ের ল্যন্সারহান্স কোষ গুচ্ছের বেটা-কোষসমূহ। সুতরাং,

এক্ষেত্রে শুধুমাত্র বেটা কোষ গুলোকে জিন থেরাপি দিলেই সঠিক ইনসুলিন তৈরি হবে এবং ডায়াবেটিস রোগ নিরাময় হবে। এখানে একটি ব্যাপারে একটু বিস্তারিত না লিখলেই নয় তা হল জিন থেরাপিতে ব্যবহারিত বাহক। বাহক ভাইরাল বা নন-ভাইরাল দুই রকমই হতে পারে তবে বেশীরভাগ সময় ভাইরাসকেই ব্যবহার করা হয় কারণ ভাইরাস প্রাকৃতিক ভাবেই তাদের জিন মানবদেহে সংযোজন করতে পারে এবং বিজ্ঞানীরা ভাইরাসের এই ক্ষমতাই কাজে লাগান। সাধারণত তিন ধরনের ভাইরাস কে জিন থেরাপিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যথা: রেট্রোভাইরাস (Retrovirus), এডিনোভাইরাস (Adenovirus), এবং এডিনো-এসোসিয়েটেড ভাইরাস (Adeno-Associated Virus)। এদের অল্প বিস্তার বর্ণনা নিচে দেওয়া হল।

রেট্রোভাইরাস: বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম জিন থেরাপির কাজে রেট্রোভাইরাস ব্যবহার করেন। এটি এক প্রকার আরএনএ ভাইরাস তাই এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা কাজ্ফিত ভালো জিনটির আরএনএ প্রতিলিপিটি সুনির্দিষ্ট প্রমোটার সহ (প্রমোটার হল এক বিশেষ ধরনের জিন যা একটি নির্দিষ্ট জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সুইচ হিসাবে কাজ করে যা নির্দিষ্ট ওষুধ প্রয়োগের দ্বারা চালু বা বন্ধ করা হয়) ভাইরাস জিনোমের সাথে যুক্ত করেন। রেট্রোভাইরাস কোষে প্রবেশের পর রিভার্স ট্রান্সক্রিণেটজ (Reverse Transcriptase) নামক এক ধরনের এনজাইম নিঃসরণ করে যা তাদের আরএনএ জিনোমের অনুরূপ একটি ডিএনএ তৈরি করে এবং নতুন তৈরিকৃত ডিএনএ কে ইন্টিগ্রেজ (Integrase) এনজাইমের সহায়তায় পোষক কোষের নিউক্লিয়ার ক্রোমোজোমের সাথে যুক্ত করে। তবে এই ভাইরাসের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে যেমন এটি খুব নিখুঁত ভাবে কোষের ক্রোমোজোমের উপর কাজ করতে পারেনা তাই ভালো কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কিছু সম্ভাবনা থেকেই যায় যে কারণে রেট্রোভাইরাসের ক্ষেত্রে এক্সভিভো (Ex Vivo) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

এডিনোভাইরাস:

কোষের নির্দিষ্ট জায়গায় জিন প্রতিস্থাপন না করতে পারলে অনেক প্রকার সমস্যা তৈরি হয়। এ সমস্যা থেকে বাচার জন্য বিজ্ঞানীরা এই ভাইরাস ব্যবহার করে থাকেন। এই ভাইরাস দ্বারা পরিবাহিত জিনটি নিউক্লিয়ার ক্রোমোজোমের সাথে যুক্ত হয়না বরং স্বাধীন ভাবে কোষে অবস্থান করে এবং ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে সঠিক প্রোটিন তৈরি করে। তবে এক্ষেত্রে জিনের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়না তাই এটি নতুন জন্মানো কোষগুলোতে পুনরায় দেওয়ার প্রয়োজন হয়। বর্তমানে, যকৃত ও জরায়ু ক্যান্সারের জিন থেরাপিতে এই ভাইরাস ব্যবহারিত হয়।

এডিনো-এসোসিয়েটেড ভাইরাস:

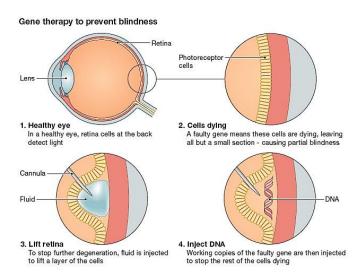
এই ভাইরাস সবথেকে কার্যকর কারণ এটি বিভাজনরত এবং অবিভাজনরত সব ধরনের কোষকেই আক্রান্ত করতে পারে উপরন্তু এই ভাইরাসটি মানবদেহে পাওয়া যায় তাই এটি দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কোন প্রভাব ফেলে না। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এটি ১৯ নাম্বার ক্রোমোজোমের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় জিন সংযুক্ত করতে পারে। মানবদেহের হিমোফিলিয়া রোগের চিকিৎসায় এটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে। তবে এটিও সমস্যার উধের্ব নয় কারণ এটি এতই ক্ষুদ্র যে প্রাকৃতিকভাবে মাত্র দুইটি জিন বহন করতে পারে। ভাইরাস ছাড়াও কোষে জিন ট্রান্সফারের অন্য উপায়গুলো হল: নগ্ন বা প্লাজমিড ডিএনএ ইনজেকশন (Naked DNA Injection), জিন গান (Gene Gun), ইলেক্ট্রোপোরেশন (Electroporation), ম্যায়েটোফেকশন (Magnetofection), সনোপোরেশন (Sonoporation) ইত্যাদি। প্লাজ-মিড (বৃত্তাকার ব্যক্টেরিয়াল ক্রোমোজোম) ডিএনএ ইনজেকশন পদ্ধতিতে প্রথমে প্লাজমিডে ($\operatorname{Plasmid}$) কাঙ্ক্ষিত জিনটি যুক্ত করা হয় তারপর সেটিকে কোষের কাছাকাছি রাখা হয় যাতে কোষ তার স্বাভাবিক নিয়মে অন্যকিছুর সাথে সাথে প্লাজমিডটাও ভিতরে টেনে নেয়। এক্ষেত্রে কোষের কর্তৃক প্লাজমিড গ্রহণের হার খুব কম। অন্যান্য পদ্ধতিগুলোও

একই রকম শুধু বাড়তি কিছু প্রক্রিয়া যোগ করা হয়েছে কোষ কর্তৃক প্লাজমিড ডিএনএ গ্রহণের হার বাড়ানোর জন্য। যেমন, ইলেক্ট্রোপরেশনে কোষের সৃক্ষা ছিদ্র গুলো একটু বড় করার জন্য ইলেকট্রিক ভোল্ট বা ইলেকট্রিক শক প্রদান করা হয় যাতে প্লাজমিডটি সহজে কোষে প্রবেশ করতে পারে। জিন গানের ক্ষেত্রে, জিনকে ধাক্কা দিয়ে কোষের ভিতরে প্রবেশ করানো হয়, তবে এ পদ্ধতিতে জিনকে ঠিক রাখার জন্য প্রথমে প্লাজমিডটিকে গোল্ড পার্টিকেল দ্বারা এমনভাবে আবৃত করা হয় যেন কোষের পাতলা পর্দায় গোল্ড পার্টিকেলটি আটকে থাকে এবং প্লাজমিডটি ভিতরে প্রবেশ করে। অনুরূপ ভাবে, ম্যাগ্লেটোফেকশনে, জিনটিকে একটি চৌম্বক পদার্থের সাথে সংযুক্ত করা হয়, অতঃপর এটিকে চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে কোষের ভিতর প্রবেশ করানো হয় এবং সনোপোরেশন পদ্ধতিতে অতি উচ্চ মাত্রার শব্দতরঙ্গ (Ultrasonic Frequency) দ্বারা প্লাজমিড বা জিনটিকে কোষে প্রবেশ করানো হয়।

যাহোক, জিন থেরাপির নন-ভাইরাল পদ্ধতি গুলো ভাইরাল পদ্ধতির থেকে ভালো হতে পারতো কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা থাকায় সেটা আপাতত সম্ভব হচ্ছেনা।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে জিন থেরাপির কিছু উল্লেখযোগ্য অব-দান

জিন থেরাপি খুব সাম্প্রতিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং বলতে গেলে জিন থেরাপি কেবল ঘোমটা খুলে মুখটা বের করেছে বাকিটা এখনও অজানা ও অনাবিষ্কৃত। কেবল জন্ম নিলেও ইতোমধ্যে জিন থেরাপি তার ক্ষমতা দেখানো শুরু করেছে। তার কিছু অবদান নিচে দেওয়া হল: অতি সম্প্রতি ২০১০ সালের শেষের দিকে, ফ্রান্সের ১৮ বছর বয়স্ক এক রোগীকে জিন থেরাপি দিয়ে বেটা-থ্যালাসেমিয়া রোগ থেকে সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এই রোগীর ক্রোমোজোমে বেটা-হিমোগ্লোবিন তৈরির



চিত্র ১৩.৩: চোখের চিকিৎসায় জিন থেরাপি

দায়ী জিনটি ক্রটিপূর্ণ বা অনুপস্থিত ছিল। বেটা-হিমোগ্লোবিনের পুরোপুরি কার্যক্ষম ছিলনা কারণে রক্ত দিন ফলে তার দেহে বাইরে থেকে রক্ত দেওয়া লাগতো। থে-জিনটির মাধ্যমে উক্ত স্থলে ভালো জিনটি বসানো ফলে বেটা-হিমোগ্লোবিন যুক্ত উৎপন্ন রক্ত তার দেহেই হচ্ছে। অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন করেও এটা সারানো সম্ভব কিন্তু খুব দুষ্কর উপরম্ভ অপারেশন ও অনেক জটিল। জিন থেরাপি দেওয়ায় তার পরবর্তী বংশধরে এই রোগটি আর প্রবাহিত হবেনা।

জিন থেরাপির দ্বারা দৃষ্টিহীনতাও দূর করা সম্ভব। ব্রিটিশ চিকিৎসক বেশ সম্প্রতি এমন দাবিই কয়েকটি করেছেন। ক্ষেত্রে প্রায় দৃষ্টিহীন হতে যাওয়া ব্যক্তিদেরও সারিয়ে পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার করে চোখের কোষে চিকিৎসা করা २य़। এতে আলো শনাক্তকারী কোষগুলো দিয়ে চিকিৎসকদের বিশ্বাস. এই চিকিৎসা একপর্যায়ে প্রতিবন্ধীদেরও সুস্থ করে তোলা যাবে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক রবার্ট ম্যাকলারেন এই গবেষণা কাজের নেতৃত্ব দেন। তিনি জানান, জনাথন উইয়াট (৬৩) নামে এক ব্যক্তি জিনগত সমস্যা করোইডেরেমিয়াতে আক্রান্ত ছিলেন। এই রোগে আক্রান্ত হলে চো-খের পেছনে অবস্থিত আলো শনাক্তকারী কোষগুলো ধীরে ধীরে মরে যায়। তবে অস্ত্রোপচারের পর দেখা গেছে তাঁর দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হয়েছে।

এসব ছাড়াও পরীক্ষামূলক ভাবে কিছু ক্ষেত্রে হিমোফিলিয়া, ক্যান্সার ও পারকিন্সন ডিজিজ ও নিরাময় করা সম্ভব হয়েছে। তবে এগুলো এখনো গবেষণাগারেই সীমাবদ্ধ তাছাড়া বিভিন্ন নৈতিক কারণে (Ethical Issue) মানুষে সরাসরি জিন থেরাপি প্রয়োগে অনেক সমস্যা রয়ে গেছে।

সকল রোগ কি জিন থেরাপি দিয়ে নিরাময় সম্ভব!

অবশ্যই না। কারণ জিন থেরাপি কাজ করে জিন নিয়ে, জিনের পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন ইত্যাদি নিয়ে তাই জিন থেরাপি প্রধানত জেনেটিক রোগগুলো নিরাময় করতে পারবে। বিভিন্ন কারণে আমাদের শরীরের কোষে অভিব্যক্তি (Mutation) ঘটে যার ফলে নানা ধরনের অসুখ হয় যেমন ক্যান্সার, জিন থেরাপি এসব রোগের একটা স্থায়ী সমাধান হতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন রোগ হয় ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার কারণে যেগুলো জিনের পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত সেসব রোগ ও এর মাধ্যমে সারানো সম্ভব যেমন এইডস। জন্মগত বিভিন্ন রোগ যেগুলো জিনের অভিব্যক্তির কারণে হয়ে থাকে যেমন, জন্মগত অন্ধ, মানসিক প্রতিবন্ধী, বর্ণান্ধ (Color Blindness), হিমোফিলিয়া, থ্যালাসেমিয়া, মাথায় টাক পড়া (Baldness) ইত্যাদি রোগ থেকে জিন থেরাপির দ্বারা পুরোপুরি এবং স্থায়ীভাবে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।



চিত্র ১৩.৪: জিন থেরাপির নৈতিক দিক নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে

জিন থেরাপি কি সম্পূর্ণ নিরাপদ?

এতক্ষণে পাঠকদের নিশ্চয় মনে হচ্ছে জিন থেরাপি তো খুব সোজাসাপ্টা একটা ব্যাপার কিন্তু বাস্তবে এর থেকে কঠিন এবং জটিল ব্যাপার আর আছে কিনা সন্দেহ, আসল ব্যাপারটা এখানে খুব সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গবেষকরা এখনো নিশ্চিত নয় যে জিন থেরাপি কতটা নিরাপদ কারণ এটা জিন নিয়ে কাজ করে আর জিনের সামান্য পরিবর্তন অনেক বড় কিছু করে ফেলতে পারে আবার একটা জিন অনেক ক্ষেত্রে একাধিক জিন বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে (Polymorphism) তাই একটা নির্দিষ্ট জিন পরিবর্তন করতে গিয়ে অন্য অনেক বড় ত্রুটির সৃষ্টি হতে পারে। জিন থেরাপিতে ভালো জিনটিকে একটা সুনির্দিষ্ট জায়গায় বসাতে হয় ঠিকঠাক জায়গায় না বসাতে পারলে বড় ধরনের কোন ক্ষতি হতে পারে। জিন থেরাপিতে বিভিন্ন রকমের ভাইরাস কে বাহক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, এই বাহক ভাইরাস খারাপ কোষকে আক্রমণ না করে ভালো কোষকে আক্রমণ করতে পারে। অনেক সময় যদি ভাইরাস বাহক নির্দিষ্ট কোষকে আক্রমণ না করে রোগীর জননকোষ আক্রমণ করে তাহলে তার পরবর্তী বংশধরও ক্ষতির কবলে পারে। তাছাড়া জিনের সামান্যতম পরিবর্তন ক্যান্সার পর্যন্ত সৃষ্টি করতে

পারে। এছাড়া, আমাদের শরীরের নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Immune System) আছে, শরীরে অপরিচিত কিছু প্রবেশ করলেই এটা তাদের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করে দেয়, তাই জিন থেরাপির ক্ষেত্রে যখন বাহক শরীরে প্রবেশ করা হয় তখন হিতে বিপরীত হতে পারে। চিকিৎসাক্ষেত্রে সরাসরি ভূমিকা রাখতে হলে জিন থেরাপিকে এসব জটিলতা দূর করতে হবে। বিজ্ঞানীদের আরও কার্যকর বাহক খুঁজে বের করতে হবে যা আরও বেশি সংখ্যক কোষের উপরে কাজ করতে পারে, নতুন পস্থা উদ্ভাবন করতে হবে যেন আরও বেশি সংখ্যক বাহক উৎপাদন করা যায় এবং আরও কার্যকর প্রমোটার খুঁজে বের করতে হবে যেন যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন উৎপাদিত হয়। তবে জিন থেরাপি যেহেতু অনেক নতুন একটা পদ্ধতি তাই এর সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবের কারণে অনেক সাধারণ বিষয় হয়ত অনেক জটিল মনে হচ্ছে কিন্তু ভবিষ্যতে হয়ত আজকের অনেক সমস্যাই আর সমস্যা থাকবেনা।

জিন থেরাপির ভবিষ্যৎ

জিন থেরাপি এখনো আতুর ঘর থেকে বাইরে বের হয়নি কিন্তু এর মধ্যেই বিজ্ঞানীরা তার প্রেমে পড়ে গেছে এবং তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে। জিন থেরাপি এমন একটা পদ্ধতি যেটা দিয়ে অসম্ভবকে জয় করা সম্ভব। পৃথিবীতে অন্ধ, বধির, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, স্মৃতিভ্রষ্টটা শব্দগুলোর অস্তিত্ব আর যেন থাকছে না। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন হাঁপানি, ডায়াবেটিস, হিমোফিলিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে জিন থেরাপি বিজ্ঞানীদের চোখে আশার আলো জ্বেলে দিয়েছে, স্বপ্নের সোনার হরিণ যেন ধরা দিল বিজ্ঞানীদের হাতে। মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও মানবদেহে অনেক ক্রটি বিদ্যমান যা অনেক নিম্নমানের প্রাণীতে অনুপস্থিত, যেমন, মানুষের চোখ খুব দুর্বল সে তুলনায় অক্টোপাস বা আমাদের চিরচেনা কুকুর, বিড়ালের চোখ অনেক উন্নত, বয়স বাড়ার সাথে মাংসপেশি ও হাডের ক্ষয় শুরু হয় এটাও একটা বিরাট সমস্যা।

দেখা গেছে আমাদের দেহ ত্রিশ বছর পার না করতেই হাড়ের ক্ষয় (Bone Decay) শুরু হয় ফলে হাড়ের ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পায় এবং একটা সময় অস্টিওপরেসিস (Osteoporosis) মত রোগের উদ্ভব হয়, মানুষের উপরের অংশের ভর নিচের অংশ পুরোপুরি নিতে পারেনা যে কারণে বৃদ্ধ বয়সে পশ্চাৎ দিকে ব্যথা (Backpain), বাত সহ নানা রকম অসুখে ভুগি আমরা, মানব জিনোমে অনেক অপ্রয়োজনীয় জিন (Junk DNA) আছে যা অনেক ক্ষতিকর অভিব্যক্তি (Mutation) ঘটাতে পারে – জিন থেরাপির মাধ্যমে এসব ত্রুটি দূর করা যেতে পারে। বিজ্ঞান আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে কিন্তু মৃত্যুকে এড়াতে পেরেছে কি! অবাক হলেও সত্যি যে বিজ্ঞানীরা এখন মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে চেষ্টা করছে, কারণ স্বাভাবিক মৃত্যুকে এক ধরনের জেনেটিক ডিজিজ বলা যেতে পারে এবং আশার কথা হল প্রাণিজগতের বেশ কিছু প্রাণী এই রোগ থেকে মুক্ত এবং তারা রীতিমত বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে মৃত্যুকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানোতেই পারদর্শী। এই প্রাণী গুলো হল-কচ্ছপ, জেলিফিশ, কিছু প্রজাতির বড় শামুক, হাইড্রা, গলদা চিংড়ি ইত্যাদি। প্রত্যেক প্রাণী একটা নির্দিষ্ট বয়সে যাওয়ার পর থেকে সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয় অর্থাৎ মৃত্যুর হার বাড়তে থাকে, এটা প্রাণিজগতে খুব কমন ব্যাপার কিন্তু সবথেকে মজার বিষয় এই জীব গুলো একটা নির্দিষ্ট বয়স পার করার পর এদের মৃত্যুর হার কমতে থাকে, অর্থাৎ একটা প্রাপ্ত বয়স্ক কচ্ছপ আর একটি ২৫০ বছরের বুড়া (আমাদের হিসাবে) কচ্ছপ সব দিক থেকে হুবহু তরুণ কচ্ছপটির মতো। এই প্রাণীগুলো এটা কিভাবে করে তা বোঝার জন্য বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লেগেছেন এবং তারা ভাবছেন কি করে মানুষের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়, সামান্য কিছু ক্ষেত্রে তারা সফলও হয়েছেন। আমার কথা গুলো কল্পবিজ্ঞান (Science-Fiction) মনে হতে পারে অনেকের কাছেই কিন্তু বিষয়টা এখন দিনের আলোর মতই সত্য এবং স্বচ্ছ। উৎসাহীরা গুগল স্কলারিতে (Google Scholar) অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন, এ সম্পর্কিত অনেক গবেষণা পত্র পাওয়া যাবে।

উপসংহার

জিন থেরাপি এখনো গবেষণার আওতাধীন তাই এ সম্পর্কে ঠিকঠাক কিছু বলা কঠিন। তবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে চিকিৎসা হিসাবে জিন থেরাপি এক নতুন দিগন্ত, যে দিগন্তের কোন শেষ নেই এটা বললেও বোধহয় খুব একটা অত্যুক্তি হবেনা। এটা মানতেই হবে যে জিন থেরাপির এখনো অনেক সীমাবদ্ধতা আছে তবে সময়ের সাথে সাথে এর রূপ পূর্ণভাবে বিকশিত হবে এবং ভবিষ্যতে হয়ত চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটি একক আধিপত্য বিস্তার করবে। গবেষকরা মনে করেন কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। তারা মনে করেন জিনবাহিত রোগ নির্মূলে ও জিনের সাধারণ ত্রুটি দূরীকরণে জিন থেরাপিই হবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শেষ দুর্গ। ভবিষ্যতের জিন থেরাপি হয়ত এমন এক সময়ের জন্ম দিবে যখন ক্যান্সার, এইডসের মতো রোগ গুলো বর্তমান সময়ের পোলিও রোগের মতো বিদায়াতঙ্কে ভুগবে। হয়ত এমন এক পৃথিবীর জন্ম দিবে যেখানের মানুষ রোগ শব্দটাই ভুলতে বসবে, তাদের ভিতর কোন দুর্বলতা থাকবেনা, হয়ত অমরত্বের স্বাদ ভোগ করবে মানুষ। যাহোক, ভবিষ্যৎ এক রহস্যময় অজানা জগত, আশা যেমন পূরণ হতে পারে আবার ভাঙতেও পারে কিন্তু বর্তমানের আবছা আলোয় দেখা পথের শিশুটিকে ভবিষ্যতের শাহেনশাহ্ ভাবতে দোষ কি! তাই আশায় আমরা বুক বাধতেই পারি।

তথ্যসূত্র

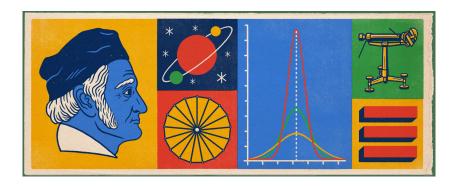
- 🗞 জিন প্রকৌশল ও জৈবপ্রযুক্তি মোহাম্মদ ফারুক মিয়া
- 🗞 ব্যাড ডিজাইন অভিজিৎ রায়
- ♦ Gene Therapy US National Library of Medicine

- ♦ Human Gene Therapy twnside.org.sg
- ⊗ Gene Therapy Successes Learn.Genetics



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

§ 38



যে রাজপুত্র নন রাজার ছেলে

শাহরিয়ার কবির পাভেল

রো নাম ইয়োহান কার্ল ফ্রিডরিখ গাউস। জন্ম ৩০ এপ্রিল ১৭৭৭, জার্মানির ব্রাউনশভিগে। সাধারণ এক পরিবারেই জন্ম হয় এই অসামান্য প্রতিভাবানের। অনেকের বিচারে সর্বকালের সেরা গনিতবিদও। গণিতে তাঁর প্রতিভা আর অবদানই তাঁকে করেছে 'Prince of Mathematics'।



চিত্র ১৪.১: জার্মান গণিতবিদ গাউস, (১৭৭৭-১৮৫৫)। সূত্র: উইকিপিডিয়া

গাউসের প্রতিভা বেশ ছোটবেলাতেই আঁচ করা গিয়েছিল। মাত্র তিন বছর বয়সে ছোট্ট গাউস তাঁর বাবার হিসাবের খাতার ভুল ধরে ফেলেন! প্রখর বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন শিশুব্যক্তিত্বকে ইংরেজিতে বলে $\operatorname{Prodigy}$ । গাউসও ছোটবেলায় দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি কী জিনিস!

গাউসের সম্পর্কে সর্বাধিক প্রচলিত গল্পটি এরকম:

একদা তাঁর শিক্ষক গাউসকে ব্যস্ত রাখতে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো যোগ করে ফল বের করতে বললেন। কিন্তু গাউস শিক্ষককে অবাক করে দেন প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে যোগফল বলে দিয়ে।

১+১০০, ২+৯৯, ৩+৯৮, ... এরকম ফর্মেটের ৫০টা ১০১ কল্পনা

करत पृथ करत यन रवत करत रमनान ४०४०।

এটা তাঁর ৯বছর বয়সের ঘটনা! অতএব, শিক্ষক হোক আর আপনিই হোন অবাক না হয়ে থাকার জো নেই।

বয়স যখন ১৫, মৌলিক সংখ্যার সংখ্যা বের করার সূত্র বের করে ফেললেন!

কোনো সংখ্যা n হলে ঐ পর্যন্ত কতগুলো মৌলিক সংখ্যা পাওয়া যাবে তার একটা আসন্ন মান বলে দিবে এই সূত্রটি:

$$\Pi(n) \approx \frac{n}{\ln(n)}$$

যেখানে n হচ্ছে কতো'র ভেতরে মৌলিক সংখ্যার হিসেবটা জানতে চাই আর $\Pi(n)$ হচ্ছে আসন্ন মান।

তথ্য মোতাবেকে $\Pi(100)=25,\ \Pi(500)=95,\ \Pi(1000)=168$ ।

সূত্রে n=100 বসালে মান পাওয়া যায় $21.71,\ n=1000$ বসালে 144.76।

আমরা জানি ১০০ এর ভিতর মৌলিক সঙ্খ্যা ২৫টি আর ১০০০ এর ভিতর ১৬৮টি। অর্থাৎ বেশ কাছাকাছি একটা হিসেব সূত্র দিয়ে পাওয়া গেল: ২১ আর ১৪৪। আসলে মৌলিক সংখ্যার ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব বের করে ফেলার সূত্র আজ পর্যন্ত বেরোয়নি! আমরা নাহয় ১০০, ১০০০, ১০০০০ ... এরকম ছোট লিমিটের ক্ষেত্রে মৌলিক সঙ্খ্যা কতগুলো তা গুণে বের করে ফেলতে পারব কিন্তু সীমা বিশাল হলে তো আর পারবো না! এইখানটাতেই, গাউসের সূত্রটির মাঝে পিকিউলিয়ার একটা ব্যাপার লুকিয়ে আছে। n এর মান যত বড় দেয়া হবে সূত্রটিও তত বেশি কার্যকারিতা দেখাতে থাকবে, ভুলের হার

আরো আরো কমতে থাকবে।

আর এই ছোট্ট সূত্রটির প্রমাণ পেতে পৃথিবীকে গুনতে হয়েছে প্রায় ১০০ বছর!

আগ্রহী পাঠকদের জন্য সারণী ১৪.১ দেয়া হল। এখানে দেয়া আছে কত পর্যন্ত গেলে ঠিক কতগুলো মৌলিক সংখ্যা পাওয়া যাবে, যাতে গাউসের সূত্রটির সাথে হিসেবের পার্থক্যটা বের করে দেখতে পারেন। n এর মান বৃদ্ধির সাথে সূত্র আর পরিসংখ্যান মিলিয়ে দেখুন ভুলের শতকরা হার কী আচরণ করে।

গাউসের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা ব্রাউনশভিগের ডিউকের নজরে আসে। তিনি পেয়ে গেলেন শিক্ষাবৃত্তি মাত্র ১৪বছর বয়সে। কলেজিয়াম ক্যারোলিনামে পড়ালেখা করবার সুযোগ পেলেন। তিনি ১৭৯২ থেকে ১৭৯৫ পর্যন্ত সেখানে অধ্যয়ন করেন। তারপর ১৭৯৫তে গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। কিন্তু গ্রাজুয়েশন শেষ না করেই ১৭৯৮ তে গটিনজেন ছেড়ে দেন।

ততদিনে গাউস আরো আরো ব্রিলিয়ান্ট হয়ে গিয়েছিলেন!

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় গাউস বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপপাদ্য নতুন করে আবিষ্কার করেন।

জানা যায়, ১৭৯৬ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে এত বেশি আর ঘন ঘন গাণিতিক ধারণা তাঁর মাথায় আসত যে সবগুলো লিখে রাখারও সময় হত না! কিন্তু তিনি গবেষণাপত্র প্রচার ও প্রকাশের পেছনে তত মনোযোগী ছিলেন না।

তাঁর কোন কিছু প্রকাশের মূলমন্ত্র ছিল "Pauca sed matura" অর্থাৎ "Few, but ripe" - কম হোক, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ হওয়া চাই। ঠিক এই কারণে তাঁর মৃত্যুর পর অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র

n	10^n থেকে ছোট প্রাইমের সংখ্যা
1	4
2	25
3	168
4	1229
5	9592
6	78498
7	664579
8	5761455
9	50847534
10	455052511
11	4118054813
12	37607912018
13	346065536839
14	3204941750802
15	29844570422669
16	279238341033925
17	2623557157654233
18	24739954287740860
19	234057667276344607
20	2220819602560918840

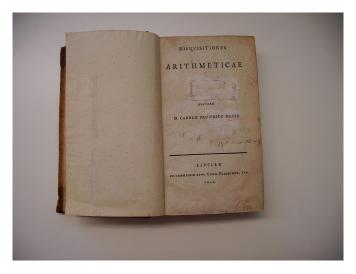
সারণী ১৪.১: 10^n থেকে ছোট কতটি প্রাইম আছে তার তালিকা। যেমন, n=1 হলে দেখা যাচ্ছে $10^1=10$ এর চেয়ে ছোট প্রাইম আছে 4টি। সূত্র: The OEIS Foundation

পাওয়া গিয়েছিল যেগুলো তিনি প্রকাশ করেন নি এই ভেবে, ওগুলো যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ বা মানসম্পন্ন মনে হয় নি!

১৮০১ সালে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বই Disquisitiones Arithmeticae

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

প্রকাশিত হয়। এটা লেখার কাজ আরো তিন বছর আগেই তিনি সম্পন্ন করেন। এটি গণিতের ইতিহাসে সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে এক অনবদ্য বই। এ বইয়ে তিনি কনগ্রুয়েন্স বা অনুসমতার জন্যে একটি নতুন চিল্রের ব্যবহার প্রচলন করেন এবং এর মাধ্যমে ভাগশেষ পাটীগণিতের পরিষ্কার উপস্থাপনা করেন। আমরা যেটাকে বলি মডুলাস অ্যারিথমেটিক।



চিত্র ১৪.২: পাটিগণিতের শ্রেষ্ঠ বই বলা হয় যেটিকে, Disquisitiones Arithmeticae।

এর মধ্যেই তিনি এক প্রাচীন সমস্যা সমাধান করে ফেলেন কেবলমাত্র রুলার আর কম্পাসের সাহায্যে সুষম ১৭ভূজ এঁকে। এটা ছিল এক তুখোড় আবিষ্কার! কারণ, এই অঙ্কণের সমস্যাটি গণিতবিদদের প্রাচীন গ্রিক আমল থেকেই ভাবিয়ে আসছিল। আরো দেখিয়ে দিয়েছিলেন ফার্মা'র মৌলিক সংখ্যাগুলোর মানের সুষম বহুভূজও রুলার কম্পাস ব্যবহার করে আঁকা সম্ভব। ফার্মা'র মৌলিক সংখ্যা চারটি হল: 5, 17, 257, 65537।

তাঁর একটি সহজ আর সুন্দর গাণিতিক প্রকাশ $\triangle + \triangle + \triangle = N;$ যেকোন স্বাভাবিক সংখ্যাকে ত্রিভুজ সংখ্যার সমষ্টি আকারে প্রকাশ করতে

তিনটির বেশি ত্রিভুজসংখ্যা কখনোই লাগবে না! যেমন,

$$35 = 28 + 6 + 1$$
 $39 = 36 + 3$
 $96 = 78 + 15 + 3$
ইত্যাদি...

আবার যেকোনো দুটি পরপর ত্রিভুজ সংখ্যার সমষ্টি একটি বর্গসংখ্যা! যেমন,

$$10 + 15 = 25$$

 $45 + 55 = 100$

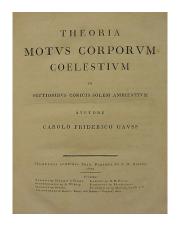
টুকটাক খাতার খেলা মাথার খেলা আরকি!



চিত্র ১৪.৩: Science Photo Library (SPL) থেকে সংগৃহীত ছবি

১৮০১এর ১লা জানুয়ারি ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিওসেপ্পে পিয়াজ্জি গ্রহাণু সেরেস আবিষ্কার করেন। সেরেস হচ্ছে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝপথে অবস্থিত গ্রহাণুপুঞ্জের সবচেয়ে বড় বস্তু। কিন্তু তিনি মাত্র কয়েকদিন বামন গ্রহটি পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হন। পিয়াজ্জির কথা কেন বললাম? কারণ, গাউস গ্রহটির অবস্থান সঠিকভাবে হিসাব করে পুনরায় একে খুঁজে পাওয়ার পথ বাতলে দেন এবং ৭ ডিসেম্বর ১৮০১ এ তাঁর হিসেব সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।

পরে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে গবেষণায় ডুব দেন। ১৮০৯ সালে প্রকাশ করেন ব্যবহারিক জ্যোতির্বিদ্যার এক অসামান্য বই: Theoria Motvs Corporvm Coelestivm।



চিত্র ১৪.৪: ১৮০৯ সালে প্রকাশ করা Theoria Motvs Corporvm Coelestivm। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই। সূত্র: christies.com

১৮০৭এ গোটিংগেনের জ্যোতির্বিজ্ঞান অবজার্ভেটরির প্রফেসর অফ এস্ট্রনমি ও ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ চাকরিতে বহাল ছিলেন। ১৮২১ সালে তাকে রয়েল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস এর বিদেশী সভ্য নির্বাচন করা হয়।

১৮২১ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত তিনি হ্যানোভারে জিওডেসিক জরিপের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন। এ সময় তিনি হেলিওট্রপি নামে এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। আমরা অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির জনক বলে জেনাস বোলাই আর নি-কোলাই লোবাচেভঙ্কির নাম জানি। জেনাসের বাবা ফারাকাস বোলাইও এই পথেরই ছিলেন এবং তিনি ছিলেন গাউসের বন্ধুও!

মজার ব্যাপার হচ্ছে, জেনাস তাঁর অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি প্রকাশের পর গাউস বলে বসেন তাঁর গত ত্রিশ বছরের চিন্তা-গবেষণার সাথে তা মিলে যায়। পরবর্তীতে জানা যায়, গাউস ব্যাপারটা চেপে রেখেছিলেন এজন্যে যে প্রথাবিরোধী সেই জ্যামিতি প্রকাশে না তাঁকে আবার বিপদে পড়তে হয় এই ভয়ে!

ঐ যে! সেই প্রকাশের পিছুটান!

তাঁর রয়েছে ১৫৫টি গবেষণাপত্র! তিনিই সত্যিকার অর্থে সংখ্যাতত্ত্বর ভিত গড়ে দিয়ে গেছেন। প্রমাণ করেছেন বীজগণিতের মৌলিক উপপাদ্য। কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় তাঁর বাবা তাঁকে ডেকে বললেন, "কার্ল, তুমি সারাদিন কলেজে কী কর? তুমি ত ইতোমধ্যে যথেষ্ট জানো! তোমার এখন চাকরি খোঁজা উচিত।" আসলে গাউসের সহপাঠীরা প্রথম বর্ষেই বুঝে গিয়েছিল এই ছেলে অনেকে হাই লেভেলের! কারণ যা-ই করানো হতো গাউস দেখতেন সেগুলো তাঁর অচেনা কিছু নয়! তিনি আগেই জানেন!

বাবার প্রশ্নের জবাবে গাউস বলেছিলেন,

বাবা, আমি গণিতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কোনটা তা বোঝার চেষ্টা করছি! আমার সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে পড়া দরকার!

বলা বাহুল্য তাঁর বাবা যারপরনাই বিরক্ত হয়েছিলেন মেধাবী পুত্রের এমন নির্বোধ(!) সিধান্তে। পরবর্তীতে তাঁর বাবা তাঁর স্কুলশিক্ষক বাটনারের সাথে কথা বলে তাঁকে এ ব্যাপারে পড়াশোনা করানোয় সম্মত হন। বাটনার সাহেব হলেন সেই বাচ্চা গাউসের ১০০টি সংখ্যার তড়িত যোগফল শুনে চমকে যাওয়া লোকটি, যিনি গাউসের মেধার ব্যাপারে

যথেষ্ঠ জ্ঞাত!

গাউস তাঁর এক জীবনে মানবজাতিকে অবিস্মরণীয় কত কিছু দিয়ে গেছেন সে হিসেবও অনেক। সংখ্যাতত্ত্ব, বিশ্লেষণী গণিত, ডিফারেসিয়াল জ্যামিতি, তাড়িতচৌম্বকত্ব, জিওডেসি, জ্যোতির্বিদ্যা এবং আলোকবিদ্যা-সব মিলে মহাযজ্ঞকর্ম সাধন করে গেছেন।

গণিতের রাজপুত্রের জীবনাবসান ঘটে ১৮৫৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি, জার্মানির হ্যানোভারে। সেখানেই তাঁকে কবর দেয়া হয়।

Mathematics is the queen of sciences and number theory is the queen of mathematics.

— গাউস

অন্যান্য মনীষীর মত গবেষণা মগ্নতার কারণে পাঠককে বিহবল করার মত ঘটনা গাউসেরও আছে।

তাঁকে কেউ এসে জানিয়েছিল, আপনার স্ত্রী মারা যাচ্ছে, চলুন। কিন্তু মগ্ন গাউস বলেছিলেন,

Ask her to wait a moment, I am almost done.

তথ্যসূত্র

- Malini Lingarajaprabhu. Johann Carl Friedrich
 Gauss. 2009 Fascinating Facts Of Mathematics.
- ♦ Quotations: Carl Friedrich Gauss MacTutor History of Mathematics Archive.

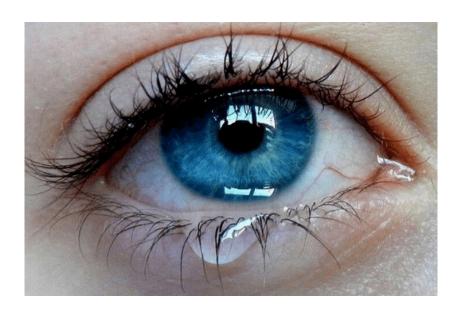
- ♦ A006880 as a simple table The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences.
- ♦ M.B.W. Tent. The Prince of Mathematics. 2006.
- জি ফার ছবিসূত্র: 241. Geburtstag von Johann Carl Friedrich Gauss − Google Doodle-Archiv.

দ্রষ্টব্য: লেখাটি পূর্বে গণিত সাময়িকী 'পাই - জিরো টু ইনফিনিটি'তে প্রকাশিত হয়েছিল।



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

§ 36



কানার ব্যবচ্ছেদ: একটি প্রায় বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা

সাবরিনা সুমাইয়া

মাদের জীবন শুরু হয় কান্না দিয়ে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জী-বনের প্রায় সমস্ত উপলক্ষে জড়িয়ে আছে কান্না। কখনো আমরা কাঁদি বিষাদে, কখনো বা তা আনন্দ অশ্রু হয়ে ঝরে। এছাড়া পেঁ-য়াজ কাটার সময়ও আমাদের চোখ থেকে জলপপ্রাতের মতো পানি পড়ে!

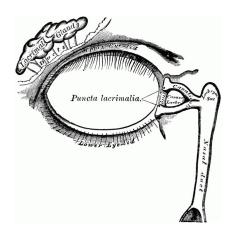
কান্না নিয়ে কত গল্পগাথা, কত কবিতা,কত গান... কিন্তু কখনো ভেবে দেখেছেন কি আমরা কিভাবে কাঁদি? কেন কাঁদি? পেঁয়াজ কান্নার সাথে আনন্দে কান্না বা বিষাদে কান্নার কি পার্থক্য? এইসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা নিয়েই এই লেখাটি।

কান্না হচ্ছে আবেগের প্রতি সাড়া দিয়ে চোখ দিয়ে জল পড়া। চোখের উপরের পাতায় থাকে অশ্রুগ্রন্থি (tear gland or lacrimal gland)। এখানে অশ্রুর উৎপত্তি। চোখের উপরের অংশের কর্নিয়া এবং শ্বেততন্ততে থাকে অনেকগুলো ছোট ছোট অশ্রুনালী (tear ducts)। এই নালী পথে অশ্রু পুরো চোখে ছড়িয়ে যায়। এভাবে অশ্রু চোখকে আর্দ্র রাখে। অশ্রনালী ছড়িয়ে থাকে নাসাগহ্বরেও। যখন কোনো শক্তিশালী আবেগ আমাদের নাড়া দেয় অর্থাৎ আবেগের বিক্লোরণ ঘটে তখন চোখ দিয়ে তো অঝোরে জল ঝরেই, নাক দিয়েও ঝরে। একেই বলে ''নাকের জলে চোখের জলে এক হওয়া"!

ভালো কাঁদতে পারা বা না পারা মনোশারীরিক কোনো মেধার স্বাক্ষর বহন করে কিনা, সংস্কৃতি এবং লিঙ্গভেদে কান্নার ধরন আলাদা কিনা মনোবিজ্ঞীরা এইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য গবেষণা শুরু করেছেন। তাদের গবেষণা আমাদের সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং স্নায়ুবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কান্নাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে পারে।

অবশ্যই নারীরা পুরুষদের তুলনায় বেশি কাঁদেন। জার্মান সোসাইটি অব অপথ্যালমোলজির এক গবেষণায় দেখা গেছে বছরে নারীরা গড়ে ৩০ থেকে ৬৪ বার আর পুরুষেরা গড়ে ৬ থেকে ১৭ বার কাঁদেন। শব্দ করে কান্নার ক্ষেত্রে নারীদের হার ৬৫%। পুরুষরা এদিক থেকে

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



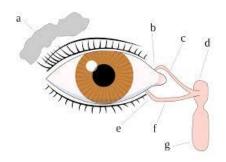
চিত্র ১৫.১

একেবারেই পিছিয়ে! মাত্র ৬% পুরুষ শব্দ করে কাঁদেন।

প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমন হয়?

শারীরতাত্ত্বিক দিক থেকে বলতে গেলে পুরুষের শরীরে থাকা টেস্টো-স্টেরণ হরমোনই কান্নাকে দমিয়ে রাখে। অন্যদিকে, নারীদের শরীরে থাকে প্রোল্যান্টিন যার ফলে তাদের কান্নার প্রবণতা বেশি। কিন্তু এই দুটি হরমোনের উপস্থিতিই যে নির্দেশ করবে আপনি কাঁদবেন নাকি কাঁদবেন না তা কিন্তু নয়। কারণ কান্না মূলত তিন প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকার কান্নার ধরন ও জড়িত রাসায়নিক পদার্থগুলো আলাদা। চলুন এবার কান্নার প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাক।

চোখের ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি থেকে প্রোটিনসমৃদ্ধ, ব্যাকটেরিয়ানাশক এক প্রকার তরল পদার্থ নির্গত হয়। চোখ মিটমিট করলে এই তরল পুরো চোখে ছড়িয়ে যায়। এই ধরনের কান্নাকে বলে বেসাল কান্না (basal tears)। এর ফলে আমাদের চোখ সবসময় আর্দ্র এবং সুরক্ষিত থাকে।



চিত্র ১৫.২

বলতে পারেন পেঁয়াজ কাটার সময় আমরা কিভাবে কাঁদি?

এই ধরনের কান্নাকে বলে রিফ্লেক্স কান্না (reflex tears)। রিফ্লেক্স কান্না চোখকে ক্ষতিকর পদার্থ যেমন বাতাস, ধোঁয়া এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ থেকে রক্ষা করে। এর ফলে চোখে হঠাৎ করে পড়া ময়লা, পোকামাকড় চোখ থেকে বেরিয়ে যায়।

আর তৃতীয় ধরনের কান্না হচ্ছে প্রাকৃতিক কান্না (physic tears)। এটা হলো আবেগজনিত কান্না। এই ধরনের কান্নার ফলে আপনার চোখ থেকে ঝর ঝর বাদল ধারার মতো অশ্রুধারা নামতে থাকে! মানসিক চাপ, হতাশা, বিষন্নতা থেকে এই কান্নার সৃষ্টি। এমনকি অনেক সময় অতিরিজ্ঞ হাসলেও আমাদের চোখ থেকে পানি পড়ে। এটাও আবেগজনিত কান্না।

এটা একটা প্রশ্ন যে, হাসলে চোখ দিয়ে পানি পড়ে কেন?

মনোবিজ্ঞানীরা এক গবেষণায় খুঁজে পেয়েছেন, আনন্দের ফলে চোখ থেকে অশ্রু ঝরা শরীরের আবেগীয় ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে। ইয়েল ইউনিভার্সিটির গবেষকরা এক পরীক্ষায় দেখেন, যারা ইতিবাচক সংবাদে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখান তারা দ্রুত আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আচ্ছা, এইসব নানান ধরনের চোখের জল কি একই রকম দেখতে?

উত্তর হচ্ছে: না। ফটোগ্রাফার রোজলিন ফিশার তার নতুন প্রজেক্ট "টপোগ্রাফি অব টিয়ারস" নিয়ে কাজ করার সময় চোখের জলের ব্যাপারে একটি চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি তার নিজের চোখের জলকে একটি স্লাইডে রেখে শুকিয়ে ফেলেন।

তারপর আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এটা পর্যবেক্ষণ করেন। "এটা সত্যি মজার ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন প্লেন থেকে দেখা নিচের কোনো দৃশ্য"। ফিশার বিভিন্ন রকম অশ্রু একই রকম দেখতে কিনা জানার জন্য কয়েক বছর ফটোগ্রাফি প্রজেক্টটি করেন। তিনি নিজের এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীদের থেকে একশর বেশি চোখের জলের নমুনা সংগ্রহ করেন, পরীক্ষা করেন এবং ছবি তোলেন। এর মধ্যে সদ্য জন্ম নেয়া শিশুর অশ্রুও ছিল। তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখের জলেরযে গঠন দেখেন সাধারণভাবে তা ছিল ক্ষটিকাকার লবণ।

কিন্তু, বিভিন্ন আবেগীয় অবস্থায় ঝরা জলের আণুবীক্ষনিক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় এদের আকার এবং গঠন ভিন্ন । সুতরাং, একই রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত দুইটি ভিন্ন ফিজিক টিয়ারসের ছবি ছিল ভিন্ন। মানে আপনি আনন্দে কাঁদলেন আর আপনার বন্ধু দুঃখ পেয়ে কাঁদল ... এই দুরকম চোখের জল দেখতে আলাদা হবে। এদের সান্দ্রতা, গঠন, বাপ্পীভবনের হার আরো অনেককিছুতেই পার্থক্য থাকবে।

ফিশারের গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় বিভিন্ন দৃষ্টকোণ থেকে দেখা চোখের শুকনো জলের স্লাইড আকাশ থেকে দেখা বিশাল কোনো দৃশ্যের মতো।তাই তিনি একে বলেন, "মনভূখন্ডের অন্তরীক্ষ দৃশ্যে"।

কান্নার সাথে জড়িত হরমোন:

প্রোল্যান্টিন এবং টেস্টোস্টেরণ ছাড়াও কান্নায় আরো কিছু হরমোন এবং নিউরোট্রাঙ্গমিটারের ভূমিকা আছে। সেরকম একটি হরমোন হচ্ছে সেরেটোনিন। গবেষণায় দেখা গেছে বাচ্চা জন্মদানের পরে শরীরে ট্রিপ-টোফ্যান (সেরেটোনিন ক্ষরণ ত্বরাম্বিত করে) কমে যায়। ফলে আবেগীয় ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় এবং কান্নার প্রবণতা বাড়ে। প্রেমে পড়লেও ট্রি-পটোফ্যান কমে যায়। এজন্যই দেখবেন প্রেমাক্রান্ত লোকজন বেশি কাঁদে।

কান্না কি উপকারী?

হ্যাঁ, কান্না উপকারী।

চলুন দেখি কান্না আমাদের কি কি উপকার করে – পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ATCH (Adrenocorticotropic hormone) ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে এদ্রেনাল গ্রন্থি থেকে কর্টিসল(fight or flight response hormone) উৎপন্ন হয়। এই কর্টিসল রক্তচাপ বাড়ায়, রক্তে শুগারের পরিমাণ বৃদ্ধি করে যা আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বাড়িয়ে তোলে। আরো বিভিন্ন শারীরতাত্ত্বিক পরিবর্তন আমাদেরকে কাজ করতে উদ্দীপ্ত করে। এর ফলে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপ কমানোর মোক্ষম অস্ত্র হচ্ছে কান্না। কান্নাকাটির পর শান্ত অনুভব করার অভিজ্ঞতা আমাদের সবারই আছে। এর কারণ হল – কাঁদলে অতিরিক্ত ATCH বের হয়ে যায় এবং কর্টিসোলের পরিমাণ কমে যায়। ফলে চাপ কমে যায়। আমাদের শরীরে থাকা চাপ নিবারক আরেকটি উপাদান হচ্ছে লিউসিন এনকেফালিন (leucine enkephalin)। আরেগজনিত অশ্রুর সাথে এটি নিঃসৃত হয়। এটি ব্যথা কমায় এবং মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটায়। পেইনকিলার হিসেবে আমরা যে ওমুধগুলো খাই লিউ এনকেফালিন অনেকটা সেরকম কাজ করে।

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র ১৫.৩

বিভিন্ন বয়সে কান্না

প্রথমেই আসা যাক শৈশবে। নতুন জন্মানো শিশুর কান্নার সময় চোখ দিয়ে পানি পড়ে না। পানি পড়ে আরেকটু বড় হলে। কান্না আসলে শিশুদের যোগাযোগের মাধ্যম। ক্ষুধা লাগলে, ঘুম পেলে বা ব্যথা পেলে তারা কাঁদে। শিশু আরেকটু বড় হলে, ধরা যাক, ১০ মাস বয়সে কাঁদে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য। দক্ষ অভিনেতার মতো এ কান্নাকে বলে মায়াকান্না (crocodile tears)। বয়সন্ধীকালে টেস্টোস্টেরণ এবং প্রোজেস্টেরণ ক্ষরিত হয়। এসময় মেয়েরা বেশি কাঁদে। ছেলেরা লক্ষ্যণীয়ভাবে কম কাঁদে।

মেয়েদের বেশি কাঁদার আরেকটা কারণ তাদের অশ্রুনালী ছেলেদের তুলনায় কম দীর্ঘ। এজন্য দ্রুত চোখে পানি আসে।

প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে কান্নার ধরন বদলাতে থাকে। কারণ টেস্টোস্টেরণ এবং প্রোজেস্টেরণের মাত্রায় পরিবর্তন আসে।পুরুষেরা বেশি কাঁদতে থাকে, নারীরা কম।

বিভিন্ন সংস্কৃতিতে কান্না

বিভিন্ন সংস্কৃতিতে কান্না বিভিন্ন হয়। যেমন পশ্চিমা সমাজে কান্নাকে ইতিবাচকভাবে নেয়া হলেও এশিয়ান সমাজে কান্নাকে, বিশেষ করে ছেলেদের ক্ষেত্রে দুর্বলতা ধরা হয়। এক জরিপে দেখা গেছে, আমেরিকা এবং ইতালির লোকজন চীন এবং ঘানার লোকজনের চেয়ে বেশি কাঁদ। পার্থক্য আছে শেষকৃত্যে কান্নার ধরনেও। যেমন ফিজিতে আপনি মরদেহ দাফন করার আগে পর্যন্ত কাঁদতে পারবেন না। ইরানে আবার জোরে কাঁদলে সমস্যা নাই।

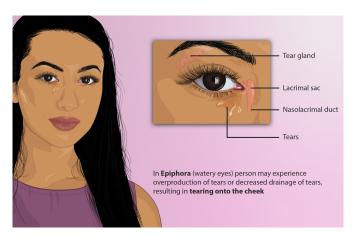
ধর্মভেদেও কারা আলাদা হয়। যেমন ইসলামে কারাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। আবার বুদ্ধধর্মে কারা অনুমোদিত নয়।

কতটুকু কান্না স্বাভাবিক?

শিশুদের জন্য প্রতিদিন তিন ঘন্টা কাঁদা স্বাভাবিক। এর চেয়ে বেশি কাঁদলে বুঝতে হবে তাদের চিকিৎসা দরকার। ঠান্ডা লাগা বা অন্য কোন সমস্যার কারণে এমন হতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কদের কার্নার ক্ষেত্রে কোনো ম্যাজিক নাম্বার বা সময় আসলে নাই। কার্নার পরিমাণ অনেকাংশেই প্রভাবিত হয় মানুষের পরিবেশ দ্বারা। আপনি কতটুকু কাঁদছেন তা বলে দেয় আপনি মানসিকভাবে কতটুকু সুস্থ। অতিরিক্ত কার্নাকাটি ডিপ্রেসনের লক্ষণ হতে পারে। আবার একেবারে না কাঁদা বা কম কাঁদাটাও তীব্র ডিপ্রেসনের উপসর্গ হতে পারে। এই ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক আছে। যেমন – নেদারল্যান্ডসের গবেষকরা বেশি কার্না বা কম কার্না ডিপ্রেসনের লক্ষণ এই দাবীর পক্ষে জােরালাে কোনাে প্রমাণ পাননি।

কান্না যখন আবেগ ছাড়াও বেশি কিছু

আপনাকে কেউ অশ্রুসজল চোখে দেখার মানে এই নয় যে আপনি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে গেছেন! শরীরের অন্য কোনো সমস্যার কারণে এমন



চিত্র ১৫.৪: ছবির সূত্র উইকিপিডিয়া

হতে পারে। অশ্রুনালী বন্ধ হয়ে গেলেও আপনার চোখ প্লাবিত হতে পারে। বার্ধক্য, আঘাত, সংক্রমণ, প্রদাহের কারণে এমন হতে পারে। এই ধরনের কান্নার প্রতি আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। একে বলে প্যাথলজিক্যাল কান্না। আবার কিছু কিছু রোগ যেমন – স্ট্রোক, আলঝেইমার, মাল্টিপল সেরোসিস ইত্যাদির কারণেও চোখ থেকে পানি পড়তে পারে। গবেষকরা বলেন, এরকম অতিরিক্ত কান্নাকাটি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা ছাড়াও হতে পারে। সেক্ষেত্রে মস্তিষ্কে সেরেটোনিনের পরিমাণ কমে যাওয়ার উপর দোষ চাপানো যেতে পারে। সর্বোপরি, কান্না যতক্ষণ না প্যাথলজিক্যাল হচ্ছে এর জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।

মানুষ একমাত্র প্রাণী যে আবেগে কাঁদতে পারে। কান্না শুধু মানু-ষের অনন্য বৈশিষ্ট্যেই নয়, এর আছে মানিসকভাবে মানুষকে সুস্থ রাখার বিশাল শক্তি। মন খুলে কাঁদা আমাদের সুস্থ এবং চাপমু-ক্ত থাকতে সাহায্য করে। কান্না কোনো দুর্বলতা নয়, এটা একটা শক্তি।

তাই, কান্না পেলে মন খুলে কাঁদুন। সুস্থ থাকুন।

তথ্যসূত্র

- ♦ Crying Wikipedia
- ♦ Lorna Collier. Why we cry (2014) American Psychological Association
- ♦ Claire Duffin. Why do we cry tearts of joy? (2014) The Telegraph
- ♦ Joseph Stromberg. The Microscopic Structures of Dried Human Tears (2013) – Smithsonian Magazine
- 🗞 ফিচার ছবিসূত্র: Pinterest



§ 36



রাশিফলবিদ্যাকে না বলুন

মেহজাবিন হোসেন

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

সবুকের নিত্য নতুন হুজুগের জগতে এখন এক নতুন সংযোজন - ''যারা অমুক মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন তারা কেমন!" এধরণের অযৌক্তিক, অর্থহীন ফেসবুকীয় এপ্লি-কেশনগুলো ছেলেখেলা বলে হয়তো আমি, আপনি উড়িয়ে দিয়েছি; কিন্তু আপনার বন্ধুতালিকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ যখন - ''হু হু! আমি কি আর কাউরে ডরাই! ভাঙতে পারি লোহার কড়াই" - বলে অত্যন্ত গর্ব সহকারে এসব এপ্লিকেশনের ফলাফল প্রচার করেন- তখন এ সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, ঠিক কী আকর্ষণে আমরা/তারা এসব বিশ্বাস করি/করেন – তা জানার কৌতৃহল আমার/আপনার হতেই পারে। আর যেখানেই কৌতৃহল, সেখানেই বিজ্ঞান।



চিত্র ১৬.১: জনপ্রিয় সিরিজ ''বিগ ব্যাং থিউরি"- এর প্রথম পর্বেই রাশিফলবিদ্যার চর্চা নিয়ে এই সংলাপটি আছে। যেখানে ড. শেলডন কুপার তার নতুন প্রতিবেশি পেনিকে একদম মুখের উপর সত্য কথা বলে দেয়।

এই কৌতৃহলের নিবৃত্তি ঘটানোর আগে আসুন একটু আমার নিজের জ্যোতিষবিদ্যার জ্ঞান জাহির করি। আপনি মানে যে ব্যক্তি আমার এই লেখাটি এখন পড়ছেন আমার কেনো যেনো মনে হচ্ছে, - ''আপনার ভেতর আরেকজনের প্রশংসা পাবার, লোকের চোখে পছন্দের ব্যক্তি হবার প্রবল তাড়না কাজ করে। নিজের প্রতি সমালোচনাপ্রবণ হবার প্রবণতা আছে আপনার। আপনি এখনো আপনার অন্তর্নিহিত শক্তিকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাননি। যদিও আপনার কিছু ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা আছে কিন্তু তারপরও আপনি এটা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারেন। বাইরে নিয়মানুবর্তী এবং আত্মসংযমী দেখালে ও ভেতরে ভেতরে আপনি দুশ্চিন্তাপ্রবণ; এবং একই সাথে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেন। মাঝে মাঝে আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে বেশ দ্বিধায় ভুগেন। আপনি নির্দিষ্ট মাত্রার পরিবর্তন পছন্দ করেন এবং যেকোনো বাধা, সীমাবদ্ধতায় অসম্ভষ্ট হয়ে পড়েন। আপনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পছন্দ করেন এবং সন্তোষজনক প্রমাণ ছাড়া কারো কথা মেনে নেন না। আপনি আরেকজনের সামনে নিজের খোলামেলা প্রকাশকে বোকামি মনে করেন। মাঝে মাঝে আপনি বহির্মুখী, বন্ধুভাবাপন্ন, সামাজিক আবার মাঝে মাঝে আপনার ভেতর অন্তর্মুখিতা, সদা সতর্কভাব ও লক্ষ করা যায়। আপনার কিছু কিছু স্বপ্ন একেবারে আকাশকুসুম। জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আপনার অন্যতম প্রধান লক্ষ।" কী ভাবছেন? কিভাবে আপনার সম্পর্কে এতোসব সত্য কথা বলে দিলাম? এর উত্তর জানার জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৯৪৮ সালে, সাহায্য নিতে হবে মনস্তত্ত্ববিদ বার্টাম আর. ফোরের এর। মনস্তত্ত্ববিদ ফোরের মনোবিজ্ঞানের একদল শিক্ষার্থীকে আহবান জানালেন নিজের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ যাচাইয়ের পরীক্ষায় অংশ নিতে। এক সপ্তাহ পর ফোরের শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে পরীক্ষার ফলাফল লিখে পাঠালেন। এবং সেইসাথে অনুরোধ করলেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য অনন্য এই ফলাফলের যথার্থতা বিচার করে পাঁচ পূর্ণমান ধরে মূল্যায়ন করতে। গড়পড়তা শিক্ষার্থী তাদের ব্যক্তিত্বের এই ক্ষেচকে ৪.২৬ (৮৫% সঠিক) বলে মূল্যায়ন করেন। প্রিয় পাঠক এখানে কিন্তু এক বিরাট শুভঙ্করের ফাঁকি ছিলো। জনাব ফোরের শিক্ষার্থীদের আলাদা কোনো ফলাফল পাঠাননি, বরং প্রত্যেককেই একই রকম ব্যক্তিত্বের ক্ষেচ লিখে পাঠিয়েছিলেন। ফলাফলটা কী ছিলো জানতে চান? একটু উপরে উঠে আপনার সম্পর্কে করা আমার বয়ানটি দেখে আসুন। ঠিক এটিই লিখেছিলেন মনস্তত্ববিদ ফোরের। একই ফলাফল লেখার পর ও কেনো বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী একে ৮৫% সঠিক বলে মূল্যায়ন করলো? একটু পরে আসছি এর ব্যাখ্যায়। তার আগে আরো একটি চমকপ্রদ পরীক্ষার দিকে চোখ দেই। এই পরীক্ষায় মনোবিজ্ঞানের শিক্ষকেরা একদল ছাত্রছাত্রীকে একটি গবেষণার অংশ হিসেবে দুইরকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লিখে পাঠান। একটি ছিলো পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্বের সঠিক বিশ্লেষণ আর আরেকটি ছিলো ভুল এবং অস্পষ্ট বিশ্লেষণ। শিক্ষার্থীদের যখন তাদের বিবেচনার ভিত্তিতে সঠিক ফলাফলটি বাছাই করতে বলা হলো তখন আশ্চর্যজনক হলে ও সত্য ৫৯% শিক্ষার্থী ব্যক্তিত্বের ভুল বিশ্লেষণটাকেই খুশি মনে নিজের চরিত্রের প্রতিচ্ছবি বলে দাবি করলেন।

এর পেছনের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আর এর সাথে জ্যোতিষিরাজাধিরাজদের সম্পর্ক কোথায়?

কেনো উপরের দুটো পরীক্ষায় এমন হলো? কারণগুলো ভালভাবে খেয়াল করুন, রাশিশাস্ত্রের ফাঁকি ধরে ফেলতে পারবেন। প্রথমত, মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষ নিজের সম্পর্কে ইতিবাচক কিছু শুনতে পছন্দ করে। আমাদের দ্বিতীয় পরীক্ষাটিতে শতকরা ৫৯ ভাগ স্বেচ্ছাসেবক কেনো খুশিমনে ভুল ফলাফল বেছে নিয়েছিলেন? কারণ, ভুল বিশ্লেষণটি ছিলো ইতিবাচক কথায় ভরপুর আর মানুষ মাত্রই প্রশংসার কাঙাল। দ্বিতীয়ত, আপনি যদি মনে করেন যিনি আপনার ব্যক্তিত্বের বর্ণনা করছেন, অতীত, ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনাকে জানাচ্ছেন তিনি আসলেই এধরণের জ্ঞানের অধিকারী তবে আপনি কোনোকিছু জানার আগেই তার প্রতি একধরণের অন্ধবিশ্বাসের মোহে পড়ে যান। তৃতীয়ত, আমরা অস্পষ্ট যেকোনো কিছুকে খুব সহজে ব্যক্তিগতকৃত করে ফেলতে পারি। শুরুতেই আপনার সম্পর্কে করা মন্তব্যগুলোই পড়ে দেখুন না! বক্তব্যটি অস্পষ্ট নয় কি? ''মাঝে মাঝে" শব্দটির ব্যবহার এটিকে ধোঁয়াশা

করে তুলেছে। আর ঠিক এরকম ধোঁয়াশা, অস্পষ্ট কথারই আশ্রয় নেন রাশিফল-বিশারদরা, জ্যোতিষীরা। ঠিক এভাবেই তারা ইতিবাচক কথায় ভরপুর করে, নেতিবাচক বাণী অপেক্ষাকৃত কম দিয়ে, অস্পষ্ট, ধোঁয়াশা করে আপনার সম্পর্কে বানোয়াট কথা লিখে দেন; আর আপনি জ্যো-তিষীর উপর ভরসা করে খুবই খুশি মনে এসব কথা বিশ্বাস করে নেন।

আজ পর্যন্ত ঠিক কতোটুকু স্পষ্ট করে তারা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন বলুন তো? তারা বলেন, ''আজ অর্থপ্রাপ্তি ঘটতে পারে" তারা কখনো বলেছেন, ''আজ শার্টের পকেটে, পুরানো ড্রয়ারে টাকা পেয়ে যেতে পারেন"? ভেবে দেখুন।

এসব ব্যবসা করে যারা পেট চালান, তারা আমাদের আরেকটি মানসিক বৈশিষ্ট্যের ও ফায়দা লুটেন। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এর গালভরা নাম"Hit and Miss" অর্থাৎ, কোনোভাবে এসব অস্পষ্টতার সাহায্য নিয়ে হাজারখানেক ভবিষ্যতবাণীর মধ্যে যদি একটি মিলে যায়- আমরা ঐ একটি সাফল্যই আমরণ মনে রেখে দেই, আর বাকি ৯৯৯ টি ভুল ভবিষ্যতবাণীর কথা বেমালুম ভুলে যাই।

পদার্থবিজ্ঞানের আলোয়

জ্যোতিষশাস্ত্রের মূলকথা অনুযায়ী, সূর্য নিয়ন্ত্রণ করে সিংহ রাশির জাতকদের, চাঁদের ইশারায় চলে কর্কট রাশির জাতকেরা আর মঙ্গল,
জুপিটার প্রভৃতি গ্রহ দ্বারা ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয় বাকি রাশির জাতকদের।
হাত গণনাকারীদের মতে, আলোকবর্ষ দূরে থাকা এসব গ্রহ, নক্ষত্র আমাদের ভাগ্য কোনো এক শক্তিবলে প্রভাবিত করছে। আচ্ছা ধরুন,
তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম দূরে থাকা গ্রহের শক্তির প্রভাব এই পৃথিবীতে আমাদের উপর আছে। তো সেই শক্তিগুলো কী কী হতে পারে? আমাদের হাতে খুব বেশি বিকল্প নেই। পদার্থবিজ্ঞান আমাদের চারটি মৌলিক বলের প্রভাবের কথা জানায়। অভিকর্ষ, তড়িংচুম্বকীয় বল, সবল এবং দুর্বল বল। শেষের দুইটি বলের প্রভাব শুধুমাত্র পারমাণবিক পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়। সবল বল পরমাণুর অভ্যন্তরে বিপরীতধর্মী চার্জযুক্ত প্রোটন এবং ইলেকট্রনকে একত্রে রাখার ক্ষেত্রে কাজ করে। আর দুর্বল বল তার বল দেখায় তেজন্ত্রিয় ক্ষয়ের ক্ষেত্রে ।এই দুই বলকেই আমরা ''গ্রহ কর্তৃক আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ"- তত্ত্বের চালিকা হিসেবে বাদ করে দিতে পারি শুরুতেই। কারণ হচ্ছে, এই দুই বলের প্রভাব খুব কম দূরত্ব পর্যন্ত থাকে। দুর্বল বল কাজ করে প্রোটনের ব্যাসের ০.১ শতাংশ পর্যন্ত! তাই মনে করার কোনোই কারণ নেই জ্যোতিষীরা কোনো না কোনোভাবে এই বলদুটিকে আমাদের নিয়তির প্রভাবক বলে চালিয়ে দিতে পারবেন।

এরপর আসি তড়িংচুম্বকীয় বলের কথায়। তড়িংচুম্বকীয় বল নির্ভর করে বৈদ্যুতিক চার্জ আর দূরত্বের উপর। তড়িং নিরপেক্ষ গ্রহসমূহের তড়িংচুম্বকীয় বল আমাদের উপর কাজ করে না।

হারাধনের একটি ছেলের মতো বাকি থাকলো অভিকর্ষ বল। অভিকর্ষ বল নির্ভর করে দূরত্ব আর ভরের উপর। যত বেশি ভর কোন বস্তুর ততো বেশি আকর্ষণ শক্তি দিয়ে সে টেনে রাখে তার আশেপাশের বস্তুদের। আর দূরত্বের সাথে সাথে কমতে থাকে এই আকর্ষণ। অভিকর্ষ বল আর দূরত্বের সম্পর্কটি এরূপ: কোনো বস্তুকে যদি দ্বিগুণ দূরে সরিয়ে নেওয়া হয় তবে তার অভিকর্ষ বলের প্রভাব হ্রাস পায় চারগুণ। কোন বস্তুকে ১০ গুণ দূরত্বে সরিয়ে নিলে আশেপাশের বস্তুর উপর তার আকর্ষণ বল হ্রাস পাবে ১০২ গুণ অর্থাৎ ১০০ গুণ। পৃথিবীর উপর অভিকর্ষ বলের প্রভাবের খেলায় যদি কোনো বিজয়ী থাকে তবে তা চাঁদ। চাঁদের ভর খুব বেশি নয় (পৃথিবীর ১/৮০ ভাগ মাত্র) কিন্তু দূরত্বগত দিক দিয়ে এটি পৃথিবীর কাছে, যেখানে ভেনাস-পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ -চাঁদের তুলনায় ১৫০ গুণ দূরে। জ্যোতিষীরা যদি দাবি করেন, গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব আমাদের উপর আছে তবে সেটা হতে পারে একমাত্র অভিকর্ষ

বলের প্রভাব। কিন্তু রাশিশাস্ত্রের এখানে ও বিরাট ঘাপলা। আগেই বলেছি, পৃথিবীর মানুষের উপর চাঁদের অভিকর্ষ বল সবচেয়ে বেশি; সে অনুযায়ী রাশিশাস্ত্রের একচছত্র অধিপতি হওয়ার কথা চাঁদের কিন্তু তা না ঘটে একই পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষের উপর বিভিন্ন গ্রহের প্রভাবের কথা বলছে এই ভুয়া শাস্ত্র। কাছের ভেনাসের ও যে প্রভাবের কথা বলে এই বিদ্যা, দূরের জুপিটারের ও একই প্রভাবে বিশ্বাস করে তারা।

এখন জ্যোতিষীদের একমাত্র ভরসা কোনো অজানা, অচেনা বল যা কিনা বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা! এই বল দূরত্বের উপর নির্ভর করে না (তাতো অবশ্যই, নাহলে তো চাঁদই জ্যোতিষবিদ্যার একমাত্র চোখের মণি হতো, আর বিভিন্ন দূরত্বের গ্রহগুলো একই প্রভাব দেখাতে পারতো না!) এই বল ভরের উপর ও নির্ভর করে না (করলে, জুপিটারই হতো রাশিশাস্ত্রের রাজাধিরাজ হতো জুপিটার, আর মার্কারি কোনো পাত্তাই পেতো না।)

আমরা যদি ধরেই নেই দূরত্ব এবং ভরের কোনো গুরুত্ব নেই, তাহলে, ধূমকেতু, ব্ল্যাকহোল এসবের প্রভাব নেই কেনো আমাদের ভাগ্যের উপর?

মনে রাখুন, জ্যোতিষীদের কাছে গ্রহ নক্ষত্রের দূরত্ব কোনো ব্যাপারই নয়। দূরত্ব এতোই তুচ্ছ হলে ২০০০ এর উপর যেসব বহিঃগ্রহ সূর্য ব্যতিরেকে অন্য নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরছে- আমাদের ভাগ্যের উপর তাদের প্রভাব কেনো বাদ দিচ্ছেন রাশিশাস্ত্রবিদেরা?

আপনারা কী জানেন, আজ আপনারা যেসব রাশিতে বিশ্বাস করেন সেই ১২ টি রাশিফলের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে ''পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্রে"- এই বিশ্বাসের উপর। যেখানে একটি শাস্ত্রের মূলভিত্তিই এমন ভুল দিয়ে শুরু, সেখানে আপনি কীভাবে এই শাস্ত্রের উপর এতো অগাধ বিশ্বাস রাখেন?

অনেক কথা বললাম। এবার একটু নিজের কথা বলি। অন্য অনেকের

মতো আমি নিজে ও রাশিফল বিশ্বাস করিনা বলতাম ঠিকই কিন্তু চুপিচুপি পত্রিকার সাপ্তাহিক রাশিফল পড়ে হয় আনন্দে ডগোমগো হতাম নয়তো তুলারাশির তুলোধোনার খবর পড়ে চিন্তায় কপাল কুঁচকে রাখতাম। সে বহুদিন আগের কথা; এখন আমি এসবে আর বিশ্বাস করিনা এবং চাই আপনারা ও বিশ্বাস করবেন না। আপনারা এক্ষেত্রে বলতে পারেন, ''তুমি বাপু নিজে বিশ্বাস করোনা- ভালো কথা। আমাদের নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া না করলে হয় না?" উত্তর হচ্ছে ''না, হয়না।" কারণ, এক গবেষণায় দেখা গেছে, শুধুমাত্র ২ মিনিটের একটি ভ্রান্তবিশ্বাসমূলক ভিডিওচিত্র দেখার ফলশ্রুতিতে দর্শকদের মাঝে যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা গ্রহণ করার প্রবণতা এবং নিজে যাচাই বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেবার দক্ষতায় তাৎপর্যপূর্ণ হ্রাস ঘটে। দুই মিনিটের ভিডিওচিত্রের ফলাফল যদি এমন হয় তবে, বছরের পর বছর পত্রিকায় রাশিফল প্রকাশ করে, ভাগ্য পরিবর্তনে রত্ন-পাথরের রমরমা ব্যবসা করে আমরা নিজেদের কোন অন্ধকারের পথে নিয়ে যাচ্ছি?

তথ্যসূত্র

- ♦ Sander van der Linden. How come some people believe in the paranormal? (2015) − Scientific American
- Philip C. Plait. Bad Astronomy: Misconceptions and Misuses Revealed, from Astrology to the Moon Landing "Hoax" (2002).



§ 39

 $\frac{1}{A} = \frac{nR^{3} r v}{v y_{1}} \times dA \cdot d \cdot dF r^{3} = \frac{1}{A} \cdot \frac{1}{\sqrt{r} \cdot n} \times \frac{1}{\sqrt$

পদার্থবিজ্ঞানের যে ৬টি সমীকরণ বদলে দিয়েছিল ইতিহাসের বাঁক

আহম্মদ উল্লাহ ফয়সাল

দার্থবিজ্ঞানের সমীকরণগুলো যেন যাদুর ছোঁয়া। তারা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে অতীতকে, যেমন কেন হ্যালির ধুমকেতু ৭৬ বছর পর পর আসে। আবার সাহায্য করে ভবিষ্যদ্বাণী করতেও, একেবারে মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত। তারা সম্ভাব্যতার সীমানা আরোপ করে যেমন ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতায় এবং তারা এমনসব বাস্তবতার মুখোমুখি আমাদের দাড় করায় যা আমাদের কল্পনাতেও কখনো ছিল না, যেমন পরমাণুর ভেতরের শক্তি। গত শতাব্দীগুলোতে নতুন সমীকরণ নতুন যাদু নিয়ে পরের প্রজন্মকে অলংকৃত করেছে। বদলে দিয়েছে ইতিহাসের বাক। তেমনি ছয়টি সমীকরণ নিয়ে আজকের আলোচনা।

১. নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র (১৬৮৭)

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

সহজ ভাষায়ঃ

বল হচ্ছে ভর ও ত্বরণের গুণফল। নিউটনের অন্য দুটি সমীকরণ সমেত এই সমীকরণ চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের ভিত রচনা করেছিল। ${f F}=m{f a}$ পদার্থবিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের বলের মান গণনায় সাহায্য করে। যেমন, আপনার ওজন হলো আপনার ভর ও ত্বরণের গুণফল। এই সমীকরণ যান্ত্রিক যুগে পৌছতে অপরিহার্য ছিল। এটা আপনাকে বলে একটা ইঞ্জিনের গাড়িকে শক্তি জগাতে কতখানি ক্ষমতার দরকার, উড়ার জন্য বিমানের কত উপরে উঠতে হবে, রকেট পৃথিবীর বাঁধন মুক্ত হতে কতটা থ্রাস্ট দরকার ইত্যাদি।

২. নিউটনের সার্বজনীন মহাকর্ষ সূত্র (১৬৮৭)

$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

সহজ ভাষায়ঃ

আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর থাকতে পারছি কেননা আমাদের গ্রহটা তুলামূলক বড় ও ভারী।

যা আমাদের শিখিয়েছিলঃ

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মহাবিশ্ব দুটো ভাগে বিভক্ত ছিলো পার্থিব ও আকাশস্থ। নিউটনের সূত্র পার্থিব ও আকাশের সব জায়গায় প্রয়োগ করা সম্ভব হলো। যেই ব্যাপারটার ফলে চাঁদ পৃথিবীকে ঘিরে ঘোরে। নিউটন আমাদের প্রথম প্রতিদিনকার জীবন ও স্বর্গীয় বস্তুর চলাচলের সরাসরি সংযোগ দেখালেন।

প্রয়োগঃ

অনেকদিন ধরেই এই সমীকরণ গ্রহের কক্ষপথ গননায় ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। ১৯৫০ ও '৬০ এর দশকে তা প্রথম ব্যবহারিক জগতে আসলো। যার মাধ্যমে কক্ষপথে স্যাটেলাইট ও চাঁদে মহাকাশচারীদের পাঠানো হতো। অবশ্য নিউটন স্বীকার করেছিলেন তিনি জানেন না 'কেন' মহাকর্ষ ঘটে। এর সমাধান বের করতে লেগেছিল প্রায় ২৩০ বছর। আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে মহাকর্ষকে ব্যখ্যা করেছিলেন ভারী বস্তুর পতনের ফলে সৃষ্ট স্থানকালের বক্রতা হিসেবে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিউটনের ৩৩০ বছর পুরনো সূত্র দিয়েই কাজ চলে যায়।

৩. তাপগতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্র (১৮২৪)

 $S_{\text{universe}} > 0$

সহজ ভাষায়ঃ

এন্ট্রপি (বিশৃঙ্খলার একটা পরিমাপ) সবসময়ই বাড়ে।

যা আমাদের শিখিয়েছিলঃ

১৯ শতকে বাষ্প ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা বিশ্লেষণের সময় ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী সাদি কার্নো বিজ্ঞান জগতের সবচেয়ে অন্তর্নিহিত এক সমীকরণ নিয়ে হাজির হলেন। এই সমীকরণ বলছে কিছু প্রক্রিয়া অপরিবর্তনীয়, এমনকি তা সময়ের বহমানতার জন্যও দায়ী। সবচেয়ে সহজ করে বললেতাপ সবসময় উষ্ণ বস্তু থেকে শীতল বস্তুতে পরিভ্রমণ করে। এটিকে আরো বড় পরিসরে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কেউ কেউ একে বর্ণনা করেছেন মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতিতে যেখানে সব নক্ষত্ররা পুড়ে শেষ হয়ে যাবে ও বিনাশিত তাপ ছাড়া কিছু থাকবে না।

প্রয়োগঃ

এই সমীকরণ শিল্প বিপ্লবের বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল! বাষ্প ইঞ্জিন থেকে দাহ্য ইঞ্জিন, রেফ্রিজারেটর থেকে রসায়ন প্রকৌশল, কোথায় নেই এর ব্যবহার। বাস্তব ইঞ্জিনে শক্তি সবসময় অপচয় হয় তাই এই সূত্র চিরন্তন গতিশক্তির যন্ত্রের কপালে পেরেক ঠুকে দিয়েছিল!

৪. ম্যাক্সওয়েল-ফ্যারাডে সমীকরণ (১৮৩১ ও ১৮৬৫)

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

সহজ ভাষায়ঃ

আপনি বিদ্যুতক্ষেত্র পরিবর্তন করে চুম্বক ক্ষেত্র বানাতে পারবেন। মানে বিদ্যুৎ ও চুম্বক আসলে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত।

যা আমাদের শিখিয়েছিলঃ

১৮৩১ সালে ফ্যারাডে দুটি প্রাকৃতিক বল বিদ্যুৎ ও চৌম্বকত্বের মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করেন, যখন নিকটবর্তী দুটি তারে বিদ্যুৎ দিয়ে

চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তন করেন। পরে ম্যাক্সওয়েল ফ্যারাডের পর্যবেক্ষণকে বিদ্যুৎচৌম্বকত্বের চারটি সাধারণ সূত্র দিয়ে প্রকাশ করেন।

প্রয়োগঃ

এই সমীকরণ বিশ্ব-শক্তির যোগানে সহায়ক। বেশিরভাগ জেনারেটর যান্ত্রিক শক্তিকে চুম্বক ঘুরানোর মাধ্যমে কাজ করে। সাধারনভাবে বললে, এই সমীকরণ এখনো বিদ্যুৎ প্রকৌশল, যোগাযোগ প্রযুক্তি ও অপটিক্সের প্রায় সকল শাখাতেই ব্যবহৃত হয়।

৫. আইন্সটাইনের ভর-শক্তি সমীকরণ (১৯০৫)

$$E^2 = (mc^2)^4 + (pc)^2$$

সহজ ভাষায়ঃ

শক্তি হচ্ছে ভর ও আলোর বর্গের গুণফল।

যা আমাদের শিখিয়েছিলঃ

সমীকরণে ধ্রুবক থাকায় সামান্য ভরের পরিবর্তনের কারণে বিশাল পরিমাণ শক্তি নির্গত হতে পারে।

প্রয়োগঃ

আইসটাইনের সবচেয়ে বিখ্যাত সমীকরণে লুকিয়ে ছিল নিউক্লিয়ার ফিশনের ফলে বিশাল পরিমান শক্তি লুকিয়ে থাকার ইঙ্গিত। দুটি নিউক্লিই এর সম্মিলিত ভর একটি বড় নিউক্লিই এর চেয়ে কম এবং হারিয়ে যাওয়া ভরটাই শক্তিতে পরিণত হয়। 'Fatman' পারমাণবিক বোমা জাপানের নাগাসাকিতে ফেলা হয়েছিলো ১৯৪৫ সালে। মাত্র এক গ্রাম ভরকে শক্তিতে পরিণত করা হয়, কিন্তু তা উৎপন্ন করেছিলো ২০,০০০ টন ট্রাইনাইট্রো টলুইনের বিস্ফোরণ!

৬. শ্রোডিঙ্গারের তরঙ্গ সমীকরণ (১৯২৫)

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t) \right] \Psi(\mathbf{r}, t)$$

সহজ ভাষায়ঃ

এই সমীকরণ বলে কীভাবে কণার তরঙ্গ এর গতিশক্তি থেকে নির্ণয় করা যায়। এটা নিউটনের ${f F}=m{f a}$ এর কোয়ান্টাম সংস্করণ।

যা আমাদের শিখিয়েছিলঃ

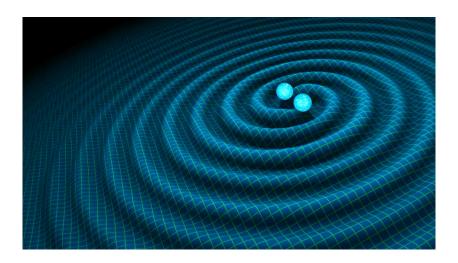
যখন শ্রোডিঙ্গার ১৯২৫ সালে এই সমীকরণ প্রস্তাব করেছিলেন, তখন তা কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের নতুন তত্ত্ব স্থাপন করে যা পদার্থবিজ্ঞানীদের কণা কীভাবে চলাচল ও মিথস্ক্রিয়া করে সেই গণনায় সাহায্য করেছিল।

প্রয়োগঃ

সহজে বললে, এই সমীকরণ পরমাণুর গঠন বর্ণনা করে। যেমন নিউক্লিয়াসের পাশে ইলেক্ট্রনের গঠন ও সব রাসায়নিক বন্ধনের গঠন। আরো নির্দিষ্ট করে বললে এই সমীকরণ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অনেক গণনা ও বেশিরভাগ আধুনিক প্রযুক্তি যেমন লেজার থেকে ট্রাঞ্জিস্টরের ভিত্তি! তাছাড়াও কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের চালিকাশক্তি এটি।



§ 36

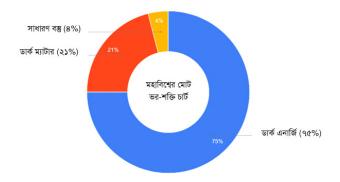


গ্র্যাভিটেশনাল লেসিং

তরিকুল দিপু

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

নুষের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর জন্ম দিয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান। মহাবিশ্ব কী দিয়ে গঠিত, কীভাবে গঠিত হয়েছিল, এর সত্যিকার বয়স কত, এর ভবিষ্যৎ কী, কেনইবা মহাবিশ্ব দেখতে এরকম ইত্যাদি দার্শনিকসুলভ প্রশ্নগুলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চার ফলেই জন্ম নিয়েছে এবং উত্তর পেয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এই ধরনের প্রশ্ন করে আসছে কিন্তু কেবলমাত্র গত শতকে আমাদের শক্তিশালী টেলিস্কোপ, কম্পিউটিং দক্ষতা ও নিরলস গবেষণা এই প্রশ্নগুলোর গ্রহণযোগ্য উত্তরের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের বর্তমান উপলব্ধি নিচের পাই-চার্টিটর মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে।

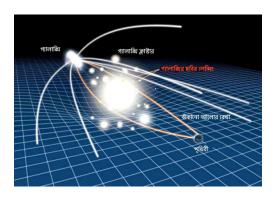


চিত্র ১৮.১: মহাবিশ্বের মোট ভর-শক্তির শক্তির শতকরা অনুপাত।

এই চার্টটি সমগ্র মহাবিশ্বের সম্পূর্ণ ভর-শক্তিকে প্রকাশ করছে। আই-নস্টাইনের ভর-শক্তি উপপাদ্য থেকে জানা যায়, ভর ও শক্তি উভয়ে আসলে একই। এই হিসেবে ভর মূলত কোনো বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তিকেই প্রকাশ করে।

যে সকল নিয়মিত ও স্বাভাবিক বস্তু দিয়ে এই মহাবিশ্ব অর্থাৎ ছায়াপথ, গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা, ধূলিকণা, শিলা, গ্যাস ইত্যাদি গঠিত তাদেরকে ব্যারিওনিক পদার্থ বলে। এই ব্যারিওনিক পদার্থ সমগ্র মহা- বিশ্বের মোট ভর-শক্তির মাত্র ৪ শতাংশকে প্রকাশ করে। উপরের চার্টিটির বাকি দুটো অংশ হলো Dark matter এবং Dark energy। এখন পর্যন্ত জানা তথ্য মতে, সমগ্র মহাবিশ্ব এই তিনটি উপাদানে গঠিত।

জ্যোতির্বিদরা যখন লেঙ্গিং নিয়ে কথা বলেন তখন লেঙ্গিং বলতে গ্র্যাভিটেশনাল লেঙ্গিংয়ের প্রভাবকে বোঝান। সাধারণ লেঙ্গ যেমন আলোকে
বাঁকিয়ে প্রতিসরিত করে এবং একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সেই আলোকে
ফোকাস করে, গ্র্যাভিটেশনাল লেঙ্গিংও অনেকটা তেমনভাবেই কাজ করে।
আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে, খুব ভারী কোনো
বস্তুর দ্বারা সৃষ্ট শক্তিশালী মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এর আশপাশ দিয়ে যাওয়া
আলোকে বাঁকাতে পারে। তথাপি অন্য কোনো স্থানে ফোকাস করতে
পারে। বস্তুর ভর যত বেশি হবে এর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র তত বেশি শক্তিশালী হবে এবং সেই ক্ষেত্র তত বেশি মাত্রায় আলোকে বাঁকাতে পারবে।
অনেকটা অপটিক্যাল লেঙ্গের গঠনের মতো, এর ভেতরে যত ঘন উপাদান ব্যবহার করা হবে এটি তত বেশি আলোর প্রতিসরণ ঘটাতে পারবে।



চিত্র ১৮.২: গ্র্যাভিটেশনাল লেঙ্গিং। ছবিঃ ${
m NASA/ESA}$

গ্র্যাভিটেশনাল লেঙ্গিং ছোট থেকে বড় সব মাত্রায়ই হয়। অতি বিশাল গ্যালাক্সি ক্লাস্টার থেকে শুরু করে গ্রহের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রও আলোকে লেঙ্গের মতো করে বাঁকাতে পারে। এমনকি আমাদের নিজেদের শরীরের ভরও আমাদের কাছ দিয়ে যাওয়া আলোকে বাঁকাতে পারে। এর মা-ত্রা খুবই সামান্য। অতি সামান্য বলে আমাদের কাছে তা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় না।

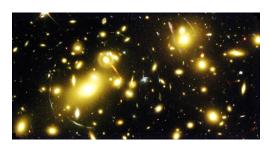
এখন দেখা যাক গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিংয়ের ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া কীরূপ হতে পারে। কসমোলজিস্টরা মূলত বড় মাত্রায় সংঘটিত লেন্সিং নিয়ে বেশি আগ্রহী। গ্যালাক্সি কিংবা গ্যালাক্সি ক্লাস্টার দ্বারা সৃষ্ট লেসিং নিয়েই তাদের কাজকারবার।

ডার্ক ম্যাটার দেখা না গেলেও তার অস্তিত্ব আছে এবং ভরও আছে। ডার্ক ম্যাটারের সম্মিলিত ভর সমগ্র মহাবিশ্বের মোট ভরের শত-করা ২১ ভাগ, যা পরিমাণের দিক থেকে অনেক বেশি, যেখানে সাধারণ বস্তুর পরিমাণ 8%। এ থেকে সহজেই বুঝা যায় যে দূরবর্তী গ্যালাক্সি থেকে আগত আলোকরশ্মি ডার্ক ম্যাটার দ্বারা সৃষ্ট মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মাঝ দিয়ে আসার সময় লেন্সের অনুরূপ বাঁকিয়ে যাবে।

মহাবিশ্বে যেখানে সাধারণ বস্তু পাওয়া যায় সেখানেই ডার্ক ম্যাটারের উপস্থিতি রয়েছে। যেমন, একটি বিশাল গ্যালাক্সি ক্লাস্টারে অনেক পরি-মাণ ডার্ক ম্যাটার থাকবে। এরা ক্লাস্টারের অভ্যন্তরে ও গ্যালাক্সিগুলোর চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করবে। দূরবর্তী গ্যালাক্সি থেকে আগত আলোকরশ্মি এই ক্লাস্টারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এর বিপুল পরিমাণ ভর দ্বারা প্রভাবিত হবে। ফলে সেই আলোর গতিপথ বিকৃত হবে যাকে আমরা বলছি লেঙ্গিং।

ভার্ক ম্যাটারের ভর সাধারণ বস্তুর থেকে প্রায় ৬ গুন বেশি হবার কারণে আলোর লেঙ্গিং বেশ ভালোভাবেই হবে। এর ফলে লেঙ্গিংয়ের প্রতিক্রিয়া একইসাথে শক্তিশালী হবে এবং কিছু ক্ষেত্রে অদ্ভুতও হবে। যেমন অনেক ক্ষেত্রে লেঙ্গিংয়ের কারণে দূরবর্তী গ্যালাক্সি থেকে আগত আলোকরশ্মি সংকুচিত বা প্রসারিত হয়ে মূল গ্যালাক্সির দৃশ্যমান চেহারাই পরিবর্তন করে দিতে পারে। এরকম একটি উদাহরণ নিচে দেয়া হলো। এটি $Abell\ 2218$ গ্যালাক্সি ক্লাস্টার, এখানকার গ্যালাক্সিগুলো মূলত

উপবৃত্তাকার বা সর্পিলাকার। কিন্তু শক্তিশালী লেঙ্গিংয়ের কারণে চেহারা এরকম হয়ে গিয়েছে।



চিত্র ১৮.৩: Abell 2218 ক্লাস্টার। ছবিঃ NASA/ESA

এ ধরনের অদ্ভুত আকার বিকৃতির কারণ হলো গ্যালাক্সির বাম পাশ থেকে আগত আলোকরশ্মি এবং ডানপাশ থেকে আগত আলোকরশ্মি দুটি ভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে আসে। দুই পাশের দুই আলোকরশ্মি ভিন্ন ভিন্ন ডার্ক ম্যাটারের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে প্রভাবিত হয়। ফলে তাদের বেঁকে যাওয়ার প্রকৃতিও হয় ভিন্নরকম। তাই মূল গ্যালাক্সির প্রকৃত চেহারাই পরিবর্তন হয়ে ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

লেঙ্গিংয়ের আরো একটি আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক দিক হলো একই গ্যালাক্সির একাধিক প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হওয়া। এমনটা হবার কারণ, দূরবর্তী গ্যালাক্সি থেকে আগত আলোকরশ্মি যা অপসৃত (diverge) হবার কথা ছিল তা লেঙ্গিংয়ের প্রভাবে অভিসারী (focus) হয়ে আমাদের কাছে ধরা পড়ে। পৃথিবীতে অবস্থানকারী কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে তখন মনে হবে, দুটি একই রকমের সোজা আলোকরশ্মি মহাকাশের দুটি ভিন্ন অংশ থেকে আসছে। লেঙ্গিংয়ের এরকম প্রভাবে অনেক সময় মহাকাশে একই গ্যালাক্সির একাধিক বিম্ব দেখতে পাওয়া যায়।

লেন্সিং অনেক সময় বিবর্ধক হিসেবেও কাজ করতে পরতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে অতি দূর গ্যালাক্সির ক্ষীণ আলো লেন্সিংয়ের কারণে বিবর্ধিত হয়ে আমাদের টেলিস্কোপে ধরা পড়ে। লেন্সিং না থাকলে হয়তো সেই গ্যালাক্সিগুলোর অস্তিত্ব খুঁজেই পাওয়া যেতো না।

দুর্বল লেন্সিং (Weak Lensing)

লেন্সিং প্রভাব যদি খুব শক্তিশালী হয় যা খুব সহজেই কোনো এস্ট্রোনমিক্যাল ইমেজে শনাক্ত করা যায় তাহলে ঐ ধরনের প্রভাবকে বলা
হয় দৃঢ় বা শক্তিশালী লেন্সিং। এই ধরনের লেন্সিংয়ের প্রভাব শনাক্ত
ও পরিমাপ করা সহজ। কিন্তু এরকম বড় মাপের লেন্সিং ইফেক্ট তৈরি
করতে সক্ষম বিশাল ভরের গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের সংখ্যা মহাকাশে খুব
একটা বেশি পরিমাণে নেই। তাই মহাকশে একই গ্যালাক্সির ধনুকের
মতো প্রসারিত ছবি অথবা একাধিক প্রতিচিত্রের মতো ঘটনা অহরহ
দেখতে পাই না। অন্য কথায় বলতে গেলে মহাকশে শক্তিশালী লেন্সিং
এর ঘটনা কিছুটা দুর্লভ।

কিন্তু তারপরও যেকোনো গ্যালাক্সি এবং আমদের দৃষ্টিপথের মাঝে ডার্ক ম্যাটারের উপস্থিতি রয়েছে। কম হোক বা বেশি হোক আছে। মাত্রা যতই সামান্য বা ক্ষীণ হোক না কেন, যত ধরনের গ্যালাক্সি দেখতে পাই তার সবগুলোই লেসিং দ্বারা প্রভাবিত। গাণিতিকভাবে বলতে গেলে প্রায় সব গ্যালাক্সির আকৃতিই লেসিংয়ের কারণে মোটামুটি শতকরা ১ ভাগ বিকৃত হয়। এই ধরনের ক্ষীণ লেসিং এর ঘটনাকে বলা হয় দুর্বল লেসিং।

দুর্বল লেন্সিংয়ের কারণে সৃষ্ট ক্ষুদ্র বিকৃতি খালি চোখের সাহায্যে ধরা যায় না। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে বিজ্ঞানীরা এই ধরনের লেন্সিং করেন। দুর্বল লেন্সিং ডার্ক ম্যাটারের উপস্থিতি এবং এদের আচরণ ও ভূমিকা অনুধাবন করতে সাহায্য করছে।

লেসিং কেন দরকারি

লেন্সিং জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মহাকশে ডার্ক ম্যাটারের উপস্থিতি, পরিমাণ, বিন্যাস ও প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দেয়। আলোর বাঁক নেয়া নির্ভর করে এর যাত্রাপথে বিদ্যমান মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের তীব্রতার উপর। পরবর্তী পৃষ্ঠার চিত্রটি খেয়াল করুন। এটি বুলেট ক্লাস্টার (Bullet Cluster) নামে পরিচিত। এই ক্লাস্টারটিকে দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ এবং এক্স-রে তরঙ্গ এই দুই মাধ্যমেই পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এটি থেকে আগত আলোর একটা বড় অংশ আসে উত্তপ্ত এক্স-রে বিকিরণকারী গ্যাস থেকে। ছবিতে দেখানো মাঝের ধোঁয়া সদৃশ অংশটুকু হলো দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গে দেখা অংশ। মূলত এই ছবিটি এক্স রে এবং দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গে দেখা অংশগুলার একটা ওভারলে বা কম্পোজিট চিত্র।



চিত্র ১৮.৪: বুলেট ক্লাস্টারের কম্পোজিট চিত্র। ছবিঃ ${
m NASA/STScI}$

ছবির মেঘের পরিধির কিছু অংশ ক্লাস্টারে ডার্ক ম্যাটারের উপস্থিতিকে নির্দেশ করছে। দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা ছবিতে লেঙ্গিং সিগন্যাল হিসেব করে এই অবস্থান শনাক্ত করা হয়েছে। ছবির এক্সরে বিকিরণকারী গ্যাস উৎস এবং পরিধির ডার্ক ম্যাটার অঞ্চলের পার্থক্য (offset) প্রকৃতপক্ষে দুটি গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের মধ্যকার সংঘটিত সংঘর্ষের পরবর্তী অবস্থাকে নির্দেশ করছে। এই সংঘর্ষের সময়, ব্যারিওনিক কণিকাগুলো (সাধারণ বস্তু) একে অপরের সাথে মহাকর্ষ ও স্থির তড়িৎ বল উভয় ক্ষেত্রের মধ্য দিয়েই মিথস্ক্রিয়া করেছে। একে অপরকে ধাক্কা

দিচ্ছে এবং ধীর গতির করছে।

কিন্তু ডার্ক ম্যাটারের কণিকাগুলো একে অপরের সাথে কেবল মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মধ্য দিয়েই মিথক্রিয়া করেছে। তাদের এই মিথক্রিয়া স্থির তড়িৎ বলের ক্ষেত্র কোনো প্রভাব বা ভূমিকা রাখেনি। তাই এই সংঘর্ষে এক্স-রে গ্যাস কণিকাগুলো ডার্ক ম্যাটারের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে এবং ছবিতে এই পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। দৃশ্যমান বস্তুর প্রায় পুরোটাই মোটামুটিভাবে ছবির কেন্দ্রে অবস্থান করছে। কিন্তু লেসিং ইফেক্ট থেকে আমরা বলতে পারি এই ক্লাস্টারের ভরের বেশিরভাগ অংশই আরো বড় অঞ্চল নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

এখন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা ডার্ক ম্যাটারের প্রভাবগুলোর সবগুলোই মহাকর্ষ সম্পর্কিত। তাই অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা ডার্ক ম্যাটার বা মহাকর্ষ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বা ধারণা এখনো সম্পূর্ণ নয়। হয়তোবা এমন হতে পারে যে ডার্ক ম্যাটার কোনো নতুন ধরনের বস্তু নয়, বরং মহাকর্ষ সম্পর্কে আমাদের বর্তমান ধারণায় কোনো ক্রটি রয়েছে, যার কারণে আমরা ডার্ক ম্যাটারকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারছি না।

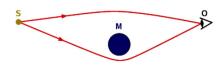
ফলাফলস্বরূপ ডার্ক ম্যাটারের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য মহাকর্ষ তত্ত্বের অনেকগুলো পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশ পেয়েছে। বুলেট ক্লাস্টারের ছবিটি ডার্ক ম্যাটারের উপস্থিতির একটি শক্ত প্রমাণ। ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্ব থাকলে আলো এবং ভরের আচরণ যেমন হতো বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেছেন, ছবির এই অফসেটটি ঠিক তাই প্রকাশ করে। ডার্ক ম্যাটারের এই অবস্থানের পক্ষে প্রমাণ থাকলেও বর্তমান মহাকর্ষ তত্ত্ব বা এর বিভিন্ন পরিবর্তিত বা পরিমার্জিত সংস্করণ দিয়েও এর উপস্থিতির ব্যাখ্যা দেয়া বেশ কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লেঙ্গিং ডার্ক এনার্জির প্রকৃতি সম্পর্কেও অনেক ধারণা দেয়। ডার্ক এনার্জির উপস্থিতি গ্যালাক্সি এবং ক্লাস্টারের সৃষ্টি, গঠন এবং সম্প্রসারণে প্রভাব ফেলে। মহাকাশে গ্র্যাভিটেশনাল লেঙ্গিংয়ের সাহায্যে নির্ণয় করা তাদের দূরত্ব এবং বণ্টন পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা প্রায় নিখুঁতভাবে ডার্ক এনার্জির পরিমাণ নির্ণয় করেছেন।

দূরবর্তী গ্যালাক্সি থেকে আসন্ধ আলো আমাদের দিকে যাত্রা শুরু করেছে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর আগে। এই আলো আমাদের সামনে উন্মোচন করেছে আদি মহাবিশ্বের স্বরূপ। বিভিন্ন দূরত্বে গ্যালাক্সির গঠন ও অবস্থানগত পার্থক্য থেকে মহাবিশ্বে ডার্ক এনার্জির পরিমাণের পরিবর্তন (হ্রাস-বৃদ্ধি বা অপরিবর্তনশীলতা) সম্পর্কে তথ্য পাওয়া সম্ভব। গ্র্যাভিটেশনাল লেঙ্গিং তাই ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জিসহ মহাবিশ্বের প্রকৃত রূপ উদ্যাটনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

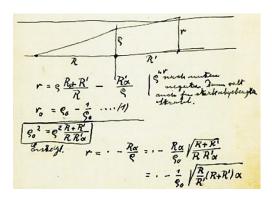
আইনস্টাইন সর্বপ্রথম তার সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে সূর্যের মহাকর্ষ ক্ষেত্রের জন্য আলোর পথ বিচ্চুতির সম্ভাব্যতার কথা উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন (১৮৮২–১৯৪৪) পরীক্ষার সাহায্যে এর সত্যতা নিরূপণ করেন (আগ্রহী পাঠকরা চাইলে বিস্তারিত জানবার জন্য ২০০৮ সালে BBC নির্মিত Einstein and Eddington টেলিভিশন চলচ্চিত্রটি দেখতে পারেন)। কিন্তু আইনস্টাইন তার সাধারণ আপেক্ষিকতা প্রস্তাবনার আগেই আলোর পথ বিচ্চুতি নিয়ে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন, যেখানে প্রথম গ্র্যাভিটেশনাল লেঙ্গিং সম্পর্কিত বিষয়াদির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।



চিত্র ১৮.৫: S থেকে আগত আলো এর যাত্রা পথে M বস্তুর মহাকর্ষ ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বক্র পথে O এর নিকট পৌঁছায়।

দূরবর্তী আলোক উৎস থেকে আগত আলোকরশ্মি তার যাত্রাপথে কোনো ভারী বস্তুর মহাকর্ষ ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হলে তখন সেই আলোক রশ্মি দুটি ভিন্ন পথে পর্যবেক্ষকের নিকট পৌঁছাতে পারে। পরবর্তী চিত্রে যেমনটা দেখানো হয়েছে- দূরবর্তী উৎস S থেকে আগত আলো এর যাত্রা পথে M বস্তুর মহাকর্ষ ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দুটি ভিন্ন পথে পর্যবেক্ষক O এর নিকট পৌঁছায়। ফলে পর্যবেক্ষক O একই বস্তু S এর দুটি ভিন্ন ছবি দেখতে পায়।

গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিংয়ের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনার কথা আইনস্টাইন প্রথম তার নোটবুকে উল্লেখ করেন ১৯১২ সালে। সে সময় তিনি বার্লিনে জ্যোতির্বিদ আরভিন ফ্রেনজ্লিক (Erwin Freundlich, ১৮৮৫–১৯৬৪) এর সাথে এই ধারণার পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে বেশ আলোচনা করেন। আইনস্টাইন তার নোটবুকে লেসিং নিয়ে কিছু প্রাথমিক ধারণা এবং ফর্মু-লা প্রকাশ করেন। তার নোটবুকের লেখার একটি ছবি নিচে দেয়া হলো।



চিত্র ১৮.৬: আইনস্টাইনের নোটবুকে তার হাতের লেখা

তবে আইনস্টাইন নিজেই এরকম লেসিং ক্রিয়া পর্যবেক্ষণের সম্ভাব্যতা নিয়ে বেশ সন্দিহান ছিলেন। কারণ লেসিং ইফেক্ট নির্ভর করে আলোক উৎস, মহাকর্ষ ক্ষেত্র তৈরিকারী বস্তুর ভরের তীব্রতা এবং এদের সাথে পর্যবেক্ষকের দূরত্বের উপর। তাই এরকম একটি ঘটনা অর্থাৎ একই বস্তুর দুটি প্রতিচ্ছবির দেখা পাবার সম্ভাবনা নিয়ে আশা করাটা ছিল বেশ কঠিন।

পরবর্তীতে গ্র্যাভিটেশনাল লেঙ্গিং সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্বের উন্মোচন হতে থাকে বিজ্ঞানী মহলে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনাগুলোতে। আইনস্টাইন নিজেও ১৫-ই ডিসেম্বর ১৯১৫ সালে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেনসিক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, তার বন্ধু হাইনরিখ জাঙগার (Heinrich Zangger, ১৮৭৪-১৯৫৭) এর নিকট এ বিষয়ের বিস্তারিত নিয়ে একটি চিঠি লিখেন। চিঠিটি পরবর্তীকালে অলিভার লজ (Oliver Lodge, ১৮৫১-১৯৪০) সম্পাদনা করে 'নেচার' সাময়িকীতে প্রকাশ করেন। এছাড়াও এডিংটন তার ১৯২০ সালে প্রকাশিত Space, Time and Gravitation গ্রন্থে এবং স্থনামধন্য জার্নাল Astronomische Nachrichten-এ গ্র্যাভিটেশনাল লেঙ্গিয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। যদিও সে সময় সব বিজ্ঞানীরাই প্রাথমিকভাবে ধারণা করেছিলেন যে ভূমিতে বসে গ্র্যাভিটেশনাল লেঙ্গিয়ের প্রভাব প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়।

পরবর্তীকালে ১৯৩৬ সালে আইনস্টাইনের আমেরিকার প্রিন্সটনে বসবাসকালীন সময়ে একজন চেক ইঞ্জিনিয়ার, রুডি ম্যান্ডল (Rudi W. Mandl) তার সাথে দেখা করেন এবং গ্র্যাভিটেশনাল লেঙ্গিং এর উপর বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি ধারণা করেন শক্তিশালী নক্ষত্রের আলোর দ্বারা সৃষ্ট লেঙ্গিং ক্রিয়া হয়তোবা পৃথিবীতে জৈববৈজ্ঞানিক বিবর্তন এবং জেনেটিক মিউটেশনের সূচনা করেছিল। কিন্তু ততদিনে আইনস্টাইন নিজেই তার লেঙ্গিং নিয়ে গবেষণা কাজকারবার বেমালুম ভুলে বসছিলেন এবং অন্যদের গবেষণা সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা ছিল না। পরে ম্যান্ডেলের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আইনস্টাইন আবারো 'সায়েন্স' সাময়িকীতে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এই গবেষণাপত্রে আইনস্টাইন গ্র্যাভিটেশনাল লেঙ্গিংয়ের অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু ফর্মুলা প্রকাশ করেন।

পেপারটি প্রকাশের পর আরো অনেক জ্যোতির্বিদ এর উপর আরও বিস্তারিতভাবে কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেন। ক্যালটেক

LENS-LIKE ACTION OF A STAR BY THE DEVIATION OF LIGHT IN THE GRAVITATIONAL FIELD

Some time ago, R. W. Mandl paid me a visit and asked me to publish the results of a little calculation, which I had made at his request. This note complies with his wish.

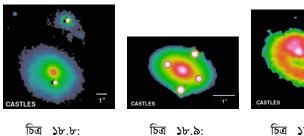
The light coming from a star A traverses the gravitational field of another star B, whose radius is R_o . Let there be an observer at a distance D from B and at a distance x, small compared with D, from the extended central line \overline{AB} . According to the general

চিত্র ১৮.৭: সায়েন্স সাময়িকীতে প্রকাশিত আইনস্টাইনের গবেষণা প্রবন্ধ

বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ Fritz Zwicky প্রস্তাব করেন, নক্ষত্রের তুলনায় দূরবর্তী নেবুলা এবং গ্যালাক্সির লেসিং ইফেক্ট পর্যবেক্ষণ করা বেশি সহজ হবে। কারণ বড় গ্যালাক্সির আকার, ভর, দূরত্ব সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো আরো বেশি করে লেসিং ক্রিয়া ঘটাবে, যেটা কেবল নক্ষত্রের বেলায় ঘটার সম্ভাবনা অনেক ক্ষীণ।

গত শতকের ষাটের দশকে কোয়াসারের আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের নতুন করে গ্র্যাভিটেশনাল লেঙ্গিংয়ের পর্যবেক্ষণমূলক পরীক্ষায় আগ্রহী করে তুলে। ততদিনে লেঙ্গিং সংক্রান্ত গবেষণা এবং হিসাব নিকাশগুলো আরো অনেক জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ তাত্ত্বিকভাবে বিন্দু উৎস থেকে নির্গত আলোকরশ্মি সুষম সর্পিলাকার লেঙ্গ ভরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হলে এর গণনা অনেক সহজ হয়়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আলোক উৎস এবং লেঙ্গ ভর কোনোটাই সুষম নয় বরং আকারে বিশাল এবং আকৃতিতে অনিয়মিত। এবং একটি বস্তুর একাধিক বিছিন্ন আকৃতির প্রতিচিত্র সৃষ্টিও অসম্ভব নয়়। আইনস্টাইনের মূল তত্ত্ব অনুসারে এসব ঘটনার ব্যাখ্যা এবং নিরীক্ষা বেশ কঠিন ব্যাপার। তাই এধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সাধারণ আপেক্ষিকতার আরো কিছু জটিল মডেল তৈরি করা হয়়।

সর্বপ্রথম গ্র্যাভিটেশনাল লেন্স খুঁজে বের করেন Dennis Walsh, Robert F. Carswell এবং Ray J. Weymann ১৯৭৯ সালে। রেডিও তরঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে তারা Quasar Q0957+561 এর দুটি ভিন্ন প্রতিচিত্র খুঁজে বের করেন যা লেঙ্গিয়ের একটি উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। চিত্র ১৮.৮-এ এর একটি false color image দেয়া হলো।



Quasar Q0957+561 আইনস্টাইন ক্রস

চিত্ৰ ১৮.১০: আইনস্টাইন রিং

পাশে (চিত্র ১৮.৯) কোয়াসার QSO 2237 + 0305 এর একটি ছবি দেয়া হলো। এই লেন্সিং সিস্টেমটি আইনস্টাইন ক্রস নামে পরিচিত। আবিষ্কার হয় ১৯৮৫ সালে। এরকম আরো একটি উদাহরণ হলো MG1131+0456, যা আইনস্টাইন রিং (চিত্র ১৮.১০) নামে পরিচিত। আবিষ্কার হয় ১৯৮৮ সালে।

২০০৫ সাল পর্যন্ত অ্যারিজোনা স্পেস অবজারভেটোরি ৬৪ টি নিশ্চিত লেঙ্গিং সিস্টেম আবিষ্কার করেছে যেগুলার প্রতিটারই একাধিক প্রতিচিত্র রয়েছে। পাশাপাশি আরো ১৮ টি সম্ভাব্য লেন্সিং সিস্টেম এর খোঁজ পেয়েছে।

বর্তমানকালের জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা গবেষণায় লেঙ্গিং একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ১৯৮৩ সালে ফ্রান্সের Liège-এ প্রথম গ্র্যাভিটেশনাল লেঙ্গিং নিয়ে সম্মেলন অনৃষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবছরই অনুরূপ বৈজ্ঞানিক সম্মেলন হচ্ছে। লেঙ্গিং এখন আর কোনো তত্ত্বীয় বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই বরং এটি ব্যবহৃত হচ্ছে মহাবিশ্বতত্ত্ব এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের বাস্তব ও প্রায়োগিক গবেষণায়। এটি এখন মহাকাশ পর্যবেক্ষণ, কৃষ্ণবস্তু, বিগব্যাং মডেল ইত্যাদি গবেষণার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

তথ্যসূত্র

- ♦ Gravitational Lens Wikipedia.
- ♦ Charles Q. Choi. Space-Time Distortions Uncover Hidden Galaxies (2010) − Live Science.
- ♦ Joanne D Cohn. Gravitational Lensing (2010) UC Berkeley.
- ♦ Podcast: Cosmic Gravitational Lensing Reveals Ancient Galaxies (2010) − Scientific American.
- ♦ What Is Gravitational Lensing? (2014) SciShow Space, Youtube
- ♦ Gravitational Lensing (2015) Fermilab, Youtube
- ৡ অপূর্ব এই মহাবিশ্ব, এ এম হারুন অর রশীদ ও ফারসীম
 মায়ান মোহাম্মদী, প্রথমা প্রকাশন।



§ ১৯



মেঘনাদ সাহা: একজন বিজ্ঞানী ও বিপ্লবী

ইমতিয়াজ আহমেদ

টিশ শাসনামলে মেঘনাদ সাহা ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বে একজন খ্যাতিমান পদার্থবিদ হিসেবে সমাদৃত হয়েছিলেন। ১৯২০ এর দশকে তিনি নক্ষত্রের বর্ণালী বিশ্লেষনে তাপীয় আয়নীকরণ তত্ত্বে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে আমৃত্যু তিনি বিজ্ঞানের জন্য এবং বিজ্ঞানমনষ্কতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিরন্তর কাজ করে গেছেন। তাঁর জীবনী আমাদের উৎসাহীত করবে নানা ভাবে। প্রথমতঃ তিনি বাংলাদেশের এক অজপাঁড়া-গাঁ এর দরিদ্র ও নিন্মবর্ণের হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহন করেও নানা প্রতিকূলতার বাধা পেরিয়ে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে পোঁছেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি কেবল একজন বিন্ম পড়ুয়া লোকই ছিলেন না, তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবে জড়িয়ে ছিলেন যে আন্দলনের ফসল হিসেবে ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। আজ এই বিপ্লবী-বিজ্ঞানীর কঠোর জীবন-সংগ্রাম ও অবদানের গল্পই করব।

মেঘনাদ সাহার জন্ম ১৮৯৩ সালের ঢাকা থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে শ্যাওড়াতলী গ্রামে। তিনি তাঁর পিতা জগন্নাথ সাহার আট সন্তানের মধ্যে পঞ্চম ছিলেন। একজন সাধারণ মুদি দোকানী পিতার পক্ষে এতবড় সংসার চালানো দুঃষ্কর হয়ে পড়েছিলো। তাই তাঁর পিতা চেয়েছিলেন তিনি এবং তাঁর বড়ভাই দোকানের বিক্রি-বাট্টার কাজে তাঁকে সাহায্য করবেন। তবে মেঘনাদের মা এবং চাচা এতে বাধা দিয়ে তাঁর মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করার ব্যবস্থা করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষায় তিনি খুবই ভালো ফলাফল করেন এবং তাঁর সুযোগ খুলে যায়। ১৯০৫ সালে তিনি ঢাকায় এসে কলেজে ভর্তির প্রস্তুতি হিসেবে পুর্ণবৃত্তি নিয়ে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। এই বছরটি ভারতের বিশেষ করে বাংলা প্রদেশের ইতিহাসে ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ ছিলো। এই বছরেই লর্ড কার্জন বাংলাকে মুসলিম ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুযায়ী দুই ভাগে বিভক্ত করে দেন, যা বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত হয়েছিলো। এই ঘটনায় সারা বাংলা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, বিশেষ করে হিন্দু সমাজ বঙ্গভঙ্গ মেনে নিতে পারেন নি। পূর্ববঙ্গ ও আসাম অংশের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর জোসেফ ব্যাম্পফাইল্ড ফুলার ঢাকা ভ্রমনে আসলে ঢাকার নাগরিকগণ প্রতিবাদকর্মসূচীর উদ্যোগ নেন। মেঘনাদ সাহা ও অন্য আরো অনেক ছাত্র এতে অংশ নিয়েছিলেন। এই ঘটনায় মেঘনাদের বৃত্তি বাতিল করা হয় এবং তাঁকে স্কুল থেকে বহি-স্কার করা হয়। এসময় তাঁর ভাই তাঁকে সাহায্য করায় তিনি রক্ষা পান।



চিত্র ১৯.১: তৎকালীন ঢাকা কলেজ

১৯১১ সালে মেঘনাদ ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হন। তিনি পদার্থ ও গণিতে সর্বোচ্চ নম্বর লাভ করেন, তবে সার্বিকভাবে তৃতীয়স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯১৩ সাল নাগাদ গণিতে বিএসসি সম্পন্ন করেন। এ সময় তিনি কলেজের নিজস্ব হোস্টেল ইডেন হিন্দু হোস্টেলে বাস করতেন। এখানে নিজের নিন্ম বর্ণের পরিচয়ের জন্য তিনি প্রবল বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন। সেই সময় শিক্ষা-দীক্ষা মূলতঃ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দখলেই ছিলো। তাই হোস্টেলে শুদ্র শ্রেনীর কারো উপস্থিতি অনেকের জন্যই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো এবং উচ্চবর্ণের ছাত্রদের অনেকে তাঁর সাথে একই ডাইনিং হলে খাবার খেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো। কিছু কিছু ব্রাহ্মন ছাত্র তাঁকে এমনকি বিদ্যার দেবী স্বরস্বতীর প্রতি শ্রধ্যার্ঘ অর্পন করতেও বাধা দিয়েছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে সাহার সহপাঠী ছিলেন আরেকজন বরেণ্য পদার্থবিদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এই সময় তাঁরা শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন স্থনামধন্য রসায়নবিদ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং পদার্থবিদ ও উদ্ভিদ-শরীরতত্ত্ববিদ জগদীশ চন্দ্র বসুর মত ব্যক্তিত্বকে। সেই সাথে ছিলেন খ্যাতিমান গণি-তবিদ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক। এই বরেণ্য শিক্ষাগুরুদের সংস্পর্শে এসে বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

তিনি বিজ্ঞানকে ভারতের স্বাধীনতা এবং অগ্রসরতার পথে কাজে লাগাতে উব্লুদ্ধ হলেন।



চিত্র ১৯.২: সামনের সারিতে মাঝখানে বসে আছেন জগদীশ চন্দ্র বসু, তাঁর ডান পাশে আছেন মেঘনাদ সাহা।

গ্র্যাজুয়েট ছাত্র থেকে পদার্থবিদ হওয়ার পথে তাঁর অবিশারনীয় উন্নতি ঘটে। এর মধ্যে কিছু দৈব ঘটনা যেমন: বিভাগ বদলী এবং একটি সেমিনারে শিক্ষকতা তাঁকে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের হালনাগাদ গবেষনাগুলোর সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। সেই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিলো তাই কলকাতায় বিজ্ঞানের নতুন হালনাগাদকৃত তথ্য সমৃদ্ধ বইগুলো সহজপ্রাপ্য ছিলো না। তবে সৌভাগ্যক্রমে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একজন অস্ট্রীয় বিজ্ঞানীর সান্নিধ্যে তিনি আসতে পেরেছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই তিনি ম্যাক্স প্ল্যাংক রচিত Treatise on Thermodynamics এবং ওয়ালথার নার্নস্ট রচিত The New Heat Theorem: Its Foundation in Theory and Experiment এর ইংরেজি অনুবাদগুলো পেয়েছিলেন। এছাড়া তিনি প্রফুল্ল চন্দ্র রচিত ম History of Hindu Chemistry from the Earliest Times to the Middle of the Sixteenth Century A. D. বইটি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর বাইরেও নীলস বোর এবং আরনন্ড সমারফেল্ডের কোয়ান্টাম তত্ত্ব সংক্রান্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি অবগত হয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকার সময় সাহা অস্ট্রিয়া ফেরত একজন রসায়নবিদের কাছ থেকে জার্মান শিখেছিলেন। বাংলামুলুকে বসে জার্মান ভাষা প্রয়োগ করা দুঃষ্কর ছিলো, কিন্তু তিনি এর পেছনে কঠোর শ্রম দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর শ্রম খুব ভালোভাবে কাজে লেগে গেল। ১৯১৯ সালে যখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন তখন সত্যেন্দ্রনাথ বোসকে সাথে নিয়ে আলবার্ট আইনস্টাইন এবং হারম্যান মিনকোন্ধির লেখা আপেন্ধিকতার গবেষনাপত্রটি প্রথমবারের মতো জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে ফেললেন। সারা বিশ্ব সেই প্রথমবার আপেন্ধিকতার গবেষনাপত্রটি ইংরেজিতে পড়ার সুযোগ পেল। এটি পড়ে ব্রিটিশ জোতির্বিদ আর্থার এডিংটন পরীক্ষামূলকভাবে আপেন্ধিকতার সত্যতা নিরূপন করেন এবং রাতারাতি আইনস্টাইন একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিতে পরিণত হন।



চিত্র ১৯.৩: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত জার্মান হতে ইংরেজিতে অনুদিত আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা বিষয়ক গবেষনাপত্রের প্রচ্ছদ

একই বছর মেঘনাদ সাহা চিরায়ত বিভিন্ন জোতিপদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়ের সমস্যা যেমন: সৌর উদগীরন, করোনা, এবং বিশেষ করে ধুমকেতুর লেজ সর্বদা সুর্যের বিপরীতে অবস্থান করার ঘটনা ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা শুরু করেন।আলোক তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এধরনের বিভিন্ন বিষয়ে নানাবিধ ক্রটি দেখা যাচ্ছিলো। তিনি জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের আলোর তীব্রতা ও চাপসংক্রান্ত ফলাফলের বিষয়ে

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

ওয়াকীবহাল ছিলেন। কিন্তু সেই সাথে তিনি দেখতে পেলেন ম্যাক্সওয়েলের ফলাফল কেবল সেসব বস্তুর জন্য প্রযোজ্য হয় যেগুলোর প্রতিবন্ধক বস্তুটির মাত্রা আরোপিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশি হয়। যেহেতু পরমানুর ব্যাস আলোক তরঙ্গের চেয়ে ক্ষুদ্র তাই এরা কোনো বিকিরণ চাপ অনুভব করে না এবং এই কারণে এই ফলাফলের মাধ্যমে ধুম-কেতুর লেজের সূর্যের বিপরীত দিকমুখীতার কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।



চিত্র ১৯.৪: মেঘনাদ সাহা, ১৯২১ সালে বার্লিনে তোলা

মেঘনাদ সাহা শক্তি এবং ভরবেগের অবতারণা করে ধুমকেতুর এই আচরণ ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, আলোর কোয়ান্টা পরমাণুতে চাপ প্রয়োগ করবে যদি এটি বিকিরণটিকে শোষন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন হাইড্রোজেন আলফা লাইনের আলোর একটি পালস শোষন করলে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু সেকেন্ডে ৬০ সেমি গতি লাভ করতে পারে।

সেই সাথে ১৯১৯ সালে সাহা "On Selective Radiation Pressure and Its Application" নামে Americal Astrophysical Journal এ একটি গবেষনাপত্র প্রকাশ করেন সেখানে তাঁর বিখ্যাত "সাহা সমীকরণ" প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের বছর তাঁর তাপীয় আয়নীকরণ তত্ত্ব সুর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রের আভ্যন্তরীন ক্রিয়া, রাসায়নিক গঠন, মৌল ঘনমাত্রা এবং পৃষ্ঠীয় মধ্যাকর্ষন সম্বন্ধে নতুন দিক নির্দেশনা দেয়। এই সময়ে

তিনি আলোর কোয়ান্টাম তত্ব এবং নীলস বোরের পারমাণবিক তত্ত্বের মাধ্যমে দেখান যে নাক্ষত্রিক পরমাণুসমূহের বিকর্ষন বল অনুভব করার জন্য বিকিরণ চাপ দায়ী। তাঁর তত্ত্ব থেকে অনুমান করা যায়, মৌলের কিছু বর্ণালী রেখা কেবল মাত্র নক্ষত্রের নিন্ম তাপমাত্রা এলাকাতেই পাওয়া যেতে পারে। তিনি একই সাথে তাঁর বিখ্যাত সমীকরণ:

$$\frac{N_{i+1}}{N_i} = \frac{2Z_{i+1}}{n_e Z_i} \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2}\right)^{3/2} e^{-\chi_i/kT}$$

প্রতিপাদন করেন। এটি জোতিঃপদার্থবিদ্যার বর্ণালীর সমীকরণ যা থেকে কোনো মৌলের আয়নীকরণ মাত্রা গননা করা যায়।

সাহা কয়েকবছরের মধ্যে আলোর পালস এবং শক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে কম্পটন প্রভাব অনুমান করেন। ইউরোপের অনেক পদার্থবিদ কম্পটন প্রভাব সম্বন্ধে জানার আগে আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিষয়ে সংশয়গ্রস্থ ছিলেন, তাঁর এই আবিষ্কার পদার্থ বিজ্ঞানে তাই যুগান্তকারী হিসেবেই দেখা হয়। সাহা বিভিন্ন জোতির্পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত ঘটনা যেমন: ধুমকেতুর লেজের আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য কোয়ান্টাম তত্ত্ব ব্যাবহার করেন। জোতির্পদার্থবিদ্যায় আয়নীকরণ তত্ত্ব সংক্রান্ত তাঁর কাজের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়েছিলো কেননা এটি জোতির্বর্ণালী সংক্রান্ত গণনার ক্ষেত্রে গুনগত তৎপর্যের উর্দ্ধে উঠে যথাযথ পরিমাণগত গণনায় ব্যাবহার উপযোগী হয় এবং তার ফলে নক্ষত্রসমূহকে যথাযথভাবে শ্রেনীবিন্যাস করা সম্ভব হয়। এই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২৭ সালে মেঘনাদ সাহা লন্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

বিপ্লবী আন্দোলন

প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় মেঘনাদ সাহা বিপ্লবী স্বদেশী আন্দোল-নকারী নেতৃত্ববৃন্দের সংস্পর্শে আসেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এবং শৈলেন ঘোষ। অবশ্য বিপ্লবীদের গুঢ় আন্দোলনপ্রার কারণে ইতিহাসবিদগণের পক্ষে মেঘনাদ সাহার বিপ্লবী আন্দোলনের বিস্তারিত জানা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সেই সময় বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে তৎকালীন আইরিশ রিভোলিউশনারী সিন ফেইন পার্টির স্বাধীনতা আন্দোলন অনুপ্রেরনা জুগিয়েছিলো। জার্মানীর সহায়তায় আইরিশ অভ্যুঞ্খানকারীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বেশ কিছু গুপ্ত সংগঠন তৈরি করেছিলো।

সিন ফেইন বাঙ্গালিদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিলো কারণ শুক্রপক্ষ ছিলো একই – ব্রিটিশ, যারা এই দুটি জাতির মধ্যেই দীর্ঘদিন ধরে উপনিবেশ কায়েম করে রেখেছিলো। আইরিশ ন্যাশনালিষ্ট পার্টির আন্দোলন নানা দিক থেকেই উপমাহাদেশীয় গান্ধীবাদী আন্দোলনের সাথে তুলনীয় ছিলো। মেঘনাদ সাহা এই ধরনেরই সংগঠন অনুশীলন সমিতি এবং যুগান্তরের সাথে জড়িত ছিলেন।

বিপ্লবী গোষ্ঠিতে যোগ দিয়ে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (বাঘা যতীন নামে অধিক পরিচিত) এবং পুলিন দাসের মতো নেতার সংস্পর্শে এসে তরুন মেঘনাদ সাহা সশস্ত্র প্রতিরোধে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এবং এর ফলে ব্রিটিশ নানাবিধ চাপে তাঁর জীবন ওষ্ঠ্যাগত হয়ে যায়। একটি উপনিবেশিক শাসনের মধ্যে একজন পদার্থবিদের এধরনের বিপ্লবের সাথে জড়িয়ে যাওয়া খুবই বিরল ঘটনা।

বাংগালীদের সংগঠন অনুশীলন সমিতির সাথে ১৯১৫ এর দিকে পাজাবের বিপ্লবী সংগঠন গদর পার্টির বেশ ঘনিষ্ট সম্পর্ক তৈরি হয়। তবে এই দলটির কর্মকান্ড পরিচালিত হত কানাডা ও সানফ্রান্সিসকো প্রবাসী বিভিন্ন বিপ্লবী নেতার মাধ্যমে। বার্লিনে অবস্থিত গদর বাহিনীর কিছু সদস্য বাঘা যতীনকে অবহিত করেন যে জার্মানীর কাইজার উইলহেম ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং জার্মানী এই বিপ্লবীদের অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করতে আগ্রহী। এই কর্মকান্ডের তদার-কিতে ইন্ডিয়ান রেভোলিউশন কমিটি নামে বার্লিনে একটি সংগঠন তৈরি

হয়। কাইজারের মারফত বাঘা যতীন জানতে পারেন হেনরী নামের অস্ত্রবাহী একটি জাহাজ সিঙ্গাপুর থেকে ফিলিপাইন হয়ে সুন্দরবনে ভীড়বে।

মেঘনাদ সাহা এবং যাদুগোপাল মুখার্জীকে এই জাহাজ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে ১৯১৫ এর ২ জুন, হেনরী যখন সাংহাইয়ের বন্দরে ভেড়ে, তখন ব্রিটিশ এবং ফরাসী বাহিনী জাহাজটিতে তল্লাশি চালিয়ে সব অস্ত্র উদ্ধার করে নিয়ে যায়। জাহাজটি সুন্দরবনে না ভীড়ে জার্মানীতে ফিরে যায় এবং মেঘনাদ সাহা খালি হাতে ফিরে আসেন।

১৯১৯ সালটি শুধু মেঘনাদ সাহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্যই গুরুত্বপূর্ন নয়, বরং এ বছরটি ভারতীয় মুক্তিকামী আন্দোলনের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার ঠিক পর-পরই এইবছর ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বিতর্কিত রাওলাট আইন জারি করে। এই আইনের আওয়ায় যে কোন ব্যক্তিকে সন্দেহের বশে এবং কোনো রকম আপিল করার সুযোগ প্রদান ছাড়াই আটক করে রাখা যাবে এবং তাদের আইনি সুবিধাবঞ্চিত করা যাবে। এই আইনের বিরুদ্ধে সারা ভারতে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে আন্দোলনের তীব্রতা বাংলা এবং পাজ্জাবেই সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। এই আইনের প্রেক্ষিতেই মহাত্মা গান্ধী সত্যগ্রহ চালু করেন। ব্রিটিশ সরকার সেই সময় যেখানে সম্ভব হয়েছে কঠোরভাবে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করেছে।

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসারের জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি নৃসংস ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ কর্নেল রেজিনাল্ড ডায়ের একটি নিরস্ত্র প্রতিবাদের উপর নির্বিচারে গুলি করার আদেশ দিলে প্রচুর প্রাণহানি ঘটে। মেঘনাদ সাহা এর প্রতিবাদে লেখালেখি করেন। বিদ্যমান নৃশংসতায় মনোবল হারিয়ে তিনি পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করেন। নিজের জ্ঞান দিয়ে তিনি ভারতের উন্নয়নকল্পে মনোনিবেশ করেন।

অন্য অনেক বিদুষকের বিপরীতে মেঘনাদ সাথে ভারতবর্ষের নানাবিধ

সমস্যা যেমন: নদী ব্যবস্থাপনা, রেলওয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ভারতের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এসব নিয়ে লেখালেখি করেন এবং ভারতজুড়ে এসব বিষয়ে সাংস্কৃতিক সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তাঁরা সারা জীবনের অন্যতম প্রেরণা ছিলো জাতির জন্য বিজ্ঞান সচেতনতা এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমেই জাতির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা। ১৯৩১ সালে তিনি Academy of Sciences of the United Provinces of Agra and Oudh প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩২ সালে তিনি এর প্রেসিডেন্ট নিয়োজিত হন।

মানবীয়করণে বিজ্ঞানের ভুমিকা মেঘনাদ সাহার আরেকটি অনুপ্রোরনা ছিলো। একাডেমির প্রেসিডেন্ট পদ নেওয়ার দুই বছেরের মাথায় তিনি Indian Science News Association প্রতিষ্ঠা করেন। এই এসোসি-য়েশনের সহায়তায় তিনি Science and Culture নামে একটি জার্নাল প্রকাশ করেন। ১৯৫৬ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি একই জার্নালের সম্পাদক হিসেবে কাজ করে গেছেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ জার্নাল Nature এর আদলে গঠিত এই জার্নালটিতে বিজ্ঞানের সামাজিক অবদানসমূহ তুলে ধরা হতো এবং অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর করে সাধারণ মানুষের মাঝে বিজ্ঞানের ধারনা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালানো হতো। সাহা আশা করেছিলেন এই জার্নালের লেখাগুলোতে সাধারণভাষায় গবেষনাপত্র প্রকাশ করা হবে যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে এবং বিজ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের সমস্যাগুলো এই জার্নালের গবেষনাপত্রে উঠে আসবে। এর মাধ্যমে তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় সমাজে সাংস্কৃতিক এবং মানবীয় চর্চা বৃদ্ধি পাবে, জাত-পাতের সমস্যা ধুর হবে, মানুষের মধ্যে সমতা তৈরি হবে এবং সরকারের বিভিন্ন নীতির গঠনমূলক সমালোচনা উঠে আসবে।

Scince and Culture জার্নালটির প্রথম ভলিওমে মেঘনাদসাহার নিজেরই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষনা প্রকাশ পায়। এর মধ্যে রয়েছে "Ultimate donstituents of matters" যাতে সমসাময়িক নিউক্লীয় পদার্থ বিজ্ঞান, বোরের এটমিক মডেল এবং তে-জক্ত্রিয়তা বিষয়ক অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। "The march towards abosolute zero" তে জার্মানীতে নার্নস্টয়ের গবেষনাগারে থাকাকালীন তাঁর পোস্টডক্টরাল কাজকর্ম তুলে ধরেন। "The existence of free magnetic poles" এ ব্রিটিশ পদার্থবিদ পল ডিরাকের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার ধারনা এবং একক চৌম্বক মেরুর অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এবং "Spectra of comets" গবেষনাপত্রে সাহার প্রাথমিক গবেষক জীবনের জোতিঃপদার্থবিদ্যার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় যাতে তাঁর ধুমকেতুর বর্ণালী বিষয়ক গবেষনা উঠে আসে।

এই জর্নালের সম্পাদকীয়তে তিনি খোলা মনে ভারতীয় সরকারের বিজ্ঞান বিষয়ক নীতিমালার সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে তিন ভারতের স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর বিভিন্ন উদ্যোগের সমালোচনা করেন। তিনি মনে করতেন নেহেরু বিজ্ঞান ও শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য খুবই তাড়াহুড়া করছেন এবং এটি করতে গিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতের উপযোগী প্রযুক্তির প্রতি জোর দিচ্ছেন না। নেহেরু একজন স্বপ্পদ্রস্থী কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক দক্ষতার অভাবের কথা সাহা তাঁর সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া সাহা একেবারে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অংশ থেকে থেকে উঠে আসা মানুষ তাই তাঁর পক্ষে সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা প্রয়োজনীয়তা এসব উপলব্ধি করা সহজ, কিন্তু অভিজাত পারিবারিক ইতিহাসের নেহেরুর পক্ষে সাধারন্যের প্রয়োজনীয় সবকিছু উপলব্ধি করা সহজ নয়। এসবের ফলের সাহার সাথে নেহেরুর তিক্ততাও তৈরি হয়।

১৯৪১ সালে দিতীয় বিশ্বযুদ্ধর সম্ভাবনা জোরদার হতে শুরু করলে মেঘনাদ সাহা একটি নিউক্লিয় গবেষনা প্রতিষ্ঠান চালু করার উদ্যোগ নেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রভাবমুক্ত রাখার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। তাঁর ছাত্র বাসন্তী দুলাল নাগ চৌধুরি ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কেলিতে আর্নেষ্ট লরেন্সের সাথে কাজ করেন। ভারতে ফিরে আসলে তিনি তাঁকে সাথে নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সাইক্লোট্রোন নির্মান করেন।

১৯৪৯ সালে সাহা কলকাতায় নিউক্লিয় পদার্থবিজ্ঞান ইনস্টিটিউ প্রতিষ্ঠা

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র ১৯.৫: প্রবীন মেঘনাদ সাহা

করেন। এটি বিশিষ্ট পদার্থবিদ এবং কুরি দম্পতির কন্যা আইরিন জুলিও-কুরি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন।

ভারতীয় অন্যান্য স্থনামধন্য গবেষকের তুলনায় সাহার জীবনে ছিলো অনেক নাটকীয় মোড়। তিনি হতদরিদ্র, অশিক্ষিত এবং নিম্মবর্ণের পরিবার থেকে দুঃখ-কষ্টের কমাঘাতে জর্জরিত হতে হতে বড় হয়েছেন। তারপরেও তিনি নিজেকে ভারতীয় ভদ্রসমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন যথেষ্ট প্রভাবের সাথে। তিনি শুধু একাডেমিক দিক থেকেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন নি বরং একজন সাংগঠক হিসেবে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সারা ভারতের মানুষের মাঝে।

মেঘনাদ সাহার বিপ্লবী চরিত্রটি বাঙ্গালি নেতৃত্বের দ্বারা প্রভাবিত ছিলো, যারা গান্ধীবাদী আন্দোলনের বিপরীতে সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো।সাহার বেড়ে ওঠার সময়কালীন রাজনৈতিক ও বৃদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ তাঁর ক্যারিয়ারে প্রবলভাবে ছাপ রেখে গিয়েছিলো। তাঁর চারিত্রিক বৈচিত্র্য তাঁর জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য থেকেই উঠে এসেছে। বাঙ্গালী ও ভারতীয় তরুনসমাজের কাছে তিনিই হতে পারেন সবচেয়ে কাছের উদাহরণ এবং সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।

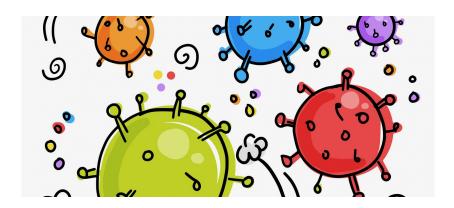
তথ্যসূত্র

- Soma Banerjee. Meghnad Saha: Physicist and nationalist. Physics Today 69, 8, 38 (2016). DOI: 10.1063/PT.3.3267.
- ৡ ফিচার ছবিসূত্র: Meghnad Saha The Best of Indian Science.



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

§ २0

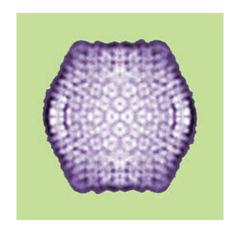


ভাইরাসও কিন্তু ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে

এন মাহমুদ

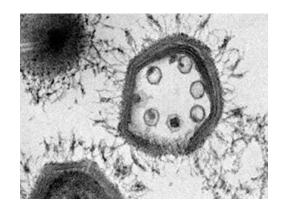
ইরাস শব্দটা শুনলেই আমাদের রোগের কথা মনে পড়ে। ভাইরাস আমাদের রোগ সৃষ্টি করে। ভাইরাস আমাদের কোষকে আক্রান্ত করে আবার কোন কোন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকেও আক্রান্ত করে। তবে আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হল ভাইরাসও ভাইরাসকে আক্রান্ত করে; অর্থাৎ ভাইরাসও ভাইরাসের রোগ সৃষ্টির কারণ হতে পারে।

এই ভাইরাসের ভাইরাসকে আবিষ্কার করেন Bernard La Scola এবং Christelle Desnues. তারা এর নামকরণ করেন সেই চির-চেনা স্যাটেলাইট স্পুটনিক এর নামে। ব্যাকটেরিওফেজের নামের সাথে মিল রেখে এদের অনন্যতার কারণে তাদের অন্য গোত্র (Family) 'ভাইরোফেজ' এর অন্তর্ভুক্ত করেন।



এই স্পুটনিক এর গল্প আসলে শুরু হয় ১৯৯২ সালে ইংল্যান্ডে। একদল গবেষক অ্যামিবা নিয়ে গবেষণার সময় একটি আণুবীক্ষণিক দৈত্য আবিষ্কার করেন, এটা এতটাই বড় যে একে ব্যাকটেরিয়া বললে ভুল হবে না। পরবর্তীতে ২০০৩ সালে La Scola দেখন যে আসলে এটি একটি ভাইরাস যা mimivirus কেও আকারে হারিয়ে দেয়। পরবর্তীতে আবারও অনেক খোঁজার পর অ্যামিবাতে পাওয়া গেল এবং এর আকার দেখে বিজ্ঞানীরা এই দৈত্যকে নামকরণ করেন mamavirus নামে।

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



এবার এই mamavirus নিয়ে গবেষণা শুরু হল। আর দেখা গেল এই রেকর্ড ভঙ্গকারীরা অ্যামিবাকে আক্রান্ত করে এবং সেখানেই নিজেদের প্রতিরূপ তৈরি করে। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে এটি দেখতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেন এর মধ্যে রয়েছে আরও ছোট ছোট অংশ যাদের আকার ৫০ ন্যানোমিটার। এবং এরা mamavirus এ নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখে। আর এগুলোই স্পুটনিক।

La Scola এবং Desnues দেখেন যে স্পুটনিক নিজে নিজে অ্যামিবার দেহে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। এরা আক্রান্ত করে mamavirus কে এবং একে host হিসেবে গ্রহণ করে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার কারণে অ্যামিবাকে আক্রমণ করারা mamavairus এর যে ক্ষমতা তা ৭০% পর্যন্ত কমে যায়।

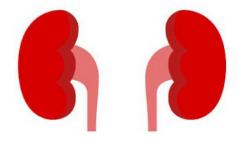
এর মাধ্যমেই বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হন যে ভাইরাসও ভাইরাসকে আক্রান্ত করতে পারে; ভাইরাসও ভাইরাসের দেহে রোগ সৃষ্টির কারণ হতে পারে। ভাইরাস জড় না জীব এ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তা অনে-কটাই প্রশমিত হবে এই আবিষ্কারের মাধ্যমে বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা।

তথ্যসূত্র

- ♦ La Scola B, Desnues C, et. al. The virophage as a unique parasite of the giant mimivirus. Nature. 2008 Sep 4; 455(7209):100-4. DOI: 10.1038/nature07218.
- 🗞 ফিচার ছবিসূত্র: McGill University.



§ 23



আমার অভিজ্ঞতা: কিডনি রোগের জন্য দায়ী অনিয়মসমূহ এবং আপনার করণীয়

এহতেশামুল কবীর লোটন

মার কিডনি রোগ ধরা পড়ে ২০১৫ সালে। এর আগে আমি বুঝতেই পারিনি এত বড় একটি রোগ আমার শরীরে বাসা করেছে। কিডনি বিকল হওয়ার জন্য আমাদের কিছু অনিয়ম দায়ী। তাই এই অনিয়মগুলো জানা জুরুরী।

কিডনি নষ্টের ১০টি অনিয়ম:

- ১ প্রস্রাব আটকে রাখা
- ২. পর্যাপ্ত পানি না খাওয়া
- ৩ অতিরিক্ত লবণ খাওয়া
- ৪. যেকোনো সংক্রমণের দ্রুত চিকিৎসা না করা
- ৫. মাংস বেশি খাওয়া
- ৬. প্রয়োজনের তুলনায় কম খাওয়া
- ৭. অপরিমিত ব্যথার ওষুধ সেবন
- ৮. ওষুধ সেবনে অনিয়ম
- ৯. অতিরিক্ত মদ খাওয়া
- ১০. পর্যাপ্ত বিশ্রাম না নেওয়া

এই অনিয়মগুলো না করার মাধ্যমে অধিকাংশ কিডনি রোগ প্রতিরোধ করা যায়। আমি আমার জীবন থেকে দেখাবো উপরের কোন কোন অনিয়মটি আমার মধ্যে ছিল। অনিয়মগুলোর সাথে সাথে প্রকৃত নিয়ম কি সেটা নিয়েও আলোচনা করব।

অনিয়ম ১। প্রস্রাব আটকে রাখা

এই অনিয়মটি আমি করতাম না। তবে দূরপাল্লার ভ্রমণের ক্ষেত্রে, কদাচিৎ বাধ্য হতে হতো।

নিয়ম:

যারা কর্মব্যস্ত জীবন পার করেন, বাইরে থাকা অবস্থায় টয়লেটের ব্যবস্থাপনা না থাকায় আমাদের ভুগতে হয়। সীমিত পাবলিক টয়লেট থাকলেও, নোংরা পরিবেশের কারণে আমরা ব্যবহার করতে উৎসাহ বোধ করি না। তারপরও সমাধান রয়েছে।

শপিং মল, রেস্টুরেন্ট কিংবা মসজিদে ব্যবহৃত টয়লেট আপনি ব্যবহার করতে পারেন। এটা পুরুষদের জন্য ভালো সমাধান হলেও, নারীদের জন্য সমাধান কি হবে সেটা আমার জানা নেই। নিকটস্থ হাসপাতাল গুলো এর সমাধান হতে পারে। গুগল ম্যাপ ব্যবহার করে আপনি শপিংমল রেস্টুরেন্ট বা হাসপাতাল এর লোকেশন সহজে জেনে নিতে পারেন।

বাসা থেকে বের হবার আগেই, টয়লেটের কাজ সেরে নেওয়া ভালো। একইভাবে অফিস বা কারো বাসায় থাকলে বের হবার আগে টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইতস্ততটা করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে আপনি যদি রাস্তায় দুই থেকে তিন ঘণ্টাও থাকেন ইউরিনের অত চাপ তৈরি হবে না। সুস্থ মানুষের ৪ ঘণ্টা পর পর ইউরিন হওয়া স্বাভাবিক।

অনিয়ম ২। পর্যাপ্ত পানি না খাওয়া

এই অনিয়ম টি আমার ছিল না। টেবিলের পাশে আমার সবসময়ই ২ লিটার পানি থাকতো। দূরে কোথাও গেলে ব্যাগে পানি থাকতো।

নিয়ম:

সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে দুই থেকে তিন লিটার পানি পান করুন। গরমের সময় এবং অধিক পরিশ্রমে ঘাম বেরিয়ে গেলে পানির পরিমাণ পিপাসা অনুসারে বাড়বে। একটা কথা খেয়াল রাখবেন পানি গ্রহণের পরিমাণ খুব বেশি হলে ক্ষতিকর, কম হলে ক্ষতিকর সেটা তো জানেনই।

বাংলাদেশের বোতল-জাত পানি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বেশিরভাগ

নিরাপদ নয়। সমাধান হচ্ছে অন্তত ছোট একটি বোতলে নিজের কাছে সবসময় পানি রাখা।

আরেকটা বিষয়, মাংস যখন খাবেন বিশেষত গরুর মাংস, খেয়াল রাখলে দেখবেন পিপাসা বেশি লাগে। এ সময় পানি একটু বেশি খাবেন। আপনি লবণ যদি বেশি খেয়ে থাকেন, পানি কিছুটা বেশি খাবেন। অবশ্যই লবণ বেশি খাওয়া উচিত না।

পানি পানের একটি সুন্দর নিয়ম রয়েছে সুস্থ মানুষের জন্য। সকালে ঘুম থেকে উঠেই ২ থেকে ৩ গ্লাস পানি খালি পেটে পান করা। আধঘণ্টা পর সকালের খাবার খেয়ে নেওয়া। দুপুরের খাবারের আধঘণ্টা আগে ২ গ্লাস পানি পান করা। রাতের খাবারের দু'ঘণ্টা আগে ২ গ্লাস পানি পান করবেন।

এভাবে দেখা যায় দৈনিক পানির চাহিদার অর্ধেক পানি গ্রহণ করা হয়ে যায়। এটি এক ভাবে যেমন হজমের জন্য দরকারি আবার রক্ত পরিষ্কার করার জন্য কার্যকরী।

অনিয়ম ৩। অতিরিক্ত লবণ খাওয়া

অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার অভ্যাস আমার ছিল না অবশ্য। তবে বাসার খাদ্য অভ্যাস কিংবা এদেশে যে ধরনের খাবার পাওয়া যায় সে হিসেবে বলা যায়, অতিরিক্ত লবণ টা খাওয়া হয়েছে আমার। যা পরবর্তীতে আমার উচ্চ রক্তচাপ তৈরির জন্য দায়ী হতে পারে।

নিয়ম:

রান্নায় লবণের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের ৩ থেকে ৪ গ্রামের বেশি লবণ প্রয়োজন নেই। এছাড়া প্রতিটি খাদ্য উপাদানে কিছু না কিছু লবণ থাকে। স্বাদ বৃদ্ধি এবং মুখরোচক খাদ্য তৈরি করার জন্য লবণ অত্যাবশ্যক হলেও আন্তে আন্তে এটি কমিয়ে আনতে হবে। আজকে ঘোষণা দিয়ে কালকেই হয়ত লবণ গ্রহণের পরিমাণ কমাতে পারবেন না। পরিকল্পনা করে আপনি সফল হতে পারবেন।

আমরা অনেক সময়ই পাতে আলগা লবণ খেয়ে থাকি। এটা বর্জন করতে হবে। তরকারিতে আস্তে আস্তে লবণের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। এবং খেয়াল রাখতে হবে লবণ সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে। আপনারা যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে লেবুর শরবত খান সেটাতে কিন্তু প্রচুর লবণ দেয়া হয়। এছাড়া রেস্টুরেন্টের খাবার গুলোতে লবণের পরিমাণ একটু বেশি থাকে। মোট কথা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনি অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ করছেন কি না এবং আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা। শরীরে সোডিয়ামের ভারসাম্য হারালে হদরোগসহ নানা রকম শারীরিক জটিলতা তৈরি হবে। আর উচ্চ রক্তচাপ থেকে কিডনি নষ্ট হয় সেটা তো জানতেই পারলেন। একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন, ডায়রিয়া হলে শরীর থেকে পানি সহ খনিজ উপাদান লবণ বেরিয়ে যায়। সে সময় স্যালাইন খেয়ে লবণ এবং পানির ঘাটতি পূরণ করতে হবে। ডায়রিয়ার কারণে ভয়াবহ কিডনি ক্ষতি হতে পারে।

অনিয়ম ৪। যে কোনো সংক্রমণের দ্রুত চিকিৎসা না করা

আমার ওরকম কোনও সংক্রমণ হয়নি, চিকিৎসা নিতে হয়নি। তবে ২০১২ সালের দিকে চুল পড়ার এবং খুশকি সমস্যা ছিল। সে সময় এক ডাক্তার ওষুধ দিয়েছিলেন ৮ মাসের, ৩ মাস ব্যবহারে কাজ হয়নি বলে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। অন্য আরেক ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলাম। তারপরও কাজ হয়নি। চুলের রঙের পরিবর্তন হয়েছিল। এখন এটা জানি প্রোটিনের ভারসাম্য নষ্ট হলে চুলের রংয়ের পরিবর্তন হতে পারে। হতে পারে সে সময় প্রোটিন গ্রহণ বেশি বা কম হয়েছিল। ডায়রিয়া হয়েছিল, সেটিও পানি খেয়ে সমাধান করেছি, স্যালাইন খেয়ে সমাধান করেছি। কিন্তু ডায়রিয়ার কারণে কিডনির সমস্যা হতে পারে এটা আসলেই তখন জানতাম না।

নিয়ম:

কোন অবস্থাতেই সংক্রমণ রোগ গুলো অবহেলা করবেন না। সেটা গোপন হোক যাই হোক। ভালো ডাক্তার খুঁজে বের করে সমাধান করবেন। মূত্রনালি মূত্র-থলি নানা জায়গায় সংক্রমণ রোগ হতে পারে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সব সময় থাকতে হবে। ব্যবহার করা জিনিসপত্র পরিষ্কার সব সময় রাখতে হবে। আর ঘরবাড়ি টয়লেট পরিষ্কার রাখতে হবে জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। পাবলিক স্থান গুলো ব্যবহারে ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। হাত ধোয়ার চর্চা সব সময় করতে হবে। অনেককেই দেখি খাবার আগে সামান্য পানি দিয়ে হাত ধৌত করেন। আর খাবার পর সাবান দিয়ে ভাল করে পরিষ্কার করেন। এটা ভুল। কোন কিছু খেতে গেলে অবশ্যই খাওয়ার আগে ভালো করে হাত পরিষ্কার করতে হবে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। হাত ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত করবার জন্য, সাবান বা হাভওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ৪৫ সেকেন্ড ভাল করে হাত ধুতে হবে।

অনিয়ম ৫। মাংস বেশি খাওয়া

গরিব মানুষ আমি। গরুর মাংস কেনা হত কদাচিৎ। যা গরুর মাংস খাওয়া হতো যদি বলা হয় বেশি খেয়েছি তবে কোরবানির ঈদে। এবং এটা সবাই খেয়ে থাকে। বলা যায় গরুর মাংস আমি কখনোই বেশি খাই নি বাস্তবতা এটা অসম্ভবও।

নিয়ম:

গবেষণাটি নির্ভরযোগ্য নয়। ধারণা করা হচ্ছে, কিডনি রোগ তৈরিতে লাল মাংস এর অবদান রয়েছে। গরুর মাংস কিংবা মাংস খাওয়া বন্ধ করবেন না জানা আছে। এবং প্রোটিনের উৎস হিসেবে সেটা করা উচিত না। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত মাংস গ্রহণ করা যাবে না। অল্প অল্প করে খেতে পারেন। আপনার দৈনিক প্রোটিন গ্রহণের একটি মাত্রা রয়েছে। মাত্রার অধিক প্রোটিন যদি আপনার শরীরে গ্রহণ করে, সেটার জন্য শরীরের সিস্টেমের বেগ পেতে হয়। আপনি পর্যাপ্ত প্রোটিন গ্রহণ করবেন আপনার শরীর সেটি আপনার জন্য কাজে লাগাতে পারবে।

অনিয়ম ৬। প্রয়োজনের তুলনায় কম খাওয়া

যখন খেতাম তখন ভালো করেই খেতাম। ২০১২-১৩ সালের পর থেকে সকালের খাবার নানা কারণেই খেতে পারতাম না।

নিয়ম:

কোনভাবেই তিন বেলা সকাল, দুপুর এবং রাতের খাবার বাদ দেওয়া যাবে না। খাবারের তালিকায় সুষম খাবার এবং পরিমিত খাবার থাকতে হবে। আপনাদের অনেককেই আমি জানি, যারা সকালে খাবার খান না। আবার অনেকে আছেন যারা দেরি করে রাতের খাবার খান। অভ্যাস গুলো খুবই খারাপ। ঘুম থেকে উঠেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সকালের খাবারটি খেয়ে নিতে হবে। বলা হয়ে থাকে একবারে না খেয়ে সকালে দুবার খাওয়াটা ভালো। সকালের খাবারে অন্তত একটা ডিম থাকতে হবে। সকালের খাবার অবশ্যই সকাল ৯ টার মধ্যে খেয়ে নিতে হবে। অনেকে আলু ভাজি আর রুটি দিয়ে নাস্তা করে থাকেন। খেয়াল রাখবেন আলু এবং রুটি দুটোই কিন্তু শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট। আপনি সকালে প্রোটিন গ্রহণ করছেন। সকালের খাবারে অবশ্যই প্রোটিন থাকতে হবে। একটি ডিম থাকলে সেই প্রোটিনের চাহিদা টা পূরণ হয়ে যাবে। এছাড়া ডাল বা সিমের বিচি প্রোটিনের ভালো উৎস।

দুপুরের খাবার ২টা বাজার আগেই খেয়ে নিতে হবে। খাবারের তালিকায় পরিমিত মাছ-মাংস থাকতে হবে। কয়েক রকমের সবজি থাকা দরকারি। এতে আপনার শরীর দরকারি পুষ্টি উপাদান পাবে।

রাতের খাবার রাত ৯ টার আগে খেয়ে নিতে হবে। এবং খেয়াল রাখতে হবে খেয়ে যাতে না ঘুমিয়ে যান। রাতের খাবার এবং ঘুমিয়ে যাবার মধ্যকার পার্থক্য অন্তত দু'ঘণ্টা হতে হবে।

আমাদের সাধারণের অভ্যাস হচ্ছে, সকালে হালকা নাস্তা করা। দুপুরে মোটামুটি ভারী খাবার খাওয়া তাড়াহুড়া করে। আর রাতের বেলা ভারী খাবার খাওয়া পেট পুরে খাওয়া। এই অভ্যাস টা খুবই অস্বাস্থ্যকর। নিয়ম হচ্ছে সকালে এবং দুপুরে খেতে হবে আপনাকে সবচেয়ে বেশি। রাতে পেট পুরে না খাওয়াই ভালো। আবার গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে আরেকটি বিস্তারিত লেখা লিখা যাবে। বিশেষজ্ঞরা ৫থেকে ৬ বেলা খাবার গ্রহণে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

অনিয়ম ৭। অপরিমিত ব্যথার ওষুধ সেবন

আমি ব্যথার ওষুধ খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। জ্বর এর জন্য প্যারাসিটামল খেয়েছি যা ক্ষতিকর নয়।

নিয়ম:

আপনাদের অনেক কে জানি, যারা কথায় কথায় পেইন-কিলার খেয়ে থাকেন। এবং আপনাদের মাত্রা জ্ঞান টাও নেই। ব্যথার ওষুধ ৮০ ভাগই কিডনির ক্ষতি করে থাকে। ব্যথার ওষুধ অবশ্যই পরিমিত গ্রহণ করতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতিরেকে গ্রহণ করা যাবে না।

অনিয়ম ৮। ওষুধ সেবনে অনিয়ম

কথায় কথায় ওষুধ আমি গ্রহণ করতাম না। জ্বর ঠাণ্ডা সর্দি কাশি সামান্য অসুখে ওষুধ গ্রহণ করিনি। ২০১২-১৩ সালে ডাক্তার আট মাসের ওষুধ দিয়ে ছিলেন তিন মাস খেয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

নিয়ম:

ওষুধ সেবনে অবশ্যই সঠিকভাবে সঠিক সময়ে গ্রহণ করতে হবে। কোন ভাবেই কোন বেলা ওষুধ বাদ দেয়া যাবে না। অনেক ওষুধের ডোজের সময় সীমা থাকে। সে সকল ওষুধ অবশ্যই ডোজ সম্পূর্ণ করতে হবে। খাবার আগের ওষুধ খাবার আগে, খাবার পরের ওষুধ খাবার পরে গ্রহণ করতে হবে। সকালের ওষুধ দুপুরে বা দুপুরের ওষুধ রাতে গ্রহণ করা যাবে না। কিছু ওষুধ আছে যেগুলো ঘণ্টা ধরে খেতে হয়, যেমন ১২ ঘণ্টা পর পর বা ২৪ ঘণ্টা পর পর। ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে সেটা অনুসরণ করতে হবে। ওষুধ গ্রহণ ওভার-ডোজ হয়ে গেলে করণীয় কি ডাক্তার কাছে জেনে নিতে হবে।

অনিয়ম ৯। অতিরিক্ত মদ খাওয়া

মদ খাওয়ার সাহস তো করতে পারিনি অতিরিক্ত খাব কি!

নিয়ম:

এটা নিয়ে যেহেতু আমি জানি কম বলা ঠিক নয়। যতটুকু পড়াশোনা করে দেখেছি, মাত্রাতিরিক্ত অ্যালকোহল গ্রহণ ক্ষতিকর। শুধু কিডনি না লিভারের ক্ষতিও করে। ওয়াইন বিয়ার এগুলো মাত্রাতিরিক্ত গ্রহণ করা যাবে না। কোমল পানীয় এনার্জি ড্রিংক শরীরের জন্য সবসময় ক্ষতিকর। এখানে একটি কথা খাটে, একবারে যেহেতু বর্জন করতে পারবেন না আস্তে আস্তে কমিয়ে এনে অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে।

অনিয়ম ১০। পর্যাপ্ত বিশ্রাম না নেওয়া

পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেয়া হতো না। যখন পরিশ্রম করতাম বিশ্রাম নিতে হবে এমনটা মনে হতো না। ঘুমের অনিয়ম হত।

নিয়ম:

টানা পরিশ্রম করা যাবে না। থেমে থেমে বিশ্রাম নিতে হবে। স্বাভাবিক ঘুম ঘুমাতে হবে। দৈনিক ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম সুস্থ মানুষের জন্য স্বাভাবিক। কারো কারো জন্য এর পরিমাণ বেশি হতে পারে। কেবল সুস্থ থাকার জন্য নয় প্রোডাক্টিভ কাজের জন্য প্রতি ২ ঘণ্টা ব্যবধানে ২০ মিনিট বিশ্রাম নিতে হবে।

অনেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটেন। হাঁটার ক্ষেত্রেও বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে হাঁটতে হবে টানা হাটা যাবে না।

রাত ১১ টার আগে ঘুমানো সব থেকে ভালো। কোন কারণে রাত

জাগতে হলে ওই দিনের ঘুম অবশ্যই দিনের বেলা ঘুমিয়ে পুষিয়ে দিতে হবে। অনেকে রাতের বেলা কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে যান, তারা মেডিকেল চেকআপ এর মধ্যে থাকবেন। কারণ আপনি স্বাভাবিক সুস্থ শরীর বৃত্তীয় কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে নতুন একটি সাইকেল তৈরি করেছেন। সেটি শরীরের সাথে এডজাস্ট নাও হতে পারে। অনেকে আমাকে বলেন, তার ঘুম আসে না। এরকম যাকেই পাল্টা জিজ্ঞাসা করেছি আপনি কি ঘুমানোর সময় মোবাইল ফোন ক্রিন ক্রল করেন। উত্তর এসেছে হ্যাঁ। ডিজিটাল ক্রিন ল্যাপটপ, মোবাইল ইত্যাদি এর ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলে ঘুম আসবে না। ভাল ঘুম আসার জন্য কিছু ভাল নিয়ম আছে। মন্তব্যে জানতে চাইলে সেসব নিয়ে লেখা যাবে।

আরও কিছু নিয়ম কানুন:

এগুলো হচ্ছে অনিয়মের বিপরীতে নিয়ম। সুস্থ শরীরে নীরোগ বসবাস করতে চাইলে, আরও কিছু ছোট ছোট নিয়ম মানতে হবে। নিয়মকানুন গুলো খুব কঠিন যে তা নয়, তবে মনে রেখে রেখে অভ্যাসে পরিণত করা টা চর্চার ব্যাপার। আপনি যদি মনে করেন তাহলেই অভ্যাসে পরিণত করতে পারবেন। এম নিয়মগুলোর একটি সুন্দর তালিকা রয়েছে আগ্রহীরা যোগাযোগ করলে আমি তাদেরকে দেব। এখানে খেয়াল করলে দেখবেন, কিডনি প্রতিরোধ করার জন্য আপনাকে কোন কিছুই বর্জন করতে বলা হচ্ছে না। কেবল পরিমিত এবং নিয়ম মেনে গ্রহণ করার জন্য বলা হচ্ছে।

মাদক সিগারেট শরীরের জন্য কোনোভাবেই ভালো নয়। এটা বর্জন করতে হবে।

আপনার শরীরের সাথে আপনার যোগাযোগ থাকতে হবে। শরীর কি বলে কি চায় সেটা বোঝার চেষ্টা করবেন। শরীরের কোন অসুবিধা হলে সে আপনাকে সিগন্যাল দিবে। সিগনাল থেকে আপনি অনেক বড় অসুখের সর্তকতা পাবেন। তাই সিগন্যাল অনুসারে ব্যবস্থা আপনা-

কেই নিতে হবে। কিডনি নষ্ট হওয়ার আগে শরীর আমাকে অনেক সিগনাল ই দিয়েছে। হতে পারে আমি সেগুলো বুঝতে পারিনি বা গুরুত্ব দেয়নি। এই যেমন ধরুন আমার প্রায়ই জ্বর হত। রাতে ঘুমাতে সমস্যা হতো। চুল পড়ে যাচ্ছিল এবং চুলের রং লালচে হয়ে গিয়েছিল। হেঁচকি উঠত অনেকক্ষণ পর থামত। খাবার খাবার সময় অনেক খাবার গন্ধ গন্ধ লাগতো। অনেকক্ষণ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না পা ব্যথা করত। মাংস পেশিতে টান খেত। মাংসের ভিতর থেকে কেমন যেন অস্বস্তি লাগতো। অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে যেতাম। খাবার রুচি একেবারেই ছিল না। শরীরের উপর নির্যাতন করবেন না। তাকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিবেন। আপনার যেমন মেজাজ বিগড়াতে পারে শরীর তেমন বিদ্রোহ করতে পারে। তাই সাবধান।

যে ব্যক্তি তার শরীরকে ভাল বুঝতে পারে, সে অসুখ বিসুখে ভুগবে কম। তাই গড়ে তুলেন নিজ শরীরের সাথে বন্ধুত্ব।

হ্যালো, আপনাকে বলছি,

যারা এই লেখাটা পুরোটা পড়ে নিচ পর্যন্ত এসেছেন তাদের ধন্যবাদ। আমি ধরে নিতে পারি, আপনার নিয়মগুলো মানতে আগ্রহী। কিছু দিন আগে করা আমার বন্ধুদের মধ্যে জরিপে দেখা যায়, এই নিয়মগুলো একাধিক অনিয়ম করেন অধিকাংশরা। এখন পর্যন্ত জরিপে, ২৭ জনের মধ্যে ২৩ জনই অনিয়ম করেন। আপনাদের বন্ধু আমি, আর আমি এত বড় ক্ষতির সম্মুখীন হলাম তারপরও আপনারা কি সতর্ক হবেন না?

সামান্য একটা ইনজেকশনের সুচ ভয় করেন, আর সেই সুচ থেকে কয়েকগুণ মোটা সুচ যখন সপ্তাহে তিনদিন হাতের দুই জায়গা দিয়ে ঢুকানো হবে তখন কি রকম লাগতে পারে একটু কল্পনা করে দেখতে পারে। কল্পনা করে দেখতে পারেন, ৪ টা ঘণ্টা ধরে সপ্তাহে ৩ দিন এই মোটা সুচ লাগানো অবস্থায় ডায়ালাইসিস বেডে শুয়ে থাকা কেমন লাগতে পারে?

আর যখন রক্তচাপ আপডাউন করবে, হঠাৎ অসহনীয় গরম আর মাথা

ব্যথা করবে? কিংবা যখন রক্তচাপ কমে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখা যাবে সেই সময়গুলো এই রোগীদের কেমন যায় ভাবুন। একটি হাতে সারা জীবনের জন্য করা হবে ফিস্টুলা। যা আস্তে আস্তে ফুলে যাবে। সারাজীবন সতর্কতার সাথে থাকা লাগবে। কারণ এটি আপনার লাইফ লাইন। এছাড়া কত কতবার যে অপারেশন থিয়েটারে যেতে হতে পারে, তার ঠিক নাই। হয়ে যাতে পারে যখন তখন স্ট্রোক বা হার্ট এ্যাটাক, ফুসফুসে পানি জমা, সেই থেকে ক্যাসার।

একবার কিডনি বিকল হলে তার আর ফেরার পথ নেই। এখন জীবনটা তার কাছে মৃত্যুকে বিলম্বিত করা। ডায়ালাইসিস কিংবা কিডনি ট্রাঙ্গপ্লান্ট এখনও কোন ভাল সমাধান নয়। ট্রাঙ্গপ্লান্টে কোন রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন না। একটা সময় ব্যাপী ভাল থাকেন মাত্র। আর সেই ভাল থাকার জন্য তাকে প্রচুর পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করে যেতে হয়। নিয়মকানুনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

এত এত বিপদ, অথচ নিয়মগুলো কি সামান্য না? তাই মানুন। মানতে থাকুন। জীবনকে নিয়ে ভাবুন।





লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি

মুহাম্মদ সামিউল আলম

ন দম্পতির ক্ষেত্রে যখন স্ত্রী গর্ভবতী হয় তখন ঐ দম্পতিকে দেখলে সকলের একটি সাধারণ প্রশ্ন হলো ''ছেলে হবে নাকি মেয়ে?''। এই প্রশ্নের কারণ হলো, সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতায় আমরা বলতে পারি যে ছেলে বা মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনা ৫০/৫০। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে মেয়ে বা ছেলে হওয়ার সম্ভাবনা কেনই বা ৫০/৫০ হলো? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে আমাদের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতিতে।

আমাদের এই প্রাণিজগতে নানা বৈচিত্রের জনন প্রক্রিয়া ও জীবনচক্র লক্ষ করা যায়। কোন প্রাণী অযৌন জনন, কোনটা যৌন জনন, কোনটা আবার যৌন অযৌন উভয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রজনন সম্পন্ন করে। যৌন জননের ক্ষেত্রে মাইয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে ডিপ্লয়েড (2n) প্রাণিদেহ থেকে হ্যাপ্লয়েড (n) জনন কোষ সৃষ্টি হয়। দুটি হ্যাপ্লয়েড (n) জনন কোষের মিলনের ফলে সৃষ্ট জাইগোট (2n) থেকে নতুন প্রাণীর বিকাশ ঘটে। সচল (ফ্লাজেলার মাধ্যমে চলনে সক্ষম) জননকোষটিকে বলা হয় প্রুণগ্যামিট বা শুক্রাণু এবং নিশ্চল জননকোষটিকে বলা হয় স্ত্রীগ্যামিট বা ডিম্বাণু।

অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রেই যৌন দ্বিরূপতা/Sexual Dimorphism (স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণির ভিন্ন বাহ্যিক গঠন) পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে একটিকে বলা হয় স্ত্রী অপরটিকে বলা হয় পুরুষ।

তাহলে কিভাবে একই প্রজাতির কিছু প্রাণী পুরুষ আবার কিছু প্রাণী স্ত্রী? সাধারণত দুটি প্রধান প্রক্রিয়ায় লিঙ্গ নির্ধারিত হয়:

- ১. ক্রোমোসোমাল পদ্ধতি
- ২. পরিবেশগত প্রভাব

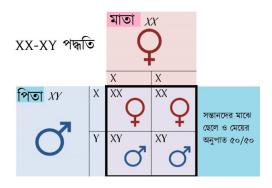
২২.১. ক্রোমোসোমাল পদ্ধতি

এই পদ্ধতি প্রাণিদেহে বিদ্যমান ক্রোমোসোম দ্বারা বাহিত জিন তার লিঙ্গ নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। যেসকল ক্রোমোসোম লিঙ্গ নির্ধারণে ভূমিকা রাখে এদের বলা হয় সেক্স ক্রোমোসোম (Sex Chromosome)। সেক্স ক্রোমোসোম স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীতে ভিন্ন ধরণের হয়। সেক্স ক্রোমোসোমে বিদ্যমান সুনির্দিষ্ট জিন নির্দিষ্ট যৌনগত (স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ) বাহ্যিক গঠনের জন্য দায়ী। যেসকল ক্রোমোসোম লিঙ্গ নির্ধারণে নিজ্রিয় এবং স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীতে অভিন্ন এদের অটোসোম (Autosome) বলে।

এক্ষেত্রে ৪ ধরণের ক্রোমোসোমাল পদ্ধতি পাওয়া যায়:

ক) XX-XY পদ্ধতি

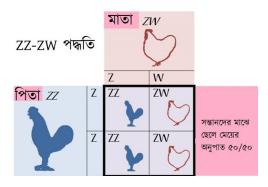
অধিকাংশ স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে প্রাণীর লিঙ্গ XX-XY পদ্ধতি অনুযায়ী জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নতুন প্রাণীতে এক্ষত্রে এক জোড়া সেক্স ক্রোমোসোম থাকে, যার একটি মাতা থেকে আগত এবং অন্যটি পিতা থেকে। মাতা-পিতা উভয়েই X ক্রোমোসোম প্রদান করলে প্রাণীটি হয় মেয়ে (XX)। অন্যদিকে মাতা X ক্রোমোসোম এবং পিতা Y ক্রোমোসোম প্রদান করলে প্রাণীটি হয় ছেলে (XY) । সুতরাং এ পদ্ধতিতে পুরুষ (XY) প্রাণীটি হয় হেটারোগ্যামেটিক/Heterogametic (অর্ধেক জনন কোষ X এবং অর্ধেক জনন কোষ Y ক্রোমোসোম বহন করে)। অন্যদিকে স্ত্রী (XX) প্রাণীটি হল হোমোগ্যামেটিক/Homogametic (সকল জনন কোষ X ক্রোমোসোম বহন করে)। যেহেতু মাতা জনন কোষে শুধুমাত্র X ক্রোমোসোম প্রদান করতে সক্ষম কিন্তু পিতা জনন কোষে X অথবা Y ক্রোমোসোম প্রদান করতে পারে সেহেতু সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে তা নির্ভর করে পিতা তার জনন কোষে X ক্রোমোসোম প্রদান করল নাকি Y ক্রোমোসোম। তাই এই পদ্ধতিতে পিতা সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য দায়ী। সকল স্তন্যপায়ী, কতক পতঙ্গ ও সরিস্প-এ এই লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি পাওয়া যায়।



চিত্র ২২.১: XX-XY পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারণ। মূল ছবির সূত্র: italiaxlascienza.it

খ) ZZ-ZW পদ্ধতি

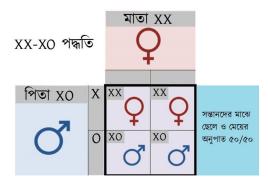
সাপ ও পাখিতে দেখায় যায় উল্টো ঘটনা। নতুন প্রাণীতে এক্ষত্রে এক জোড়া সেক্স ক্রোমোসোম থাকে, যার একটি মাতা থেকে আগত এবং অন্যটি পিতা থেকে। মাতা-পিতা উভয়েই Z ক্রোমোসোম প্রদান করলে প্রাণীটি হয় ছেলে (ZZ)। অন্যদিকে মাতা W ক্রোমোসোম এবং পিতা Z ক্রোমোসোম প্রদান করলে প্রাণীটি হয় মেয়ে (ZW)। এ পদ্ধতিতে স্ত্রী (ZW) প্রাণীটি হয় হেটারোগ্যামেটিক (অর্ধেক জনন কোষে Z এবং অর্ধেক জনন কোষে W ক্রোমোসোম বিদ্যমান। অন্যদিকে পুরুষ (ZZ) প্রাণীটি হল হোমোগ্যামেটিক (সকল জনন কোষে Z ক্রোমোসোম বিদ্যমান)। লিঙ্গ নির্ধারণের এই পদ্ধতি হলো ZZ-ZW পদ্ধতি। এটি XX-XY পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ায় এর এমন নামকরণ করা হয়েছে। এদের ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্ধারণে পিতার পরিবর্তে মাতা দায়ী। কারণ পিতা জনন কোষে শুধুমাত্র Z ক্রোমোসোম প্রদান করতে সক্ষম কিন্তু মাতা জনন কোষে Z অথবা W ক্রোমোসোম প্রদান করতে পারে তাই সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে তা নির্ভর করে মাতা তার জনন কোষে Z ক্রোমোসোম প্রদান করল নাকি W ক্রোমোসোম। সাপ, পাখি, প্রজাপতি, কতক উভচর প্রাণি ও মাছে এ পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়।



চিত্র ২২.২: ZZ-ZW পদ্ধতিতে লিঙ্গ নিদ্ধারণ। মূল ছবির সূত্র: italiaxlascienza.it

গ) XX-XO পদ্ধতি

ঘাসফড়িং, তেলাপোকা, ঝিঁঝেঁ পোকা সহ কতক পতঙ্গে এ পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে স্ত্রী (XX) প্রাণীতে থাকে দুটি X ক্রোমোসোম এবং পুরুষ (XO) প্রাণীতে থাকে শুধুমাত্র একটি X ক্রোমোসোম। কোন Y ক্রোমোসোম থাকেনা বলে Y ক্রোমোসোমের অনুপস্থিতিকে শূন্য (O) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কোন প্রকার পুংগ্যামিট ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করল তাই দিয়ে এই পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। যদি পুংগ্যামিটে X ক্রোমোসোম থাকে তবে ডিম্বাণুর একটি X ক্রোমোসোমের সাথে একত্রিত হয় জাইগোটে দুটি X ক্রোমোসোম হবে, ফলে প্রাণীটি হবে স্ত্রী (XX)। অন্যদিকে যদি পুংগ্যামিটে কোন X ক্রোমোসোমে না থাকে তবে ডিম্বাণুর একটি X ক্রোমোসোমের সাথে মিলিত হয়ে জাইগোটে একটিমাত্র X ক্রোমোসোম হবে। ফলে প্রাণীটি হবে পুরুষ (XO)। এ পদ্ধতিতে স্ত্রী প্রাণী হল হোমোগ্যামেটিক/Homogametic এবং পুরুষ প্রাণিটির কোমের স্ত্রী প্রাণী অপেক্ষা একটি ক্রোমোসোম কম থাকবে (যেহেতু পুরুষ XO এবং স্ত্রী XX)।



চিত্র ২২.৩: XX-XO পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারণ। মূল ছবির সূত্র: italiaxlascienza.it

ঘ) হাপ্লোডিপ্লয়ডি (Haplodiploidy)

নাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে এটি হল হ্যাপ্লয়েড (n) ও ডিপ্লয়েড (2n) এর একিভূতকরণ। পতঙ্গের Hymenoptera গোত্রে (মৌমাছি, পিঁপড়া) এ পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। কোষে বিদ্যমান ক্রোমোসোম সেট সংখ্যা লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য দায়ী। এই পদ্ধতি অনুযায়ী অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে পুরুষ (n) প্রাণী বিকাশ লাভ করে ফলে এরা হ্যাপ্লয়েড (n) হয় অর্থাৎ পুরুষদের কোষে ক্রোমোসোম সেট সংখ্যা এক। অন্যদিকে নিষিক্ত ডিম্বাণু (n+n) থেকে স্ত্রী (2n) প্রাণী বিকাশ লাভ করায় এরা হয় ডিপ্লয়েড (2n) অর্থাৎ কোষে দুই সেট ক্রোমোসোম বিদ্যমান। এই পদ্ধতির একটি মজার দিক হল পুরুষ প্রাণীর কোন পিতা ও পুত্র থাকা সম্ভব না। গুধুমাত্র নানা ও নাতি থাকা সম্ভব। এটা কিভাবে সম্ভব?

কারণ পুরুষ প্রাণী হ্যাপ্লয়েড এবং এরা শুধুমাত্র মাতার অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে সৃষ্ট। তার জিনোমের সমগ্র অংশ এসেছে মাতা থেকে। তাই তার কোন পিতা থাকা সম্ভব না। তার পুত্র সম্ভব না কারণ তার শুক্রাণু ও স্ত্রী'র ডিম্বাণু মিলিত হলে যে নিষিক্ত ডিপ্লয়েড ডিম্বাণু গঠিত হয় তা থেকে শুধুমাত্র স্ত্রী প্রাণী বিকাশ লাভ করে। পুরুষ প্রাণীর নানা থাকা সম্ভব কারণ নানা ও নানীর জনন কোষ এর

নিষিক্ত হওয়ার ফলে সৃষ্ট মাতা থেকে যে অনিষিক্ত ডিম্বাণু আসে তা থেকেই সে জন্ম লাভ করে। ঠিক উল্টোভাবেই তার নাতি থাকা সম্ভব।



চিত্র ২২.৪: মৌমাছিদের লিঙ্গ নির্ধারিত হয় হ্যাপ্লোডিপ্লয়ডি পদ্ধতিতে। মূল ছবির সূত্র: Concepts Of Genetics

অন্যদিকে $Drosophila\ melanogaster$ বা ফ্রুট ফ্লাই এর লিঙ্গ ক্রো-মোসোম দ্বারা নির্ধারিত হলেও উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো থেকে তা আলাদা। এদের ক্ষেত্রে X এবং Y ক্রোমোসোম উপস্থিত থাকলেও XX-XY পদ্ধতিতে এদের লিঙ্গ নির্ধারিত হয় না । এদের দেহে মোট ৪ জোড়া ক্রোমোসোম থাকে। লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে Y ক্রোমোসোমর কোন ভূমিকা নেই। বরং X ক্রোমোসোম ও অটোসোমের সংখ্যার অনুপাত দ্বারা এদের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়।

সারণী ২২.১-এ দেখা যাচ্ছে যে অটোসোমের সংখ্যা X ক্রোমোসোম থেকে অধিক হলে সেটি হয় পুরুষ এবং X ক্রোমোসোম অটোসোম

X ক্রোমোসোম	অটোসোম, A	X:A	লিঙ্গ
XXXX	AAAA	1	স্ত্ৰী
XXX	AAA	1	স্ত্রী
XXY	AA	1	স্ত্রী
XXYY	AA	1	স্ত্রী
XX	AA	1	স্ত্ৰী
XY	AA	0.50	পুরুষ
X	AA	0.50	পুরুষ (বন্ধ্যা)
XXX	AA	1.50	অস্বাভাবিক স্ত্রী
XXXX	AAA	1.33	অস্বাভাবিক স্ত্রী
XX	AAA	0.66	আন্তঃলিঙ্গ
X	AAA	0.33	অস্বাভাবিক পুরুষ

সারণী ২২.১: ফুট ফ্লাই-এ X ক্রোমোসোম ও অটোসোমের মধ্যকার অনুপাত লিঙ্গ নির্ধারণ করে।

থেকে অধিক হলে সেটি হয় স্ত্রী। অর্থাৎ স্ত্রী মাছির জন্য এক্স ক্রোমোসোম দ্বায়ী হলেও পুরুষ মাছির জন্য দ্বায়ী হল অটোসোম।

আরও একটি মজার ব্যতিক্রম হল প্লাটিপাস এর লিঙ্গ নির্ধারণ। সেই আদিকাল থেকেই প্লাটিপাস ছিল বিজ্ঞানীদের নিকট এক বিশ্বয়ের নাম। এদের জীবন্ত জীবাশ্ব বলা হয়। এদের যেমন রয়েছে স্তন্যপায়ীদের মত লোমশ দেহ, উষ্ণ রক্ত ও শিশুকালে মায়ের স্তন পানের মত স্বভাব তেমনি রয়েছে পাখিদের মত দাঁতবিহীন চঞ্চু এবং সরিস্পের মত নখর ও বিষ নিঃসরণ ক্ষমতা। সব মিলিয়ে প্লাটিপাস হল স্তন্যপায়ী, পক্ষীকূল এবং সরিস্পের এক মিলবন্ধন। তাদের অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্টের মত তাদের সেক্স ক্রোমোসোম ও লিঙ্গ নির্ধারণও অডুত। এদের দেহে মোট ক্রোমোসোম সংখ্যা ৫২ যার মাঝে সেক্স ক্রোমোসোম হল ১০ টি। স্ত্রী প্লাটিপাসে থাকে ১০ টি X ক্রোমোসোম এবং পুরুষ প্লাটিপাসে থাকে ৫টি X ক্রোমোসোম ও ৫ টি Y ক্রোমোসোম। মায়োসিস



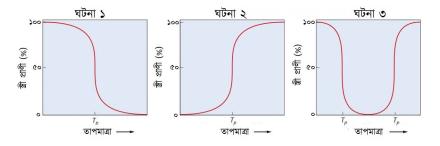
চিত্র ২২.৫: স্ত্রী প্লাটিপাসে থাকে ১০টি X ক্রোমোসোম এবং পুরুষদের থাকে ৫টি X ক্রোমোসোম ও ৫টি Y ক্রোমোসোম। ছবিসূত্র: Concepts Of Genetics

বিভাজনের সময় এমনভাবে দলবেঁধে সেক্স ক্রোমোসোম সঞ্চারিত হয় যেন ডিম্বাণুতে ৫ টি X ক্রোমোসোম গমন করে এবং অর্ধেক শুক্রাণুতে ৫টি X ক্রোমোসোম এবং বাকি অর্ধেকে ৫টি করে Y ক্রোমোসোম প্রবেশ করে। শুক্রাণু ও ডিম্বানুর মিলনের ফলে সেক্স ক্রোমোসোমর অবস্থা ভিত্তিতে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়।

২২.২. পরিবেশগত প্রভাব

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেক্স ক্রোমোসোম দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারিত হলেও অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রেই লিঙ্গ নির্ধারণে ক্রোমোসোমাল কোন ভূমিকা থাকে না। লিঙ্গ নির্ধারিত হয় পারিপার্শিক পরিবেশের কোন নিয়ামকের দ্বারা। যেমন—

কিছু কিছু সরিসৃপ ও মাছের প্রজাতিতে তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। প্রাণীটির ডিম যে তাপমাত্রায় থাকে তাই নির্ধারণ করে ডিমের ভিতর থাকা প্রাণীটি স্ত্রী হবে নাকি পুরুষ। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত লিঙ্গ নির্ধারনে তিনটি ধরণ এখন পর্যন্ত লক্ষ করা যায়।



চিত্র ২২.৬: পারিপাশ্বীক তাপমাত্রার মাধ্যমে কচ্ছপ, কুমির ও টুয়াটারাতে লিঙ্গ নির্ধারণ। মূল ছবির সূত্র: Concepts Of Genetics

পরিবেশগত প্রভাবে লিঙ্গ নির্ধারণে আরও বৈচিত্র্য দেখা যায় এক প্রকার সামুদ্রিক শামুক (Crepidula fornicata) এ। এরা কোন একটি জড় বস্তুকে ভিত্তি করে একটি শামুকের উপর আরেকটি এঁটে বসে স্তুপাকারে বসবাস করে। এদের জীবনচক্রের প্রথম দিকে মুক্ত সাঁতারু লার্ভা দশা দেখা যায়। যেই লার্ভাটি সর্ব প্রথম কোন জড় ভিত্তির সংস্পর্শে আসে সেটি সেখানে আবাস স্থাপন করে এবং স্ত্রী প্রাণী হিসেবে বৃদ্ধি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় সেই স্ত্রী শামুকটি এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে যা অন্যান্য লার্ভাকে আকৃষ্ট করে, ফলে নতুন আরেকটি লার্ভা তার উপর এসে অবস্থান করে। কিন্তু এক্ষেত্রে উপরে অবস্থা করান নতুন লার্ভাটি পুরুষ হিসেবে বৃদ্ধি লাভ করে। ফলে স্ত্রী ও পুরুষ শামুকের মাঝে প্রজননের ফলে আরও নতুন লার্ভা জন্মলাভ করে। মজার বিষয় হল একটি নির্দিষ্ট সময় পর উপরে থাকা পুরুষ শামুকটি হরমোনাল পরিবর্তনের মাধ্যমে স্ত্রী শামুকে রূপান্তরিত হয়।

ফলে সেও নিচের শামুকটির মত রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে যার ফলে অন্য আরও নতুন লার্ভা আকৃষ্ট হয়ে তার উপর অবস্থান করে এবং পুরুষ শামুক হিসেবে বৃদ্ধি করে। তাদের মধ্যে প্রজনন হয়। পূর্বের ন্যায় ঘটনা পর্যায়ক্রমে আরও ঘটতে থাকে। এ পদ্ধ-তিকে অনুক্রমিক উভলিঙ্গতা (Sequential Hermaphroditism) বলে।



চিত্র ২২.৭: এক প্রকার সামুদ্রিক শামুকে লিঙ্গ নির্ধারিত হয় অনুক্রমিক উভলিঙ্গতার মাধ্যমে। মূল ছবির সূত্র: Concepts Of Genetics

প্রতিটি স্তুপে ১২ বা তার অধিক শামুক অবস্থান করে। সবার উপরে থাকা শামুকটি হয় পুরুষ বাকি সকল শামুক হয় স্ত্রী (চিত্র ২২.৭ দ্রস্টব্য)। এভাবে স্তুপে শামুকের অবস্থান দ্বারা এদের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়।

ট্রপিক অঞ্চলের মাছ, ক্লাউন ফিশের ক্ষেত্রে লিঙ্গ এতটা দ্রুত নির্ধারিত হয় না। সকল ক্লাউন ফিশ পুরুষ হিসেবে জীবন শুরু করে। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এরা স্ত্রী-তে রূপান্তরিত হয়। এই গোষ্ঠী গোষ্ঠীতে সনির্দিষ্ট হিসেবে বসবাস করে। এসব নির্ধারিত অনুযায়ী প্রতিটা গোষ্ঠীতে থাকে। নিয়ম প্রভাবশালী স্ত্রী ও পুরুষই শুধুমাত্র প্রজনন করতে পারবে। অবাক করা যদি কোনভাবে

প্রভাবশালী স্ত্রী মাছটি মারা যায় তবে সবচেয়ে বড় ও প্রভাবশালী পুরুষ মাছটি লিঙ্গ পরিবর্তনের মাধ্যমে স্ত্রী মাছে রূপান্তরিত হয় এবং গোষ্ঠিতে মৃত স্ত্রী মাছটির অবস্থান দখল করে। অন্যদিকে ক্রমিক ধারা



চিত্র ২২.৮: ক্লাউন ফিশ লিঙ্গ পরিবর্তনে সক্ষম। সূত্র: aquariumgallery.com

অনুযায়ী অন্য একটি পুরুষ মাছ এসে লিঙ্গ পরিবর্তন করা পুরুষ মাছটির জায়গা দখল করে।

সবচেয়ে অদ্ভূত লিঙ্গ নির্ধারণের ঘটনা দেখা যায় চাবুক-লেজি গিরগি-টি-তে। সকল চাবুক-লেজি গিরগিটি স্ত্রী লিঙ্গের অধিকারী। তারপরেও এরা ডিম পারে এবং কোন যৌন জনন ছাড়াই সন্তান উৎপাদন কর-তে সক্ষম। পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় প্রতিটি চাবুক-লেজি গিরগিটি যে ডিম পারে এবং তা থেকে আরেকটি ক্লোন স্ত্রী গিরিগিটি বৃদ্ধি লাভ করে।



চিত্র ২২.৯: চাবুক-লেজি গিরগিটি (মাঝে) প্রজন ছাড়াই পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় স্ত্রী সন্তান উৎপাদন করে। সূত্র: commons.wikimedia.org

উপরে বর্ণিত সকল লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য ক্রোমোসোম বা পরিবেশগত নিয়ামক দায়ী হলেও বস্তুত লিঙ্গ নির্ধারিত হয় সুনির্দিষ্ট জিন দ্বারা। ক্রোমোসোমাল লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেক্স ক্রোমোসোমে বিদ্যমান নির্দিষ্ট জিন লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য প্রকৃত ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে পরিবেশগত নিয়ামক দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ঐ নিয়ামক নির্দিষ্ট জিনকে বন্ধ বা চালু করে ফলে ঐ প্রকাশিত বা বাধাপ্রাপ্ত জিনের দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারিত হয়।

মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ

মানুষের লিঙ্গ XX-XY পদ্ধতিতেই নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং Y ক্রোমোসোম পুরুষ হওয়ার জন্য দায়ী।

এটি ১৫৩ মিলিয়িন বেস পেয়ার নিয়ে গঠিত এবং প্রায় ৮০০ প্রোটিন কোডিং জিন বিদ্যমান। উভয় লিঙ্গের মানুষের জন্য অপরিহার্য জিন এই ক্রোমোসোমে বিদ্যমান। স্বাভাবিক বিকাশের জন্য উভয়েরই কমপক্ষে একটি করে X ক্রোমোসোম প্রয়োজন।

⊗ Y ক্রোমোসোম:

এটি ৫৯ মিলিয়ন বেস পেয়ার নিয়ে গঠিত এবং মাত্র ৭০ টি প্রোটিন কোডিং জিন বিদ্যমান। Y ক্রোমোসোমে বিদ্যমান বিশেষ SRY জিন শুক্রাশয় গঠনের জন্য দ্বায়ি। XY সেক্স ক্রোমোসোম জোড় বিশিষ্ট ক্রানদেহে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের সময় এই জিনটি সক্রিয় হয় ফলে শুক্রাশয় গঠন শুক্র হয়। এই জিন X ক্রোমোসোমে থাকে না তাই Y ক্রোমোসোমের অনুপস্থিতিতে স্ত্রী লিন্স বিকাশ লাভ করে।

তথ্যসূত্র

- Michael R. Cummings, William S. Klug, Charlotte A. Spencer, et al. Concepts of Genetics.
- ♦ Ben Pierce. Genetics, A Conceptual Approach.
- ♦ Sex Determination: More Complicated Than You Thought – TED-Ed, YouTube
- De Cleene, M., De Ley, J. The host range of crown gall. Bot. Rev 42, 389-466 (1976). DOI: 10.1007/BF02860827.



§ ২৩



ছোট ওকাজাকি ফ্রেগমেন্ট থেকে বড় সামাজিক ইস্যু

আরিফ আশরাফ

পানে আসার আগে যেই একটা মাত্র জাপানিজ নাম জানতাম, তা ছিল ওকাজাকি। তিনি প্রথম রিপোর্ট করেন ওকাজাকি ফ্রেগমেন্ট। কিন্তু, দুঃখের ব্যাপার হল, উনি এই ধরনের মৌলিক কাজের জন্য নোবেল পান নি। উনি কেন নোবেল পান নি? কিংবা, কেন ওকাজাকি ফ্রেগমেন্ট নোবেলের নমিনেশনে আসেনি? কিংবা, নোবেলে মহিলা বিজ্ঞানীদের মনোনয়ন এতো কম কেন? কিংবা, স্যার জেমস ওয়াটসনের ব্যাপারে অতি সাম্প্রতিক আলোচনা নিয়ে আপনি কি ভাবছেন? – এই সব বিষয় গুলোকে একটা সামগ্রিক আলোচনায় এনে ব্যাখ্যা করছি।

ওকাজাকি কেন নোবেল পান নি?

ওকাজাকি প্রথম ছোট ছোট ফ্রেগমেন্ট রিপোর্ট করেন ১৯৬৮ সালে একটা কনফারেসে। তখন অনেকেই বলছিল যে, সম্ভবত ঐ সকল ছোট ফ্রেগমেন্ট গুলো বড় কোন ফ্রেগমেন্ট ভেঙ্গে তৈরি হচ্ছে। সুতরাং, ঐ সময় সবাই তার এই রিপোর্টে খুব একটা কনভিন্সড ছিল না। আর হিরোশিমার রেডিয়েশনের কারণে উনি ১৯৭৫ সালে মারা যান লিউকেমিয়াতে। আর মৃত ব্যাক্তিকে নোবেলের নমিনেশনে রাখা হয় না। এই কারণে, ওকাজাকি তার ফান্ডামেন্টাল কাজের জন্য মনোনীত হবার সুযোগ পান নি।

কেন ওকাজাকি ফ্রেগমেন্ট নোবেলের নমিনেশনে আসে নি?

এই প্রশ্নটার উত্তর আগের অংশেই শেষ হয়ে যেত, যদি না আরও কিছু তথ্য উপাত্ত না থাকতো। কারণ, ওকাজাকির পাশাপাশি একই প্রোজেক্টে কাজ করতেন তার স্ত্রী, সুনেকো। ওকাজাকির মৃত্যুর পর সুনেকো অনেক বছর ধরে কাজ চালিয়ে যান, আরও অনেক পরীক্ষা করে প্রমান করার জন্য। ধারণা করা হয়, যদি ওকাজাকি বেঁচে থাকতো, তাহলে তারা এই কাজের জন্য নোবেল পেত। কিন্তু, এই

জায়গায় একটা বিশাল জিনিস রয়ে যায়, যা কখন সামনের সারিতে আসে না।



চিত্র ২৩.১: ল্যাবে ওকাজাকি এবং সুনেকো

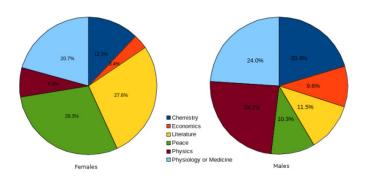
যদিও ওকাজাকি এবং সুনেকো একই সাথে একই গবেষণায় কাজ করতো, বিভিন্ন জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসতো ওকাজাকির কাছে। ওকাজাকি বেঁচে থাকা অবস্থায় কোন আমন্ত্রণেই সুনেকোর নাম তো থাকতোই না, এমনকি সুনেকো প্রোজেক্টের অংশ হিসেবেও উপস্থিত থাকতো না মিটিং গুলোতে, বরং সে অন্য দশ জন গৃহিণীর মতন বাসায় থাকতেন। ওকাজাকির এই বৈশিষ্ট্য সুনেকোর ভাষায় বললেঃ

সোজা কোথায় বলা যায়, ওকাজাকি নিজেই কখনো সুনেকোর অবদানকে সেভাবে মূল্যায়ন করতেন না। অনেক বছর পর যখন সুনেকোকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, যদি ওকাজাকি বেঁচে থাকতো এবং নোবেলের নমিনেশনে তার নাম আসতো, আপনার কি মনে হয় সে আপনার কন্ট্রিবিউশনের কথা উল্লেখ করে আপনার নাম যোগ করতে বলত?

এই অংশ টুকু থেকে এটা খুব পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ওকাজাকি নিজেও মহিলা বলে অথবা স্ত্রী বলে, যে কারনেই হোক, সুনেকোর

অবদানকে খুব একটা সামনে আনতেন না।

নোবেলে মহিলা বিজ্ঞানীদের মনোনয়ন এতো কম কেন?



চিত্র ২৩.২: নোবেল প্রাইজে নারী পুরুষের বৈষম্য বিষয়ক পরিসংখ্যান

এখন পর্যন্ত নোবেল পাওয়া পুরুষ এবং মহিলার সংখ্যা যদি আলাদাভাবে দেখা হয়, তাহলে পুরুষ ৮৫৬ এবং মহিলা ৫২ (১৯০১ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত)। এর মাঝে যদি, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসা এবং অর্থনীতি হিসেব করা হয়, তাহলে পুরুষ ৬৬৭ এবং মহিলা ২১। শতকরা হিসেবে মাত্র ৩%। আর এই ব্যাপারটা নিয়েই গত কয়েক বছর প্রতিবার নোবেল পুরস্কারের সময়ে, আগে-পরে খুব আলোচনা-সমালোচনা চলে।

আবারো ওকাজাকির ঘটনাতে ফিরে আসি। ওকাজাকি তার সাথে একই গবেষণায় কাজ করা তার স্ত্রীর অবদান যদি মূল্যায়ন না করে, তাহলে খুব সহজেই বুঝা যায় যে, এটা একটা সামাজিক সমস্যা। এখানে মহিলা গবেষকদের বিজ্ঞানচর্চা অথবা তাদের অবদান কোন সমস্যা না। অনেকেই ধারণা করতে পারেন যে, ১৯৬০ এর দশকে সামাজিক প্রেক্ষাপট এমন ছিল। কিন্তু, আপনার কি মনে হয়, বর্তমান সময়ে এসে সামাজিক প্রেক্ষাপট পাল্টে গেছে? যদি পাল্টে যেতই, তাহলে নোবেলে

পুরুষ এবং মহিলাদের এই সংখ্যার তারতম্য এতোটা প্রতীয়মান হতো না।

স্যার জেমস ওয়াটসনের ব্যাপারে সাম্প্রতিক বিতর্ক



চিত্র ২৩.৩: জেমস ওয়াটসন

অতি সাম্প্রতিক সময়ে জেমস ওয়াটসন আলোচনায় চলে আসে তার কিছু আপত্তিকর মন্তব্যর কারণে। সেই সূত্র ধরে, তার অনেক মন্তব্যই নিউজ ফিডে সামনের দিকে চলে আসে। মহিলা গবেষকদের ব্যাপারে উনার একটা মন্তব্য ছিল এমনঃ

Female scientists, while making work "more fun for the men", are "probably less effective".

ওকাজাকি এবং ওয়াটসন যদি মহিলা সায়েন্টিস্টদের ব্যাপারে এই ভাবে চিন্তা করে, তাহলে এক বাক্যেই বলা যায়, এটা আমাদের মধ্যে এক বড় ধরনের সামাজিক সমস্যা। এটা শুধু মাত্র নোবেল কমিটির সিলেকশন বায়াস না, এটা সর্বত্র বিরাজ করতেছে। আমাদের সামনে যখন কিছু দিন পর পর কোন ঘটনা দৃশ্যমান হয়, আমরা প্রতিবাদ করি, ভাবি এটা সামান্য ব্যাপার। ওকাজাকি ফ্রেগমেন্টের মতন ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটা আমাদের বৈশ্বিক সমাজের

উপর থেকে নিচে সামগ্রিক সমস্যা। এই ধরনের ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে না পারলে, এমন বৈষম্যর শিকার হবে আপনার-আমার মা, বোন, বান্ধবী, স্ত্রী এবং আত্মীয় স্বজন।

তথ্যসূত্র

- ওকাজাকির ব্যাক্তিগত ঘটনাগুলোর জন্য: Okazaki fragments
 and the Nobel prize − Nagoya University
- াবেল প্রাইজে নারী পুরুষের বৈষম্য বিষয়ক পরিসংখ্যান:
 Nobel prize awards by gender in each category
 − areppim AG
- ভেমস ওয়াটসনের সাম্প্রতিক ঘটনাসহ তার আগের কিছু মন্তব্য:
 DNA pioneer James Watson loses honorary titles over racist comments − Smithsonian Magazine



§ 28



শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমাবে প্রোবায়োটিক

তানভীর আহমেদ

জকাল প্রোবায়োটিক সম্পর্কে এত বেশী প্রচার-প্রচারণা হয়, তাতে অনেকের মনেই এমন ধারণা হতে পারে যে এটা বুঝি ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম থেকে শুরু করে ক্যান্সার সব কিছুই নিরাময় করার যাদুকরী ওষুধ। প্রোবায়োটিক শব্দের অর্থ জীবনের জন্য। আমাদের শরীরের ভিতরে নানারকম জীবাণু বাস করে। এদের প্রোবায়োটিক বলা হয়। এরা ব্যাকটেরিয়া কিংবা ইস্ট। শরীরের ভিতরে যে সকল জীবাণু থাকে, তাদের সবাই কিন্তু আমাদের ক্ষতি করে না। কিছু জীবাণু আমাদের বন্ধু। সুস্বাস্থ্যের জন্য আমাদের শরীরে এসব জীবাণুর উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। কিছু প্রোবায়োটিক ব্যাক্টেরিয়ার তালিকা Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium, Bacillus infantis, Streptococcus thermophillus, Enterococcus faecium।

মূলত পরিপাক নালীতে এসব জীবাণু থাকলে আমাদের নানারকম উপকার হয়। বাস্তবতা হচ্ছে খুব কম মানুষই বলতে পারে তার খাওয়া দাওয়া এবং জীবনাচরণ সঠিক মতো চলছে। সুষম খাবার, পর্যাপ্ত ব্যায়াম করে এবং উপযুক্ত প্রোবায়োটিক গ্রহণ করে সঠিক জীবনাচরণ পালন করার চেষ্টা করতে পারি। আমাদের পরিপাকতন্ত্রের বন্ধু জীবাণুসমূহ অনেকসময় আমাদের ভুলেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যেমনঃ অতিরিক্ত মদ্যপান, অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ, আঁশযুক্ত খাবার কম খাওয়া, অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড গ্রহণ করা, বিভিন্ন ধরণের বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান গ্রহণ করা, অন্ত্রের নানাধরনের জীবাণু সংক্রমণ, এবং অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছে ব্যবহার।

প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়াগুলা সাধারনত দুই ট্র্যাকে আমাদের উপকার করে থাকে প্রথমত এই ব্যাকটেরিয়া গুলা ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে কাজ করে, আমাদের সুস্থ দেহে সাধারনত উপকারী ও অপকারী ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে একটা ব্যালেন্স বজায় থাকে। অপকারী ব্যাক্টেরিয়া গুলো প্রভাব বিস্তার করে তখনেই যখন আমরা অপুষ্টিকর খাবার, ঘুমের অনিয়ম, মানসিক

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী বিজ্ঞান ব্লগ

চাপ, অতিমাত্রায় এন্টিবায়োটিক সেবন করি। এই অপকারী ব্যাক্টেরিয়া গুলো যখন আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে উপকারী ব্যাক্টেরিয়ার চেয়েও বেশি পরিমানে থাকে তখন ডায়েরিয়া, দূর্বলতা, ইউনারি ইনফেকশন সহ নানান জটিলতার সৃস্টি হয়। আমরা যদি পরিমিত এই প্রোবায়োটিক ব্যাক্টেরিয়া সমৃদ্ধ খাবার খাই তাহলে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাকের অনেক অসুখ থেকেই আমরা রেহাই পেতে পারি। দ্বিতীয়ত হলো এরা আমাদের ইমুনো সিস্টেম শক্তিশালী করনের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে ন্যাচারাল কিলার সেলের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে এই সিস্টেমকে শক্তিশালী করে তুলে ফলে অটোইমুনো ডিজিজ থেকে হোস্ট খুব সহজে রক্ষা পায়।



চিত্র ২৪.১: প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া। সূত্র: Get Healthy Stay Healthy

বর্তমান সময়ে একটি প্রচলিত সমস্যা হচ্ছে স্থূলতা। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত পরিমাণে চর্বি বা মেদ শরীরে জমাকেই স্থূলতা বা মুটিয়ে যাওয়া বলে। একে বিভিন্ন রোগের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়। বিভিন্ন কারণে মানুষের শরীর মেদবহুল হয়ে উঠে। যেমনঃ অধিক ক্যালরি গ্রহণ, উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার যেমন, চকলেট, বার্গার, কোমল পানীয়, আইসক্রিম ইত্যাদি খাবার অধিক পরিমাণে গ্রহণ, খেলাধুলা এবং শারীরিক ব্যায়ামের অভাব, হরমোন জনিত সমস্যা ও পারিবারিক ও বংশগত কারণ। উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশেও স্থূলতার হার বাড়ছে প্রতিনিয়ত। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে ২০১৬ সালে ছেলেদের মধ্যে স্থূলতার হার ছিল ৩ শতাংশ আর মেয়েদের মধ্যে ২ দশমিক ৩ শতাংশ। যা ১৯৭৫ সালে ছিল মাত্র ০ দশমিক ০৩ শতাংশ। স্থূলতা বৃদ্ধি পেলে

স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন রোগের সম্ভাবনা দেখা দেয়, বিশেষত হৃদরোগ, দ্বিতীয় পর্যায়ের ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়া, হাইপারইউরি-সেমিয়া (Hyperuricemia), গেঁটে বাত সহ নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে স্থূলতা থেকে।

আমরা যদি দেহের চাহিদার থেকে বেশি পরিমাণে প্রোটিন খেয়ে থাকি বা খাবারে যদি এলকোহল জাতীয় খাবারের পরিমাণ বেশি থাকে, তা থেকে দেহে পিউরিন নামক নন এসেনসিয়াল এমাইনো এসিড তৈরি হয়। এই পিউরিনের শেষ উৎপাদন (এনডপ্রডান্ট) হিসেবে ইউরিক এসিড তৈরি হয়। এই ইউরিক এসিড প্রথমে রক্তে চলে যায়। সেখান থেকে কিডনির মাধ্যমে প্রস্রাবের সঙ্গে দেহ থেকে বের হয়ে যায়। রক্তে যদি ইউরিক এসিডের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি পায় এই অবস্থাকে বলা হয় হাইপারইউরিসেমিয়া। এই অতিরিক্ত ইউরিক এসিড সৃক্ষ স্কটিক (ক্রিস্টাল) আকারে জয়েন্টের মধ্যে বিশেষ করে পায়ের আঙ্গুলে ব্যথা সৃষ্টি করে। এ ছাড়া আমাদের দেহের শ্বেত কণিকা এই ইউরিক এসিড স্ফটিককে ফরেন বডি মনে করে আক্রমণ করে। ফলে বিভিন্ন জয়েন্টে ব্যথা হয় বা ফুলে যায়। এই অবস্থাকে টোফেস বলে। প্রথম অবস্থায় শুধু পায়ে ব্যথা হয়। আন্তে আন্তে এর তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পা ফোলা, হাঁটু ও হাঁটুর জয়েন্টে ব্যথা হয়। ফলে ইউরিক এসিড আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁটতেও সমস্যা হয়। হাইপারইউরিসেমিয়ার কারণে শরীরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে। যেমন: বাত, কিডনিতে পাথর, কিডনি অর্কাযকর হওয়া, উচ্চরক্তচাপসহ নানা ধরনের রোগ হতে পারে।

স্থূলতা হ্রাসের জন্য বাজারে প্রচলিত ঔষুধের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকায় বিকল্প সমাধান হিসাবে প্রোবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে। সম্প্রতি আমেরিকান কলেজ অফ নিউট্রিশন জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা যে, তাইওয়ানের গ্রেপ কিং বায়োটেক কোম্পানির একদল গবেষক শরীরের স্থূলতা নিয়ন্ত্রণে Lactobacillum plantarum GKM3 প্রোবায়োটিক ব্যবহার করে। তাদের প্রাথমিক গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, Lactobacillum plantarum GKM3 কার্যকরীভাবে অতিস্থূলতা প্রানীর

শরীরে ইউরিক এসিডের পরিমাণ কমিয়ে স্থূলতা হ্রাসে সাহায্য করে। যে ভাবে এন্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্ট ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে তাতে করে অনেক এন্টিবায়োটিক এক সময় অকার্যকর হয়ে যাবে, বিকল্প চিকিৎসা হিসাবে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা প্রোবায়োটিক ট্রিটমেন্টের উপর জাের দিচ্ছেন। নিয়মিত যেসকল খাবর খেয়ে খুব সহজে আমরা এই সকল ব্যাক্টেরিয়া গুলাকে পেতে পারি সেগুলাে হলাে যে কােন দুগ্ধ জাত পণ্য যেমন পনির, দিধ, দুধ ইত্যাদি। আমরা চাইলে নির্দিষ্ট রােগের জন্য প্রকৃতি থেকে নির্দিষ্ট প্রোবায়ােটিক আলাদা করে বাজারজাত করতে পারি, এতে করে দেশের চিকিৎসা ব্যায় অদূর ভবিষ্যতে অনেকাংশেই কমে যাবে।



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

§ 20



ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স: নিউটনের গতিসূত্রের ইতিহাস এবং স্পেসটাইম ডায়াগ্রাম

সৈয়দ ইমাদ উদ্দিন শুভ

পর্ব ১:

নিউটনের গতিসূত্রের ইতিহাস

মরা স্কুলে ক্লাস নাইনে ওঠার পরপরই নিউটনের গতিসূত্রের সাথে পরিচিত হই। ১৬৮৭ সালে প্রকাশিত Philosophiae Naturalis Principia Mathematica বইতে ব্রিটিশ বি-জ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন তিনটি গতিসূত্র প্রকাশ করেন, যা পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্ববহ একটি ঘটনা।

নিউটনের তিনটি গতিসূত্রই মূলত বিন্দু ভর (point mass) এর জন্য। বিন্দু ভর মানে এর কোন সাইজ নেই, এটি একটি বিন্দু যার ভর আছে। পুরো ব্যাপারটাই তাত্ত্বিক, কেননা এরকম কোন কিছু আমরা আশে পাশে দেখি না। কিন্তু এই বিন্দু ভরের একটা গাণিতিক সুবিধে আছে। একটা বড় বস্তুতে বল প্রয়োগ করলে কোথায় বল প্রয়োগ করেছি তার ওপর সবকিছু নির্ভর করে। বলের প্রভাবে অনেক সময় বস্তু ঘুরে, অনেকসময় বিকৃত হয়, এরকম অনেকরকম ঝামেলা আছে। বিন্দু ভরে এমন ঝামেলা নেই। আপনি সরাসরি বল প্রয়োগ করবেন, আর কোন ঝামেলা নেই।

তো পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, তাহলে নিউটনের সূত্র ব্যবহার করে লাভ কী? লাভ আছে বৈকি। আপনি চাইলে যেকোন বৃহৎ বস্তুকে অনেকগুলো বিন্দু ভরের সমষ্টি ভাবতে পারেন। এরপর গণিত ব্যবহার করে যেকোন বস্তুর জন্য গতিসূত্রের জেনারেল আকার দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারেন। যাইহোক, আমি লেখার সুবিধার্থে বস্তু বলতে এই লেখায় বিন্দু ভরই বুঝাবো।

নিউটনের গতিসূত্র তিনটি কিন্তু নিউটনের একার আবিষ্কার নয়। নি-উটনের গতির প্রথম সূত্রটি মূলত গ্যালিলিও এর, নিউটনও তাঁকেই বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

প্রথম সূত্রের পুরো ক্রেডিট দেন। এজন্য নিউটনের প্রথম সূত্রকে অনেকসময় গ্যালিলিও এর জড়তার সূত্র বলা হয়। এই সূত্র বলে কোন বস্তুর ওপর বাহ্যিক বল প্রয়োগ না করলে তার বেগের পরিবর্তন হয় না। এর মানে হলো বস্তুর জড়তা (inertia) নামক একটি ধর্ম আছে, যা বল প্রয়োগ না করলে বস্তু ধরে রাখে। বস্তু যদি স্থির থাকে তবে বল প্রয়োগ না করলে বস্তু চিরকালই স্থির থাকবে। আবার বস্তু গতিশীল হলে কোন বল না থাকলে চিরকালই একই বেগে চলতে থাকবে। এখান থেকে আমরা বল আসলে কী তার ধারণা পাই। বল হলো তা যা বস্তুর গতীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।



চিত্র ২৫.১: গ্যালিলিও জড়তার সূত্র এবং জড় প্রসঙ্গ কাঠামো এর ধারণা দেন

নিউটনের প্রথম সূত্র বা জড়তার সূত্র কিন্তু সকল প্রসঙ্গ কাঠামোতে (Reference frame) খাটে না। প্রসঙ্গ কাঠামো কী? প্রসঙ্গ কাঠামো মানে হলো আমরা যেটা সাপেক্ষে গতি মাপছি, যার সাপেক্ষে আমি স্থির। উদাহরণস্বরূপ, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে রাস্তা আমার সাপেক্ষেস্থির। পাশে কোন বাস গেলে তার গতি আমি এই রাস্তা সাপেক্ষেই মাপবো। এই রাস্তা তাহলে রেফারেন্স ফ্রেম। যে বাসে বসা তার কাছে বাস আবার রেফারেন্স ফ্রেম। এখন কথা হলো এই জড়তার সূত্র স্বখানে খাটবে কিনা।

ধরা যাক আপনি একটি চলমান বাসের ভেতরে বসা। বাস যদি

হঠাৎ ব্রেক চাপে তাহলে আপনি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বেন। এখন আপনি বাসের ভেতর বাস সাপেক্ষে স্থির ছিলেন। আপনার ওপর কোন বল প্রয়োগ করা হয় নি, তাও আপনি কেন সামনে ঝুঁকে পড়লেন? নিউটনের প্রথম সূত্র অনুসারে আপনার ওপর কোন বাহ্যিক বল না থাকলে আপনার আজীবন স্থির থাকার কথা। তাহলে কি নিউটনের প্রথম সূত্র ভুল?

আসলে নিউটনের প্রথম সূত্র সব ফ্রেমে খাটে না। যেসব ফ্রেমে এই জড়তার সূত্র খাটে তাকে আমরা বলি জড় প্রসঙ্গ কাঠামো বা সংক্ষেপে ইনারশিয়াল ফ্রেম (inertial frame), আবার অনেকসময় 'গ্যালিলিয়ান ফ্রেম'ও ডাকা হয়। যেসব ফ্রেমে ত্বরণ হয়, সেসব ফ্রেমে নিউটনের সূত্র খাটে না।

এখন আপনি যদি আপনার নন-ইনারশিয়াল ফ্রেমে জোর করে নিউটনের গতিসূত্র খাটাতে চান, তবে আপনাকে কিছু কল্পিত বলের আশ্রয় নিতে হবে। যেমন ব্রেক চাপার সময় আপনি একটি বল কল্পনা করতে পারেন, যা আপনাকে সামনের দিকে ধাক্কা দিচ্ছে। আপনি জানেন, এই বল শুধু আপনার ফ্রেমেই আছে আর আর কাউকে এই বলের কথা বললে সে বিশ্বাস করবে না। এই কল্পিত বলগুলোকে বলা হয় ইনারশিয়াল ফোর্স।

আমরা জানি পৃথিবী তার নিজ অক্ষের চারদিকে লাটিমের মত ঘুরছে। ঘুরলে বেগের দিক পরিবর্তন হয়। বেগ একটি ভেক্টর রাশি, কাজেই এর দিক পরিবর্তন হবার মানে প্রতি মুহূর্তে বেগ পরিবর্তন হওয়া। কাজেই এখানে ত্বরণ হচ্ছে। এর ফলে পৃথিবী কোনমতেই ইনারশিয়াল ফ্রেম নয়। কাজেই, পৃথিবী যে ঘুরছে এটা আমরা পৃথিবীতে বসেই বুঝে ফেলতে পারি। পৃথিবীর ফ্রেমেও কিছু ইনারশিয়াল ফোর্স কাজ করছে। আমরা সেগুলো চাইলেই মাপতে পারি।

কয়েকটা উদাহরণ দেই, আমরা সাধারণভাবে কোন বস্তুকে কোণাকোণি

নিক্ষেপ করলে বস্তুকে প্যারাবোলিক পথে যেতে দেখি। আমরা সাধারণত দেখি এই গতিপথ একই সমতলে থাকে।



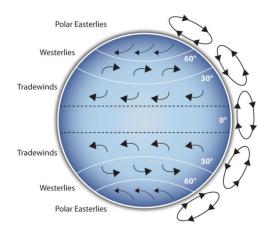
চিত্র ২৫.২: এক্ষেত্রে ফুটবলের ভরকেন্দ্র একই সমতলে অবস্থান করে

কিন্তু কী হয় যদি বেশ বড় পরিসরের বেগ দেয়া হয়? সেক্ষেত্রে এই গতিপথ আর একই সমতলে থাকে না। পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য দূরপাল্লার মিসাইলগুলোতে এক ধরনের ইনারশিয়াল ফোর্স কাজ করে, যাকে বলা হয় কোরিওলিস ফোর্স। এই বলের হিসেব ঠিকভাবে বিবেচনায় না আনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের অনেক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিল। তারা দক্ষিণ আমেরিকার কাছে জার্মান শিপে আক্রমণ করতে হাজার হাজার মিসাইল ছুঁড়েছিল, যেগুলো হিসেবের এই মারাত্মক ভুলের জন্য সাগরে পতিত হয়!

এই কোরিওলিস বলের জন্যই দুই গোলার্ধে ঘূর্ণিঝড় দুই দিকে ঘোরে।

অনেক প্রথমসূত্র নিয়ে আলোচনা হলো। এই সিরিজের পরের লেখা-গুলোতে এটি নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা থাকবে। বিশেষত দুটি গ্যালিলিয়ান ফ্রেমের মাঝে সম্পর্ক, যা গ্যালিলিয়ান ট্রাঙ্গফর্মেশন নামে পরিচিত, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে। এখন নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের দিকে যাওয়া যাক।

নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রটি মূলত এরিস্টটলের এর ধারণার পরিবর্তিত রূপ। এরিস্টটল মনে করতেন কোন বস্তু যতো বেশি ভারী তাকে সরাতে ততো বেশি বল লাগে। এরিস্টটল ভাবতেন বস্তুর স্বাভাবিক



চিত্র ২৫.৩: বাতাসের ঘুর্ণনের দিক দুই মেরুতে দুই রকম

প্রবৃত্তি হলো স্থির থাকা। তাই কোন বস্তু যতো বেশি বেগে গতিশীল থাকতে চায় তার ততো বেশি বল লাগবে। এরিস্টটলের এই ধারণা আমাদের কমনসেন্স এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু বিজ্ঞানে একটি কথা আছে:

Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.

Albert Einstein

এরিস্টটল গাণিতিক কোন নোটেশন জানতেন না। জানলে তাঁর গতিসূত্র অনুসারে বল একইসাথে ভর ও বেগ, তথা ভরবেগের সমানুপাতিক হতো। এরিস্টটল পিচ্ছিল বরফে গড়িয়ে পড়া কোন বস্তুর গতি হয়তো দেখেন নি। তাহলে তিনি বুঝতে পারতেন একবার পিচ্ছিল বরফে যা গতিশীল হয় তাকে সহজে থামানো যায় না।

কাজেই স্থিতি, গতি দুটোই বরং স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই জায়গায় গ্যালিলিও কোন ভুল করে নি। আর এখান থেকেই নিউটন বুঝে গেলেন, বলের কাজ ভরবেগ বজায় রাখা নয়, বরং ভরবেগ পরিবর্তন বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



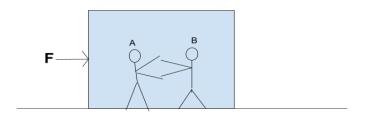
চিত্র ২৫.৪: পিচ্ছিল বরফে গড়িয়ে পড়লে সহজে থামানো যায় না

করা। যত দ্রুত যত বেশি ভরবেগ পরিবর্তন করতে চাই, তত বেশি বল দিতে হবে। আর এই জায়গাটাতেই নিউটন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেন। তিনি বলেন কোন বিন্দুভরের ওপর প্রযুক্ত বল তার ভরবেগের পরিবর্তনের হারের সমানুপাতিক।

এখন নিউটন যদি তাঁর গতিসূত্র বিন্দু ভরের জন্য না দিয়ে একটি সিস্টেমের ওপর দিতেন, তাহলে কিছু অতিরিক্ত সুবিধে হতো। আমরা বাহ্যিক বলের একটা ধারণা পেতাম। আপনি কখনো খেয়াল করেছেন, ঠেলাগাড়িতে ভেতরে বসে যতোই নাচানাচি করা হোক, গাড়ি চলেই না! অবশ্যই বাইরে থেকে কোন না কোন বল দিতে হয়। কোন সিস্টেমের ভেতর যাই থাকুক, এরা নিজেদের ভেতর যতোই সংঘর্ষ করুক, পুরো সিস্টেমের বাইরে থেকে বল না দিলে পুরো সিস্টেম এর মোট জড়তার পরিবর্তন হবে না। কাজেই বাহ্যিক বলই কেবল কোন সিস্টেমের মোট ভরবেগের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যদি বাহ্যিক বল না দেয়া হয় তাহলে সিস্টেমের মোট ভরবেগ পরিবর্তিত হবে না, কাজেই মোট ভরবেগ অপরিবর্তিত থাকবে। এটাই কিন্তু ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র!

আমরা কিন্তু বেশ চমৎকার একটি বিষয় দেখে ফেললাম! বস্তু কণার বদলে পুরো সিস্টেম নিয়ে কাজ করলে দ্বিতীয় সূত্র থেকেই ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র চলে আসে। ১৬৭০ সালে আরেক ব্রিটিশ গণিতবিদ ওয়ালিস ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র আবিষ্কার করেন, এবং তা নিউটনের জানা ছিল। কিন্তু তিনি বিন্দু ভর দিয়ে হিসেব নিকেষ করায় বুঝতেই পারেন নি যে এটি আসলে দ্বিতীয় সূত্রেরই একটি অনুসিদ্ধান্ত।

নিউটন এটা বুঝতে পারছিলেন, সিস্টেমের ভেতর কিছু একটা ঘটায় বাহ্যিক বলই কেবল সিস্টেমের ভরবেগ পরিবর্তন করে, এবং অভ্য-ন্তরীণ বলগুলো কাটাকাটি হয়ে যায়। তাই তিনি তাঁর তৃতীয় সূত্রটি দেন, যেখানে বলা হয়- "কোন বস্তু অন্য কোন বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করলে সেও বিপরীত দিকে একটি সমমানের বল পায়"। নি-উটন তাঁর তৃতীয় সূত্রের মাধ্যমেই ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র প্রমাণ করেন।

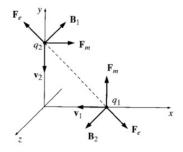


চিত্রে A ও B একটি বাক্সে বন্দী। বাক্সের ভেতরে থাকা A, B মারামারি করছে। এখানে A, B-কে যা বল দিবে তা কেবল B অনুভব করবে। আর তার প্রতিক্রিয়া বল কাজ করবে A এর ওপর। আবার B, Aকে যা বল দিবে তা কেবল A পাবে, আর প্রতিক্রিয়া বল পাবে B।

পুরো বাক্স কিন্তু কোন বাহ্যিক বল পাবে না। এমনকি যদি বাক্সের দেয়ালে A, B ধাক্কাও দেয় তাহলেও কোন লাভ হবে না। বাক্স তখনই সরবে যখন বাক্সের বাইরে থেকে F ফোর্স দেয়া হবে। কেননা পুরো বাক্স হলো সিস্টেম, এবং এর ভেতরে সব বলের জন্যই একটা করে প্রতিক্রিয়া বল আছে এবং এরা সমান ও বিপরীত। তাই পুরো বাক্সকে সিস্টেম ধরা হলে এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া একই জায়গায় ক্রিয়া করে এবং কাটাকাটি গিয়ে কোন বাহ্যিক বল থাকে না।

কিন্তু যখন আমি শুধু A বা B নিয়ে কথা বলবো তখন কোন বল কাটা যাবে না, কেননা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া একইসাথে শুধু A বা শুধু B তে কাজ করে না। এইটুকু ঠিকমত বুঝে গিয়ে থাকলে আপনি নিউটনের সূত্র বেশ ভালোভাবে বুঝে ফেলেছেন!

নিউটনের তৃতীয় সূত্র বর্তমানে আর কোথাও ব্যবহৃত হয় না। কেননা একে তো এটি আসলে জেনারেলাইজড দ্বিতীয় সূত্রের একটি অনুসিদ্ধান্ত, তার ওপর ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি বরং সবক্ষেত্রে কাজ করে। যেমন আপনি যদি হালকা পাতলা ইলেক্ট্রোডিনামিক্স জানেন তবে হিসেব করে দেখতে পারেন, দুটি চার্জের মধ্যকার চুম্বক বল পরস্পর বিপরীতই হয় না!



যাদের কীভাবে এই দিক বের করা হলো তা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে তাদের জন্য আমি সামান্য গণিত ব্যবহার করবো। আমি ধরে নিচ্ছি আপনার ক্রস গুণনের বেসিক $(\vec{A} imes \vec{B} = -\vec{B} imes \vec{A}$ এবং $\hat{\imath} imes \hat{\jmath} = \hat{k}, \ \hat{\jmath} imes \hat{k} = \hat{\imath}, \ \hat{k} imes \hat{\imath} = \hat{\jmath})$ জানেন।

কোন নির্দিষ্ট সময়ে দুটি একক ধনাত্মক চার্জ q_1,q_2 যথাক্রমে $-\hat{\imath}$ ও $-\hat{\jmath}$ বরাবর যাচ্ছে। তাহলে q_1 থেকে q_2 এর দূরত্ব ভেক্টর \vec{r}_{12} কাজ করছে $(-\hat{\imath}+\hat{\jmath})$ বরাবর। আর q_2 থেকে q_1 এর দূরত্ব ভেক্টর \vec{r}_{21} কাজ করে $-\vec{r}_{12}$ বা $(\hat{\imath}-\hat{\jmath})$ বরাবর। তাহলে q_1 এর জন্য q_2 এর ওপর ম্যাগনেটিক ফিল্ড কাজ করে q_1 এর বেগ এবং \vec{r}_{12}

এর ক্রসগুণনের দিক বরাবর (যেহেতু উভয় চার্জ ধনাত্মক)। তাহলে, q_1 এর জন্য q_2 এর ওপর ম্যাগনেটিক ফিল্ড \vec{B}_{12} কাজ করে $(-\hat{\imath}) imes (-\hat{\imath} + \hat{\jmath}) = -\hat{k}$ বরাবর।

একইভাবে q_2 এর জন্য q_1 এর ওপর ম্যাগনেটিক ফিল্ড \vec{B}_{21} কাজ করে $(-\hat{\jmath}) \times (\hat{\imath} - \hat{\jmath}) = \hat{k}$ বরাবর। যেহেতু উভয় চার্জ ধনাত্মক তাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড \vec{B} এর অধীনে q চার্জ ফোর্স পায় q এর বেগ ও \vec{B} এর ক্রসগুণের দিকে। কাজেই q_2 চার্জ ফোর্স পাবে $(-\hat{\jmath}) \times (-\hat{k}) = \hat{\imath}$ বরাবর আর q_1 চার্জ ফোর্স পাবে $-\hat{\imath} \times (\hat{k}) = \hat{\jmath}$ বরাবর।

তার মানে দাঁড়ালো চুম্বক বল এক্ষেত্রে বিপরীত দিকে নয় বরং লম্বদিকে কাজ করছে! আসলেই এইক্ষেত্রে নিউটনের তৃতীয় সূত্র না খাটলেও ভরবেগের নিত্যতা ঠিকই কাজ করে। বিস্তারিত আলোচনায় যাব না, তবে এইক্ষেত্রে আসলে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন হয় যা হিসেব মিলাতে যে ভরবেগ লাগে তা বহন করে।

পর্ব ২:

গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফর্মেশন ও স্পেসটাইম ডায়াগ্রাম

আগের পর্বে আমরা নিউটনের গতিসূত্র কীভাবে আসলো, সূত্রগুলো কখন খাটে এসব নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা এটা দেখেছি যে নিউটনের সূত্রগুলো একটা বিশেষ ফ্রেমে খাটে, যাদের ইনারশিয়াল ফ্রেম বা গ্যালিলিয়ান ফ্রেম বলা হয়। আজকে আমরা এই বিশেষ ফ্রেম নিয়ে সবিস্তর আলোচনা করবো। আর এর সাথে আমরা আজকে স্পেসটাইম ডায়াগ্রামের সাথে পরিচিত হবো। ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স সিরিজের শেষের দিকে আমরা যখন আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের সাথে পরিচিত হবো, তখন আমাদের এই লেখার ধারণা দারুণ কাজে দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

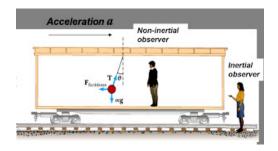
ধরুন, আপনি একটা ট্রেনে বসে আছেন, আপনি কিন্তু ট্রেনের ভেতর আপনার ট্রেন সাপেক্ষে স্থির। চারদিক অন্ধকার। আপনি বাইরে তাকালে শুধু অন্য একটা ট্রেন দেখতে পারবেন, এর বেশি কিছু না। আপনি তাকিয়ে দেখলেন বাইরের ট্রেনটি চলছে। আপনাকে বলা হলো এই দুটো ট্রেনের ভেতর কেবল একটা চলছে (বাহিরের কোন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষে)। এখন আপনি বলুন তো আসলে কোন ট্রেনটি চলছে? আপনার ট্রেন নাকি আপনি বাইরে তাকালে যে ট্রেনটা দেখছেন? এটা কি বলা সম্ভব?

আপনি হয়ত চিন্তা করে বলবেন একটা উপায় আছে বৈকি! আপনার ট্রেন যদি তার বেগ পরিবর্তন করে তখন আপনি বুঝতে পারবেন, কেননা যদি আপনার ট্রেন বেগ বাড়ায় তবে আপনি জড়তার জন্য পিছনের দিকে ঝুঁকে পড়বেন! আর যদি ট্রেন তার বেগ কমায় তবে আপনি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বেন! এখন এইসকল ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারবেন যে আপনার ট্রেন চলছে এটা নিশ্চিত!

এখন এই অবস্থায় আরেকটু চিন্তা করুন। যখন আপনার ট্রেনে বেগ পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ ত্বরণ হয় তখন আপনি সামনে বা পিছনের দিকে হেলে পড়লেন! আপনি তো স্থির ছিলেন আপনার ট্রেন সাপেক্ষে! আপনাকে কেউ ধাক্কাও দেয় নি! নিউটনের ফার্স্ট ল' বলে আপনি স্থির থাকলে বাহির থেকে আপনাকে কোন ফোর্স না দিলে আপনি সারাজীবন স্থির থাকবেন। কিন্তু এইক্ষেত্রে কি নিউটনের ফার্স্ট ল' খাটলো? উত্তর হলো– না!

তার মানে যেসব রেফারেন্স ফ্রেমে ত্বরণ হয় এদের বেলায় নিউ-টনের ফার্স্ট ল' খাটে না! আর এদের বলা হয় 'নন-ইনারশিয়াল ফ্রেম'।

আবার আপনার ট্রেনে ফিরে যাওয়া যাক। ধরা যাক, আপনার ট্রেনে এবার আপনি সবসময় নিউটনের ফার্স্ট ল' খাটতে দেখেন। তাহলে আপনার ট্রেন এখন একটা ইনারশিয়াল ফ্রেম। এবার আপনি বাইরে



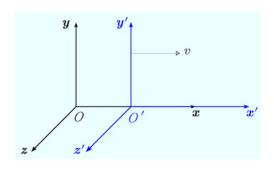
চিত্র ২৫.৫: নিউটনের সূত্র সবসময় ইনারশিয়াল ফ্রেম থেকে খাটাতে হয়

তাকিয়ে দেখলেন অন্য ট্রেনটিও সমবেগে চলছে। এবার বলুন তো কোনটা আসলে গতিশীল? আপনি যতোই চেষ্টা করুন, এইবার কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারবেন না। তার মানে দাঁড়ালো, এই দুইটা ফ্রেম একই বৈশিষ্ট্যের। দুটো ফ্রেমের মাঝে কোনটা আসলে সমবেগে চলছে কোনটা আসলে স্থির সেটা কোনভাবেই বলা সম্ভব না। কাজেই এই ধরনের ফ্রেমগুলো, অর্থাৎ ইনারশিয়াল ফ্রেমে প্রকৃত সমবেগ বা স্থির বলাটা আদৌ কোন অর্থবহন করে না! কেননা পরম ফ্রেম বলতে কিছু নেই। পুরো গতিই আপেক্ষিক, তাই যে যেই ফ্রেমে আছে সে সেই ফ্রেমকেই স্থির ভাবে ও অপর ফ্রেমকে ভাবে গতিশীল। এখান থেকে বুঝা যায় সকল ইনারশিয়াল ফ্রেমই একজাতীয়। ইনারশিয়াল ফ্রেমে আপনি সরাসরি নিউটনের ল' খাটাতে পারেন। যেহেতু সব ইনারশিয়াল ফ্রেম একই ধরনের, যে যে নিজের সাপেক্ষে স্থির ও অন্যকে গতিশীল ভাবে, তাই যেকোন ইনারশিয়াল ফ্রেমেই ফ্রিজক্সের সব সমীকরণ একই আকারের হয়।

'ইনারশিয়াল ফ্রেমগুলোতে ফিজিক্সের সূত্রগুলো একই আকারের', এটা গ্যালি-লিও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবন। আইনস্টাইনও তার আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে এটিকে স্বীকার্য হিসেবে নেন।

এখন চাইলেই আপনি আপনার গ্যালিলিয়ান ফ্রেমে বসে আপনার সাপেক্ষে সমবেগে চলা অন্য একটি গ্যালিলিয়ান ফ্রেম কী মাপছে সেটা বলে দিতে পারেন! এর নামই হলো গ্যালিলিওর রূপান্তর।

ধরা যাক, আপনি S ফ্রেমে আছেন (যেমন প্লাটফর্ম)। আপনার সাপেক্ষে S' ফ্রেম (ট্রেন, যেখানে আপনার বন্ধু বসে আছে) +x অক্ষ বরাবর v বেগে চলছে। t=t'=0 সময়ে উভয় ফ্রেম মূলবিন্দুতে আপতিত ছিল।



চিত্র ২৫.৬: এখানে একটা আরেকটা সাপেক্ষে সমবেগে চলছে

এখন t সময়ে আপনার বন্ধু vt পরিমাণ সামনে এগিয়ে যাবে। কাজেই আপনি x অক্ষ বরাবর যা মাপবেন, তা আপনার বন্ধু vt পরিমাণ কম মাপবে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই y,z অক্ষ বরাবর একই মাপবে। তাহলে আমরা বলতে পারি.

$$x' = x - vt, y' = y, z' = z$$

এবার আমরা দেখি আপনার বন্ধু আপনাকে কী মাপতে দেখবে। আপনার বন্ধু দেখবে আপনি তার -x' অক্ষ বরাবর v বেগে যাচ্ছেন। কাজেই আপনি আপনার দেখা সমীকরণগুলোতে v এর জায়গায় -v, আর (x,x'),(y,y'),(z,z'),(t,t') অদল বদল করে বসিয়ে দিলেই আপনার বন্ধু আপনাকে কী মাপতে দেখছে তা বের হয়ে যাবে। সূতরাং, x=x'+vt'

এবার আমরা আগের x' এর মান বসালে পাই, x=(x-vt)+vt'

যেহেতু v অশুন্য (দুটি ফ্রেম আলাদা), কাজেই $t=t^\prime,$ তার মানে উভয় ফ্রেমে সময়ের গতি একই।

গ্যালিলিওর রূপান্তর আমাদের আর কী বলতে চায়?

ধরি, S ফ্রেমে +x অক্ষ বরাবর কোন কিছুর বেগ u মাপলো। আমরা দেখতে চাই S' ফ্রেম তার বেগ কী মাপবে? ধরি সেটা u', আমরা u ও u' এর সম্পর্ক বের করতে চাই।

ক্যালকুলাসের ভাষায় $u=\frac{dx}{dt}$ আর $u'=\frac{dx'}{dt'}=\frac{dx'}{dt}\frac{dt}{dt'}$ আমরা জানি, x'=x-vt, কাজেই, $\frac{dx'}{dt}=\frac{dx}{dt}-v=u-v$ আর

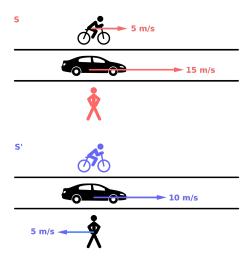
t=t' বা $\frac{dt}{dt'}=1$ কাজেই, u'=u-v, যা S' ফ্রেম সাপেক্ষে আপেক্ষিক বেগ (relative

কাজেই, u'=u-v, যাঁ S' ফ্রেম সাপেক্ষে আপেক্ষিক বেগ (relative motion)।

আমরা বাস্তবে এটি অনুভব করি। যেমন ধরুন আপনি প্লাটফর্মে বসা। আপনার বন্ধু +x অক্ষ বরাবর চলস্ত ট্রেনে। আপনার সামনে দিয়ে অন্য কোন ট্রেন যদি +x অক্ষ বরাবর যায়, আপনার বন্ধু নিশ্চিতভাবে তার বেগ কম মাপবে (নিজের বেগ বিয়োগ হবে)। আবার অন্য একটা ট্রেন -x অক্ষ বরাবর গেলে আপনার বন্ধুর মনে হবে ট্রেনের বেগ অনেক বেশি! আমরা ট্রেনে বসে উল্টোদিকে কোন ট্রেনকে যেতে দেখলে এরকমই বেশি বেগে চলতে দেখি, যদিও আমরা জানি এটি আসলে অতোটা দ্রুত নয়!

এবার ধরা যাক আপনি প্লাটফর্ম থেকে +x অক্ষ বরাবর কোন টর্চ মারলেন। আলোর বেগ আপনি মাপবেন $c=299792458\,{
m ms}^{-1},$ আপনার বন্ধুর বেগ যদি আলোর বেগের অর্ধেক হয় তাহলে গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফর্মেশন অনুসারে আপনার বন্ধু মাপবে $c'=c-\frac{c}{2}=\frac{c}{2}$ ।

কিন্তু আমরা পরে দেখবো যে আলোর বেগ মোটেও পর্যবেক্ষক নির্ভর নয়, যা আপেক্ষিকতার অন্যতম স্বীকার্য! আর এটি ঠিক রাখতে গিয়েই আমাদের গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফর্মেশনকে পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু



চিত্র ২৫.৭: এখানে S ফ্রেম হলো রাস্তায় দাঁড়ানো লোক, আর S' হলো সাইকেলে বসা লোক

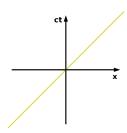
বাস্তবে আমরা অতো গতিতে চলতে পারি না। তাই আমাদের কাছে আপাতভাবে গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফর্মেশনের ভুল ধরা পড়ে না!

গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফর্মেশনের স্পেসটাইম ডায়াগ্রাম

আমরা এটা বুঝতে পারি যে সময় একটি অক্ষ্, কেননা কোন ঘটনা (event) বর্ণনা করতে একই সাথে স্থানাংক ও সময় লাগে। যেমন আমরা বলতে পারি অমুক সময়ে অমুক স্থানে কোন ঘটনা ঘটেছে। এইক্ষেত্রে আমরা তাই ঘটনাকে জ্যামিতিকভাবে বিন্দু হিসেবে দেখাতে স্প্রেসটাইম ডায়াগ্রামের সাহায্য নেই। আইনস্টাইনের শিক্ষক মিনকোয়াস্কি প্রথম এই ডায়াগ্রাম দিয়ে আপেক্ষিকতার জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন বলে একে মিনকোয়াস্কি ডায়াগ্রামও বলে।

সময়কে চতুর্থ মাত্রা ধরলে চারটি মাত্রা আসলে আমাদের দেখানো সম্ভব

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র ২৫.৮: S ফ্রেমের স্পেসটাইম ডায়াগ্রাম

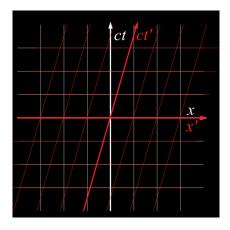
নয়। তাই আমরা এই ডায়াগ্রামে শুধু x,t অক্ষ দেখাবো। আমরা জানি অক্ষ এর মাত্রা হয় দৈর্ঘ্য, যেহেতু শূন্যস্থানে আলোর বেগ ধ্রুবক (আমরা যদিও এখনো এটি নিয়ে বিস্তারিত বলি নি) তাই সময়ের সাথে আলোর বেগ গুণ করা হয়েছে। এর একটা সুবিধেও আছে। কোন বস্তু v বেগে t সময়ে x দূরত্ব গেলে $x=vt=\frac{v}{c}(ct)$,আমরা $\beta=\frac{v}{c}$ সংজ্ঞায়িত করলে তা হয় $x=\beta(ct)$, কাজেই সমবেগে গেলে বেগ ct অক্ষের সাথে $tan^{-1}(\beta)$ কোণ তৈরি করে।

আলোর বেলায় eta=1 বলে তা স্পেসটাইম ডায়াগ্রাম ct এর সাথে 45° কোণ করে। অন্যান্য বেগের বেলায় কোণ আরো কম হয়।

এখন বলুন তো, স্পেসটাইম ডায়াগ্রামে x অক্ষের সমীকরণ কী? অবশ্যই ct=0 আর একইভাবে ct অক্ষের সমীকরণ x=0। এবার বলুন তো স্পেসটাইম ডায়াগ্রামে S' এর অক্ষণ্ডলো দেখতে কেমন হবে?

x' এর সমীকরণ ct'=0, যেহেতু t'=t, কাজেই x' অক্ষ x অক্ষের সাথে মিলে যাবে। আর ct' এর সমীকরণ হলো x'=0, আর $x'=x-\beta(ct),$ কাজেই ct' অক্ষের সমীকরণ হবে $x=\beta(ct)$ ।

তার মানে কেবল t^\prime অক্ষ এক্ষেত্রে ঘুরে গিয়েছে! ঘুর্ণনের এই



চিত্র ২৫.৯: স্পেসটাইম ডায়াগ্রাম

অসাম্যও আমাদের ধারণা দেয়, কিছু তো একটা গরমিল আছেই! আমরা গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফর্মেশনকে ম্যাট্রিক্স ফর্মে দেখলেও এটা বুঝতে পারি।

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\beta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}$$

মাঝের ট্রান্সফর্মেশন ম্যাট্রিক্সটা দেখলেই একটা প্রতিসাম্যতার অভাব বুঝা যায়! আর আমরা সেটা এই সিরিজের একটা পর্যায়ে ঠিকই জেনে যাব! আজ এখানেই থাকুক।

সবশেষে পাঠকের কাছে কিছু প্রশ্ন

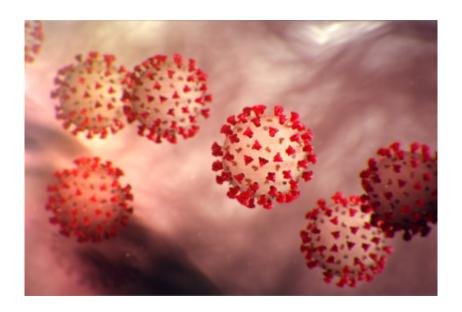
- $\Leftrightarrow S'$ ফ্রেমের স্পেসটাইম ডায়াগ্রামে S ফ্রেমকে দেখতে কেমন লাগবে?
- ৡ আলোর বেগ দুই ফ্রেমে এক রাখতে গেলে স্পেসটাইম ডায়াগ্রাম
 দেখতে কেমন হওয়া প্রয়োজন?

তথ্যসূত্র

- ♦ L. Susskind, G. Hrabovsky. The Theoretical Minimum: What You Need to Know to Start Doing Physics. 2013.
- ♦ J. R. Taylor. Classical Mechanics. 2005.
- ♦ History of Inertia and Momentum Wikipedia.
- ♦ Graham P. Collins. Coriolis Effect: The earth's spin influences hurricanes but not toilets. 2009
 − Scientific American.
- 🗞 ফিচার ছবিসূত্র: Wallpaper Flare.



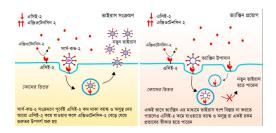
§ ২৬



কোভিড-১৯ টেস্টে নেগেটিভ মানেই বিপদমুক্ত নয়

সৈয়দ মুক্তাদির আল সিয়াম

পনার কোভিড-১৯ এর উপসর্গ বিদ্যমান। টেস্ট করালেন। রিপোর্ট হাতে পেয়ে দেখলেন রিপোর্ট নেগেটিভ। নিঃসন্দেহে খুশি হবেন। খুশিতে বাড়ি ফিরে নির্দ্ধিয়া জড়িয়ে ধরলেন প্রিয়জনদের। দূরত্ব বজায় রেখে চলার প্রয়োজন বোধ করলেন না। দিনকয়েকের মধ্যেই আপনার প্রিয়জনদের উপসর্গ দেখা দিল এবং তাদের টেস্ট রেজাল্ট পজিটিভ আসলো! আপনি আসলে করোনা আক্রান্ত হবার পরেও রেজাল্ট নেগেটিভ এসেছিল, এটাকেই বলা হয় ফলস নেগেটিভ রেজাল্ট। করোনা টেস্টে পজিটিভ আসার চেয়েও ভয়াবহ ফলস নেগেটিভ রেজাল্ট।



আসুন জানার চেষ্টা করি কেন এবং কীভাবে এটি ঘটতে পারে।

- আপনার নমুনাটি ঠিকভাবে সংগ্রহ করা হয়ন। সঠিক মিডিয়য় নমুনাটি রাখা হয়ন।
- ২. আপনার স্যাম্পল থেকে ভাইরাল RNA ঠিকভাবে বের করে আনা (Extraction) হয়নি। অথবা RNA নষ্ট হয়ে গেছে। পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে বের করে আনা RNA এর পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে।
- Real Time Quantitative Reverse Transcription
 Polymerase Chain Reaction সংক্ষেপে Real Time
 qRT-PCR বা rRT-PCR ঠিকভাবে হয়নি।
- ২ এবং ৩ নাম্বার সমস্যা সমাধানের জন্য এক্সট্রাকশন কন্ট্রোল, পজিটিভ কন্ট্রোল, নেগেটিভ কন্ট্রোল, ইনটার্নাল কন্ট্রোল প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের

কন্ট্রোলের ব্যবহার করা হয়। যাতে কোন একটা ধাপে সমস্যা হলে তা ধরা যায়।

আবার, সব rRT-PCR কিটের সংবেদনশীলতা (Sensitivity) সমান না। ভাইরাল জিনোমের সংখ্যা ঘনত্ব কম হলে অনেক কিট ব্যবহারে রেসাল্ট নেগেটিভ আসতে পারে।[১]।

এবার আসি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটিতে। ধরুন উপরের সবকিছুই সঠিকভাবে হয়েছে এবং খুবই অভিজ্ঞ এবং দক্ষ কেউ আপনার টেস্ট করেছে। তারপরেও আপনি ফলস নেগেটিভ ফলাফলপেতে পারেন।

নমুনা হিসেবে upper and lower respiratory specimens (যেন্মন nasopharyngeal ও oropharyngeal swabs, sputum, bronchoalveolar lavage ইত্যাদি) গুলোই মূলত ব্যবহার করা যায়। আমাদের দেশে নাকের ভেতরের দিক থেকে ন্যাসোফ্যারেঞ্জিয়াল অথবা গলার ভেতরের দিক থেকে ওরোফ্যারেঞ্জিয়াল সোয়াব সংগ্রহ করা হয়। rRT-PCR নিঃসন্দেহে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এই দুটো সোয়াবে ভাইরাসের উপস্থিতি সবসময় নাও থাকতে পারে। জার্নাল অব আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, সেন্টার ফর এভিডেন্স বেইজড মেডিসিন, আলজাজিরা ও ন্যাচার জার্নালে প্রকাশিত ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেদনে এই দুই সোয়াবে ৭০% বা তার কম ক্ষেত্রে ভাইরাসের উপস্থিতি নিশ্চিত করা গেছে বলে দাবী করা হয়েছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে লক্ষণ প্রকাশ পাবার ০-৭ দিন তুলনামূলক ভালো কার্যকারিতা দেখালেও দিন বৃদ্ধির সাথে সাথে এই দুই নমুনা থেকে সনাক্ত করার হার কমে গেছে। তবে bronchoalveolar lavage (কুসকুসীয় তরল) এবং Sputum এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো ফলাফল প্রদান করেছে দাবী করা হয়। হ্,৩,৪,৫

বোঝাই যাচ্ছে আক্রান্ত হবার পরে বিভিন্ন ধরণের নমুনাতে সময় ভেদে ভাইরাসের উপস্থিতির ভিন্নতা আছে। এক্ষেত্রে, বেশ কয়েকধরণের নমুনা একত্র করে পরীক্ষা করলে সনাক্তকরণে সহায়ক হতে পারে, তবে তা গবেষণার দাবী রাখে। পাশাপাশি বুকের সিটি স্ক্যানও কোভিড ডিটেকশনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে বলে কিছু গবেষক দাবী করেন[৬, ৭] তবে বলার অপেক্ষা রাখে না, rRT-PCR ই এখনও পর্যন্ত কোভিড-১৯ সনাক্তকরণে সবচাইতে কার্যকর পদ্ধতি। কিন্তু তাতেও অল্প হলেও ফলস নেগেটিভ রেজাল্ট আসার সম্ভাবনা আছে। তাই বিশেষজ্ঞরা যে নির্দেশনা দেন, তা হল "Negative results do not preclude SARS-CoV-2 infection and should not be used as the sole basis for patient management decisions. Negative results must be combined with clinical observations, patient history, and epidemiological information." অর্থাৎ, নেগেটিভ রেসাল্টকে কোন ক্রমেই রোগী ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্তের একমাত্র ভিত্তি হিসেবে ধরা যাবে না এর সাথে ক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণ, উপসর্গ, রোগীর ইতিহাস এবং রোগ-বিস্তার সংক্রান্ত তথ্য সবই বিবেচনায় আনতে হবে।[১]

এইজন্য, উপসর্গ থাকলে টেস্টে নেগেটিভ আসলেও অবশ্যই ডাক্তারের পরমর্শ মেনে নিজ থেকে ৭ দিন আইসোলেশনে (বাকিদের থেকে আলাদা) থেকে উপসর্গসমূহ পর্যবেক্ষণ করা উচিৎ।

এবারে র্যাপিড সেরোলজিক্যাল টেস্টের ব্যাপারে কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। কোন জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করলে আমাদের শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এন্টিবিড উৎপাদন শুরু করে। এন্টিবিড গুলো আসলে প্রোটিন। র্যাপিড টেস্টে আসলে রক্তে এই এন্টিবিড প্রস্তুত হয়েছে কি না সেটা পরীক্ষা করে। এটি সহজ, সস্তা এবং তুলনামূলক অনেক কম দক্ষতার প্রয়োজন হয়। সমস্যা হচ্ছে রক্তে এন্টিবিড তৈরি হতে একটা নির্দিষ্ট সময় প্রয়োজন হয় এবং তা আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপরেও নির্ভর করে। বিখ্যাত ন্যাচার জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় গবেষকদের দাবী লক্ষণ প্রকাশ পাবার ৭ দিন পরে পরীক্ষা করে মাত্র ৫০% ক্ষেত্রে এন্টিবিড পাওয়া গেছে। এবং ১৪ তম দিনে ১০০% ক্ষেত্রে এন্টিবিড পাওয়া যায়।[৫] যদিও খুব অল্প সংখ্যক রোগীর উপরে পরীক্ষাটা চালানো

হয়েছে তথাপি এটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। ব্যাপারটা ধরতে পার-ছেন? লক্ষণ প্রকাশ পাবার ০-৭ দিনের মধ্যে যদি কেউ এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে তার ফলস নেগেটিভ আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি (৫০%)।

এবং প্রথমে বর্ণিত ঘটনার মত এই ক্ষেত্রেও আক্রান্ত হয়নি ভেবে প্রচুর মানুষকে আক্রান্ত করার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। যা পরিস্থিতিকে আরও বিপর্যন্ত করে তুলতে পারে। তাই এগুলো মাথায় রেখেই শুধুমাত্র হাসপাতাল এবং গবেষণাগারগুলোতে নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করা উচিৎ। IgG এন্টিবিডি তৈরি হবার পর অনেকদিন শরীরে থেকে যায়। তাই কতজন ইতোমধ্যে আক্রান্ত হয়ে গেছে এটা জানার উপায় হিসেবেও এ টেস্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। সেরোলোজিক্যাল টেস্টের একটা বিশেষ ব্যবহার আছে। আক্রান্ত হয়ে আবার সুস্থ হয়ে গেলে কিন্তু PCR এ নেগেটিভই আসবে। সেরোলজিক্যাল টেস্ট সেক্ষেত্রে নিশ্চিত হবার একমাত্র উপায়। তবে এধরণের টেস্ট অনুমোদন দেওয়ার আগে বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থার গাইডলাইন কঠোরভাবে মানা উচিৎ। উল্লেখ্য, কানাডাসহ বিশ্বের অনেক দেশেই এখনো এধরণের র্য়াপিড টেস্ট কিট অনুমোদন করেনি।

তথ্যসূত্র

- ১. ল্যাবরেটরি করপোরেশন অব আমেরিকা
- जानील व्यव व्यात्मात्रकान त्मिष्ठकाल वार्मानियां भन
- ৩. সেন্টার ফর এভিডেন্স বেইজড মেডিসিন
- 8. আলজাজিরা
- ৫. ন্যাচার জার্নাল
- ৬ রেডিওলজি জার্নাল

৭. কোরিয়ান জার্নাল অব রেডিওলজি

ফিচার ছবিসূত্র: National Foundation for Infectious Diseases

দ্রষ্টব্য:

লেখক সৈয়দ মুক্তাদির আল সিয়াম চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন এর গবেষক এবং বর্তমানে কোভিড-১৯ সনাক্তকরণ দলের সাথে কর্মরত



§ २१



অণুজীবের সাথে অমর প্রেম

এফ, এম, আশিক মাহমুদ

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র ২৭.১: মানবদেহের অভ্যন্তরীণ গঠন

ভাবিকভাবেই, আমাদের দেহের গাঠনিক উপাদানের কথা চিন্তা করলে আসবে অস্থি-তরুণাস্থি সমন্বিত শিরা-উপশিরা, লসিকাত-দ্র, পরিপাক তন্ত্র, রেচনতন্ত্র, নিউরন-পেশী ইত্যাদির সংমিশ্রণে গঠিত এক জটিল গাঠনিক ক্রিয়াকলাপ। অর্থাৎ, মানবদেহ আর যাই হোক মোটেও কোন সহজ ব্যবস্থাপনা নয়। আর, অণুজীববিদের মতো করে দেখলে দাড়াবে- নানা ধরণের অসংখ্য অণুজীবের সমাহারে গঠিত এক মানবদেহ। বিষয়টা অনেকটা এমন- আপনি যদি কোন রসায়নবিদের কাছে যান তিনি জগতের সবকিছুতেই আপনাকে ক্রিয়া-বিক্রিয়া দেখাবে, পদার্থবিদের কাছে আবার নানা রকমের পদার্থ দিয়ে খেলা, গণিতবিদের কাছে লাভ-ক্ষতির হিসাব আর দার্শনিকের কাছে গেলে সব কিছুতে মিলিবে দার্শনিক যুক্তি। তবে ঘটনা যাই হোক তার কিন্তু কোনটিকেই আপনি ভুল বলতে পারবেন না। ইহা অবশ্যি আনন্দের এক বিষয়বস্তু।

প্রসঙ্গে আসা যাক, প্রশ্ন হলো অণুজীব কী?

সহজ কথায় বলতে গেলে- অণুজীব হলো জীবন্ত সেই সব অতিক্ষুদ্র জীব যাদের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত খালি চোখে দেখা যায় না। যেমন: ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফানজি (কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়), প্রোটোজোয়া ইত্যাদি। এসব অণুজীব নিয়ে আমাদের জানা প্রয়োজন কেন তা পরের অংশগুলি পড়লেই বুঝতে পারবেন।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, আপনার দেহের অর্ধেকেরও বেশি মানব অংশ নয়। হ্যা, শুনতে অদ্ভুত হলেও তা সত্যি। মানব কোষগুলি দেহের মোট কোষ গণনার মাত্র ৪৩ ভাগ। অর্থাৎ, বাকি ৫৭ ভাগই হলো দেহকোষ নয়। ব্যাপারটি কিন্তু অবাক করা বিষয়। সহজভাবে বললে- বাকি অংশ খালিচোখে দেখতে না পাওয়া অণুজীব নামক অণুবীক্ষণ বসতি। আমাদের এই গোপন বাকি অংশটি বোঝা মানে হলো মাইক্রোবায়োমের (দেহের অণুজীব) ধারণা। ক্ষেত্রটি এমনকি ''মানুষ" হওয়ার অর্থ কী তা নিয়েও প্রশ্ন জাগায় এবং ফলস্বরূপ নতুন উদ্ভাবনী চিকিৎসার দিকে পরিচালিত করে।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটের মাইক্রোবায়োম বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক প্রফেসর রুথ লে দেহের অণুজীব-বসতি নিয়ে বলেছেন

''আপনার শরীর কেবল আপনি নন। এগুলি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য।"

আপনি জানলে অবাক হবেন যে, ৭০ কেজি ওজনের কোন ব্যক্তির অন্ত্রে প্রায় ১০০ লক্ষ কোটির (১০০ ট্রিলিয়ন) অধিক অণুজীব বিদ্যমান। যার ওজন ২০০ গ্রাম, যা মধ্যম আকৃতির একটি আমের সমতুল্য (মতান্তরে ১ কেজি)। আপনি যতই ভালভাবে ধুয়ে ফেলেন না কেন, আপনার দেহের প্রায় প্রতিটি ফাঁক-ফোকরই অণুবীক্ষণিক প্রাণীগুলিতে ভর্তি থাকে। যার মধ্যে রয়েছে ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক এবং আর্কিয়া (যদিও অণুজীবগুলি শুধু ব্যাকটিরিয়া হিসাবে ভুল বলা হয়)। আর এই

আণুবীক্ষণিক জীবনের সর্বাধিক ঘনত্ব হলো আমাদের অক্সিজেন-বঞ্চিত অন্ত্রের অন্ধকার নিস্তেজ গভীরতম অংশ।

ক্যালিফোর্নিয়া সান দিয়েগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রব নাইট বিবিসিকে বলেছিলেন:

''আপনি মানুষের চেয়ে বেশিই অণুজীব।"

মূলত আমাদের কোষগুলি অণুজীবের দশ ভাগের এক ভাগ বলেই মনে করা হত। পরবর্তীতে, একে ১:১ এর সাথে খুব কাছাকাছি সংশোধন করা হয়। যার বর্তমান অনুমান দাড়ায় যদি আপনি দেহের সমস্ত কোষ গণনা করেন তবে আপনি প্রায় ৪৩% মানুষ হবেন। কিন্তু জেনেটিক্যালি আমরা আরও বেশি ছাপিয়ে গিয়েছি। মানব জিনোম অর্থাৎ, মানুষের দেহ পরিচালনার জন্যে জিনগত নির্দেশাবলীর সম্পূর্ণ সেট বলতে প্রায় বিশ হাজারের মত নির্দেশনাকে ''মানব জিন" বলা হয়। তবে, মাইক্রোবায়োমের (দেহে বাসকারী অণুজীব) সাথে এই মানবজিনোমকে একসাথে যুক্ত করলে সংখ্যাটি বিশ লক্ষ থেকে দুই কোটি মাইক্রোবিয়াল জিনের মধ্যে আসে।

ক্যালটেকের অণুজীব বিশেষজ্ঞ, প্রফেসর সারকিস মাজমানিয়ান যুক্তি দেখান:

''আমাদের কেবল এক জিনোম নেই, মাইক্রোবায়োমের জিন-গুলি মূলত দ্বিতীয় জিনোম হিসাবে কাজ করে যা, আমাদের নিজস্ব ক্রিয়াকলাপকে আরো বাড়িয়ে তোলে। আমাদেরকে যা মানুষ করে তোলে তা হল আমাদের নিজস্ব DNA এবং আমাদের অন্ত্রের অণুজীবগুলির DNA-এর সংমিশ্রণ।"

DNA সিকোয়েনিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষকরা সারা শরীরে এবং এর ভিতরেও অসংখ্য মাইক্রোবিয়াল সম্প্রদায় আবিষ্কার করেছেন। এটা সহজভাবে ভাবতে হবে যে, আমরা এতটা অণুজীবীয় উপাদান বহন করি যা কোন মিথজ্রিয়া বা আমাদের দেহে কোন প্রভাবও ফেলে না।

এই মাইক্রোবায়োম (দেহের অণুজীব) আমাদের হজম, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ, রোগের বিরুদ্ধে রক্ষা এবং অত্যাবশ্যকীয় ভিটামিন তৈরিতে ভূমিকা পালন করে যা বিজ্ঞান দ্রুত উন্মোচন করছে।

প্রফেসর নাইট অণুজীবের ব্যাপকতা সম্পর্কে বলেছেন:

''আমরা এমন উপায় খুঁজে পাচ্ছি যে এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি আমাদের স্বাস্থ্যকে পুরোপুরি এমনভাবে রূপান্তরিত করেছে যা আমরা কখনই কল্পনাও করি নি।"

আমরা একা নই বরং অসংখ্য অণুজীবের সঙ্গে বাস



চিত্র ২৭.২: মানবদেহে অণুজীবের উপস্থিতি

মানবদেহ হল অণুজীবের আধার। শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত মাই-ক্রোবায়োম (অণুজীব) আমাদের রোগ তৈরীতে কিংবা প্রতিরোধে জটিল ভূমিকা পালন করে। বিষয়টা আরেকটু খোলসা করা যাক।

শুরুতে ত্বকের কথায় আসি যাকে আমাদের প্রথম বহি:প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলা যায়। কেননা এই ত্বকই বাহিরের পরিবেশ থেকে ভেতরের সকল অঙ্গকে রক্ষা করে। ত্বকে যে পরিমাণ প্রয়োজনীয় অণুজীব রয়েছে তা শুধু ক্ষতি থেকেই রক্ষাই করে না বরং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে। ত্বকের কিছু অণুজীব বিভিন্ন অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পদার্থ তৈরী করে যা অন্যান্য প্রজাতির উপনিবেশ তৈরীতে বাঁধা দান করে। কিছু গবেষণাতে দেখা যায় যে, ত্বকের Staphylococcus epidermis ব্যাকটেরিয়া ত্বক-ক্যান্সার থেকে রক্ষা করতে পারে।

এরপর মানুষের মুখের প্রসঙ্গে আসি। মানুষের মুখে প্রচুর পরিমাণে অণুজীব রয়েছে। বলা হয়ে থাকে আমাদের মুখে পায়ুনালী থেকেও অধিক মাত্রায় অণুজীব বিদ্যমান। কিছু ভাল, তবে কিছু দাঁত ক্ষয়ের মতো বিষয়গুলি ঘটাতেও পারে। যেমন: Streptococcus mutans, Porphyromonas gingivalis ইত্যাদি।

পূর্বে ফুসফুসকে অণুজীবমুক্ত পরিবেশ হিসাবে ভাবা হলেও, বর্তমানে দেখা গেছে ফুসফুসেরও নিজস্ব মাইক্রোবায়োম রয়েছে। গবেষকরা জানতে পেরেছেন যে, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারী ডিজিজ (COPD) এবং সিস্টিক ফাইব্রোসিসের মতো শ্বাসকষ্টজনিত রোগীদের ফুসফুসে সুস্থ মানুষের তুলনায় অণুজীবের বৈচিত্র্য কম। ফুসফুসে বাসকারী হিসাবে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়: Streptococcus, Prevotella, Veillonella ইত্যাদি।

আসলে অণুজীব থেকে কোনভাবেই লুকানো সম্ভব না। নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত অন্ধকার-আর্দ্র অঞ্চলেও বিভিন্ন ধরণের অণুজীব রয়েছে। মজার বিষয় হল, নির্দিষ্ট কিছু প্রোবায়োটিক (উপকারী অণুজীব) খাবার গ্র- হণের ফলেই আবার গোপন অঙ্গের সংক্রমণ থেকে মুক্তি মেলে। যেমন: সুস্থ নারীদের যৌনিতে Lactobacillus $(L.\ fermentum,\ L.\ rhamnosus,\ L.\ gasseri)$ এর আধিপত্য থাকে, যা সেখানকার পরি-বেশের pH কমিয়ে দেয় এবং নানা ধরণের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

চোখ সম্পর্কে আমাদের ধারণা কেমন? অণুজীব মুক্ত? না, আসলে অণুজীবের জন্যে মানুষের চোখও একটি আদর্শ আবাসস্থল। চোখে বাসকারী অণুজীব বাস্তুতন্ত্রে যে অনন্য ভূমিকা পালন করে তা চোখের রোগের চিকিৎসাতেও ভূমিকা রাখে। অণুজীবেরা কর্নিয়া এবং কনজেন্টি-ভাতে (চোখের পাতার ভিতরের টিস্যু) একটি বসত তৈরি করে। যদিও এই মাইক্রোবায়োম তুলনামূলকভাবে ছোট (কেবলমাত্র ৪টি ব্যাকটিরিয়া প্রজাতি) তবু, এই বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যহীনতা চোখের পানি শুকানো রোগ এবং এন্ডোফথালমিটিসের (চোখের প্রদাহ) মতো রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।

আমাদের নিঃশ্বাসের জন্যে নাক হলো একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু, নাকের গহ্বর অন্ধকার, উষ্ণ এবং স্যাঁতসেঁতে হওয়াতে এটি জীবাণুদের জন্যে উপযুক্ত একটি পরিবেশ। নাকে উপস্থিত অণুজীবের বাস্তুতান্ত্রিক অসমতা হাঁপানি, দীর্ঘস্থায়ী সিনুসাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং ব্রোঙ্কিওলাইটিসের সাথে সংযুক্ত। আশ্চর্যের বিষয় হল, গবেষকরা সম্প্রতি দেখেছেন এ সমস্যাতে Lactobacillus (প্রোবায়োটিক ব্যাকটিরিয়া) নাকের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতিতে অবদান রাখে।

আবার, টনসিলের সাথে মোটামুটি আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। ঠান্ডা লাগলে অনেকেরই এ উপসর্গ ধরা দেয়। মূলত মুখ কিংবা নাক দিয়ে প্রবেশকৃত ক্ষতিকর অণুজীব (যেমন:Streptococcus pyogenes) গুলো আটকে যাওয়ার ফলে টনসিলের সৃষ্টি হয়। এরপর অ্যান্টিবিডি তৈরী করে সেগুলোকে ধ্বংস করে দেহে প্রবেশে বাঁধা দিয়ে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে এই টনসিল। আর একাজে সাহায্য করতেও অণুজীবের বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্যতা রয়েছে।

'মা ও শিশু" ব্যাপারটাতে আসা যাক। শিশুদের জন্যে মায়ের দুধ তার সুস্থতা বিকাশে দারুন অবদান রাখে। কেননা, এতে পুষ্টি উপাদান, রোগ-প্রতিরোধী কোষ এবং প্রিবায়োটিক (উপকারী অণুজীবগুলির খাদ্য) থাকে যা কিনা উপকারী ব্যাকটেরিয়ার বংশবিস্তারে সহায়তা করে। যা শিশুর অন্ত্রের বিকাশে অর্থাৎ, হজমে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এমনকি মায়ের ওজনও বুকের দুধে উপস্থিত মাইক্রোবায়োমের বৈচিত্র্যতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। একটা গবেষণাতে দেখা যায়, স্বাভাবিক ওজনের মহিলাদের তুলনায় অধিক ওজনের মহিলাদের মাইক্রোবায়োম কম বৈচিত্র্যয়। এমনকি প্রসবের পদ্ধতি এবং হরমোনগত পরিবর্তনও মায়ের বুকের দুধে উপস্থিত ব্যাকটিরিয়া দ্বারা প্রভাবিত।

যদি আপনার নাভিতে কিছুটা পাকা গন্ধ পাওয়া যায় সেটা কি কারণে বলতে পারবেন? এর কারণ হলো এই নাভির মাইক্রোবায়োম। নাভিতে কি পরিমাণ অণুজীব প্রজাতির ভিন্নতা বিদ্যমান তা পরীক্ষার জন্যে ৬০টি নাভির পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখা যায় ২,৩৬৮ টি ভিন্ন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া! আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এখানে এমন কিছু প্রজাতিও দেখা যায়, যা জাপানের মাটিতে এবং বরফের উপরিভাগে বাস করে এমন অণুজীব বিদ্যমান। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ২০১৩ সালে ক্রিস্টিনা আগাপাকিস এবং ঘ্রাণ বিশেষজ্ঞ সিসেল তোলাস নাভির অণুজীব দিয়ে সুগন্ধি পনির তৈরী করেছিল। হয়ত এরকম জানলে আপনি পনি-রে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারেন কিন্তু বিষয়টা অবাক করার মত বটে।

তবে, অণুজীবের মানবদেহে ইতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি নেতিবাচক প্রভাবও কিন্তু ফেলে দেবার মত নয়। কিন্তু, ইতিবাচক প্রভাবই বেশি বলতে হবে। কেননা, গুটিবসন্ত, যক্ষা, নিউমোনিয়া কিংবা ত্বকের ইনফেকশন নানাবিধ ভয়াবহ রোগ অণুজীবের মাধ্যমে হলেও এর প্রতিরোধের অ্যান্টিবায়োটিক এবং ভ্যাকসিন নামক অস্ত্র আবার অণুজীব থেকেই তৈরী করা হয়। অর্থাৎ, মানবদেহ এবং অণুজীবের সম্পর্ক কোন সাধারণ ব্যাপার নয় বরং প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক থেকেও গভীর। প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক বিচ্ছেদ হতে পারে কিন্তু অণুজীবের সাথে

সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র

- ♦ More than half your body is not human BBC.
- ♦ Bad times for good bacteria: how modern life has damaged our internal ecosystems – The Conversation.
- ♦ 11 Crazy Places Where Bacteria Live On And Inside Your Body Atlas Blog.
- ♦ We Are Never Alone: Living with the Human Microbiota – Frontiers Media.
- ♦ Information About Gut Microbiota Gut Microbiota for Health by ESNM.
- ♦ Dinan, Timothy G., et al. "Collective unconscious: how gut microbes shape human behavior." Journal of Psychiatric Research 63 (2015): 1-9. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2015.02.021.



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

§ ২৮



এভারেস্টের চূড়াতেও মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ

আবীর হোসেন অনি

ইক্রোপ্লাস্টিক হচ্ছে প্লাস্টিক পদার্থের অতিক্ষুদ্র কণা যেগুলো প্লাস্টিক পদার্থের তৈরি বৃহত্তর বস্তু ভাঙ্গনের ফলে ধীরে ধীরে তৈরি হয় এবং জমা হয়। এসব মাইক্রোপ্লাস্টিক পরিবেশের জন্য একটি বিশাল হুমকির কারণ। এগুলো সহজেই প্রাণীদের খাবারের সাথে প্রাণী দেহে প্রবেশ করে আর এগুলো এত ক্ষুদ্র যে এগুলো পরিষ্কার করা অত্যন্ত কঠিন। মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলো সমুদ্রের মধ্যে অনেক বিস্তৃত, তবে স্থলে বিশেষ করে দূরবর্তী পর্বতের চূড়ায় এসবের অস্তিত্ব নিয়ে তেমন গবেষণা করা হয় না।

সম্প্রতি গবেষকরা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এবং রোলেক্স পের্পেটুয়াল প্ল্যানেট এর এভারেস্ট অভিযান হতে প্রাপ্ত তুষার ও প্রবাহের নমুনাগুলো বিশ্লেষণ করে মাউন্ট এভারেস্টে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণের প্রমাণ পেয়েছেন। বেইজ ক্যাম্পের আশোপাশে যেখানে হাইকার এবং ট্রেকাররা বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করে থাকেন, সেখানে মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলোর সর্বাধিক ঘনত্ব ছিল। দলটি সমুদ্রপৃষ্ট থেকে ৮,৪৪০ মিটার উঁচুতেও মাইক্রোপ্লাস্টিক খুঁজে পেয়েছিল। গত ২০ নভেম্বর "ওয়ান আর্থ" জার্নালে এই ফলাফলগুলো প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণাপত্রটির প্রথম লেখক বিজ্ঞানী ইমোজেন ন্যাপার নিজেও ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এক্সপ্লোরার এবং প্লাইমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানী। তিনি তার সহকর্মীদের কাছে "প্লাস্টিক গোয়েন্দা" হিসাবে পরিচিত। তিনি বলেছেন "মাউন্ট এভারেস্টকে বিশ্বের সর্বোচ্চ ময়লার ভান্ডার হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে"। তিনি আরো বলেন, "এর আগে এই পর্বতে মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলোকে নিয়ে গবেষণা করা হয়নি, তবে সাধারণত এই ধরণের মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলোকে অপসারণ করা ময়লার বিশাল ধ্বংসস্কৃপ অপসারণের তুলনায় আরও কঠিন"।

বিজ্ঞানী ন্যাপার বলেন, "বিশ্লেষণের ফলাফল কি হতে পারে তা নিয়ে আমার কোন ধারণা ছিল না। তবে আমার বিশ্লেষণ করা প্রতিটি তুষা-রের নমুনায় মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি আমাকে অবাক করেছে। মাউন্ট বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র ২৮.১: এভারেস্ট অভিযাত্রীদের তাঁবুগুলোর দৃশ্য। এই তাঁবুগুলো জলরোধী অ্যাক্রিলিক উপাদান দিয়ে তৈরি। ছবিটি চতুর্থ ক্যাম্প, দক্ষিণ কর্নেল এলাকা থেকে তোলা হয়। পর্বতারোহীরা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি জলরোধী পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে পর্বতের শীর্ষে যাচ্ছেন।

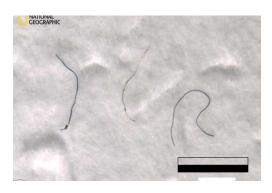
(ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এবং রোলেক্স পের্পেটুয়াল প্ল্যানেট)

এভারেস্ট এর ব্যাপারে সবসময় আমার ধারণা ছিল যে এটি কোন এক দূরবর্তী এবং আদিম স্থান। কিন্তু আমরা যে এই সর্বচ্চ শৃঙ্গের চূড়ার কাছেও দূষণ করে চলেছি সেটা জানতে পেরে সত্যি চোখ খুলে গেলো"।

গবেষক দলের কিছু সদস্য ২০১৯ সালের বসন্তে এভারেস্ট অভিযানের সময় পর্বতে আরোহণ করে নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন। তবে বেশিরভাগ কাজই করা হয়েছিল সেখান থেকে অনেক মাইল দূরে একটি ল্যাবে, যেখানে ন্যাপার এবং তার গবেষক দল নমুনাগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি কেবল এই পর্বতে প্লাস্টিক আছে কিনা তা জানতে চেয়েছিলেন এমন নয়, বরং সেখানে কী ধরণের প্লাস্টিক ছিল সে ব্যাপারেও বিশ্লেষণ করেছিলেন। দূষণের সূত্রপাত কোথায় তা জানার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ন্যাপার বলেন, "নমুনাগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পলিএস্টার, অ্যা-ক্রিলিক, নাইলন এবং পলিপ্রপিলিন ফাইবার পাওয়া গেছে। এগুলো পর্বতারোহীদের পোশাক, তাঁবু এবং আরোহণের দড়ি তৈরি করতে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই সন্দেহ করা হচ্ছে যে, খাদ্য সামগ্রী নয় বরং এ জাতীয় জিনিসপত্রগুলোই দৃষণের প্রধান উৎস"।

এই সমীক্ষায় মাউন্ট এভারেস্টে মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলোর উপস্থিতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তবে এই দূষণকে পরিষ্কার করার উপায় এখনও জানা যায়নি।



চিত্র ২৮.২: ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এবং রোলেক্স পের্পেটুয়াল প্ল্যানেট এভারেস্ট অভিযানের সময় মাউন্ট এভারেস্টের ৮,৪৪০ মিটার উচ্চতা থেকে সংগৃহীত বরফের নমুনায় প্রাপ্ত মাইক্রোফাইবারগুলোর একটি নির্বাচিত অংশ, যা বাইরে পরিধানের পোশাকের তম্ভুগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এবং রোলেক্স পের্পেটুয়াল প্ল্যানেট এভারেস্ট অভি-যানের সময় মাউন্ট এভারেস্টের ৮,৪৪০ মিটার উচ্চতা থেকে সংগৃহীত বরফের নমুনায় প্রাপ্ত মাইক্রোফাইবারগুলোর একটি নির্বাচিত অংশ, যা বাইরে পরিধানের পোশাকের তম্ভগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তিনি বলেন, "বর্তমানে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রচেষ্টাগুলোর মাঝে অন্যতম হল অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য জিনিসগুলো পুনঃব্যবহারের দিকে মনোনিবেশ করা। যদিও এটি গুরুত্বপূর্ণ, তবে আমাদের আরও গভীর প্রযুক্তিগত সমাধানগুলোতে মনোনিবেশ করা শুরু করা উচিত যা মাইক্রোপ্লাস্টিক-গুলোতে ফোকাস করে, যেমন ফ্যাব্রিক ডিজাইন পরিবর্তন করা এবং যথাসম্ভব প্লাস্টিকের পরিবর্তে প্রাকৃতিক তম্ভুগুলোর ব্যবহার করা"।

গবেষকরা আরও আশা করেন যে, প্লাস্টিকের দূষণ যে কেবল সাগর নয় বরং সমস্ত পরিবেশকে বিপুল পরিমাণে বিপদগ্রস্থ করে তোলে তা তাদের কাজের মাধ্যমে স্পষ্ট করতে সহায়তা করবে।

''এগুলো এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হওয়া সর্বাধিক মাইক্রোপ্লাস্টিক", ন্যাপার বলেছেন, ''যদিও এটি উত্তেজনাকর শোনায়, এর মানে হলো হল মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলো সমুদ্রের গভীর থেকে শুরু করে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। আমাদের পরিবেশে মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলোর সর্বব্যাপী বিস্তৃত এ অবস্থায়, উপযুক্ত পরিবেশগত সমাধানগুলো অবহিত করার বিষয়ে আমাদের এখন নজর দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের গ্রহকে রক্ষা এবং যত্ন করতে হবে।"

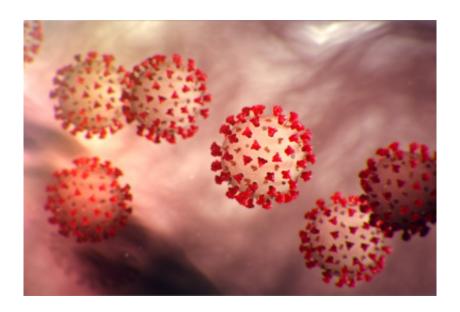
তথ্যসূত্র

- ♦ There are microplastics near the top of Mount Everest too (2020) Phys.org



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

§ ২৯



করোনাভাইরাস ভ্যাক্সিন: খরগোশ-কচ্ছপের গল্পের পরিণতি কাম্য নয়

আসিফ আহমেদ

ই লেখাটি যখন লিখছি তখন করোনার ভ্যাক্সিন আবিস্কার অনেক এগিয়ে গেছে। ইউকে তাদের নাগরিক দের ভ্যাক্সিন দেরা শুরু করতে নীতিগত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। সারাবিশ্বের দিন রাত পরিশ্রম করে যাওয়া বিজ্ঞানীদের এই কর্মযজ্ঞ এককথায় অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। পাশাপাশি ভ্যাক্সিন আবিস্কারের জন্য স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যে সময় প্রয়োজন তার থেকেও অনেক কম সময়ে ভ্যাক্সিনের ছাড়পত্র পাবার বিষয়টি নানা কারনে শংকা ও সমালোচনার জন্ম দিছে। করোনাভাইরাস সারাবিশ্বের আনাচে কানাচে পৌঁছে যাবার কারনে ভ্যাক্সিন এর চাহিদাও সর্বোচ্চ সীমায়। জনবহুল দেশ হওয়াতে বাংলাদেশের নাগরিক দের জন্য ভ্যাক্সিন পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে চলছে তোড়জোড়।

এ পর্যন্ত বিশ্বের যারা করোনার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে বয়স্ক জনগোষ্ঠি একটি বিশাল অংশ, বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে যেখানে মানুষের গড় আয়ু অনেক বেশী। পাশাপাশি মৃতদের আশি শতাং-শের বেশী এক বা একাধিক অন্যান্য জটিল দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত ছিলেন, যেমন ডায়বেটিস, হার্টের সমস্যা, ব্লাড প্রেশার, কিডনির সমস্যা, ক্যান্সার ইত্যাদি। তাই বার্ধক্য এবং অন্যান্য ব্যধি করোনাভাইরাসে মৃত্যুর পিছনে বড় নিয়ামক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। আর ঠিক এই কারনেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং অন্যন্য দের সুপারিশ মতে সামনের সারির যোদ্ধা, বৃদ্ধাশ্রমের বাসিন্দা এবং অন্যান্য ব্যধি আছে এমন ঝুকিপূর্ণ ব্যক্তিদের টিকা প্রদান তালিকার সামনের দিকে রাখতে বলা হয়েছে। ভাইরাসে এবং টিকার উপাদান গুলোর ভিতর কি ধরনের মিল বা অমিল আছে সেটা জানলে আমরা টিকার সম্ভাব্য ঝুঁকিও বুঝতে পারবো। ভাইরাস যেমন সুস্থ, কম বয়সীদের বেশী কাবু করছেনা, তেমনি টিকাও তাদের জন্য সহনীয় হবার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু বয়স্ক এবং অসুস্থ দের ক্ষেত্রে টিকার আলাদা ঝুঁকি টা কেমন হতে পারে এবং সে ব্যাপারে আসলে আমরা কতটা তথ্য উপাত্ত নিতে পেরেছি সেটিই এই লেখার মূল বিষয়।

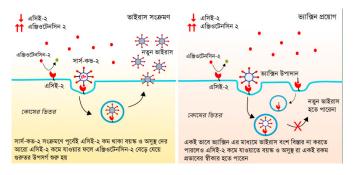
আমরা ইতিমধ্যে অনেকেই জানি করোনাভাইরাসের উপরিভাগে যেই

কাঁটার মত প্রোটিন থাকে সেটি আমাদের শরীরে কোষে এসিই-২ (ACE2) নামক রিসেপটর এর সাথে সংযুক্ত হয়। এর ফলে ঐ রিসেপ্টর কে নিয়ে সে ভিতরে ঢুকে যায়। ভিতরে যাবার পর ভাইরাস বংশ বিস্তার করে নতুন ভাইরাস তৈরী করে। কিন্তু ভিতরে ঢোকার সময় এই এসিই-২ নিয়ে যাবার কারনে শরীরে এসিই-২ এর ঘাটতি তৈরী হতে থাকে। অল্প বয়সীদের ক্ষেত্রে ধারণা করা হচ্ছে এই ঘাটতি শরীর পূরণ করতে সক্ষম। কিন্তু বয়স্ক, পুরুষ এবং অসুস্থ দের ভিতর আগে থেকেই কোষের উপরে এই রিসেপ্টর তুলনামূলক কম থাকে। ফলে ভাইরাস আক্রমণ করলে তা আরো কমে যেতে থাকে। এই রিসেপ্টর এক প্রকার এনজাইম যা এঞ্জি-ওটেনসিন ২ কে ভাংতে সাহায্য করে। ভাইরাসের জন্য আমাদের এসিই-২ এর পরিমাণ কমতে থাকায় এঞ্জিওটেনসিন ২ বেশী মাত্রায় বেড়ে যায় এবং শরীরে ভয়াবহ উপসর্গের দিকে নিয়ে যায় (চিত্র-২৯.১)।

প্রশ্ন হলো ভাইরাসের সাথে ভ্যাক্সিনের কোথায় মিল? এটা বুঝতে হলে অল্প কথায় ভ্যাক্সিন এর উপাদান কি সেটা দেখতে হবে। যে উপায়েই ভ্যাক্সিন তৈরী হোক, সর্বশেষ উপাদান হিসাবে শরীরে যেদি উপস্থিত থাকে সেটি হলো ভাইরাসের উপরিভাগের কাঁটার প্রোটিন। ভ্যাক্সিনে সত্যিকারের ভাইরাসের বংশ বিস্তার করার কোন উপাদান উপস্থিত থাকেনা। তবে কাঁটার প্রোটিন টা কয়েকটা ভাবে থাকতে পারে। শুধু কাঁটা গুলো থাকতে পারে, অথবা ডিএনএ বা আর এন এ ভ্যাক্সিনে আমাদের শরীর ঐ কাঁটা গুলো তৈরী করে দেয়। আরেকটি উপায় হচ্ছে অন্য ভাইরাসের খোলসে করোনার কাঁটা বসিয়ে দেয়া। অথবা আস্ত করোনাভাইরাস কে নিস্ক্রিয় করে ফেলা অথবা বংশবিস্তারের দুর্বল করে ফেলা। উপরের যে উপায়েই হোক কাঁটার প্রোটিন ই মূলত আমাদের ইমিউন সিস্টেম কে বুঝাতে সক্ষম হয় যে করোনার কাঁটা বা বহিরাগত কিছু এসেছে। তখন আমাদের শরীর এর জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনী তৈরী করে ফেলে যাকে আমরা এন্টিবডি বলি। পরে যখন শরীরে সত্যি ভাইরাস প্রবেশ করে তখন আগে থেকে তৈরী হওয়া এন্টিবডি ভাইরাসের কাঁটা কে চিনে ফেলে এবং অন্যান্য ব্যবস্থার সাহায্যে নিস্ক্রিয়

করে ফেলে। তারমানে ভ্যাক্সিন এর মূল উপাদান আসলে ভাইরাসের কাঁটা এবং সাধারণভাবে ভ্যাক্সিন এ ভাইরাসের বংশবিস্তার সহায়ক আর এন এ না থাকায় ভাইরাসের বংশবিস্তার জনিত ক্ষতি নেই বললেই চলে।

তাহলে ভ্যাক্সিন কিভাবে বয়স্ক বা অসুস্থ দের সম্ভাব্য ঝুঁকির কারন হতে পারে? গবেষণা তথ্য বলছে সার্স করোনাভাইরাস অথবা এবারের নতুন করোনাভাইরাস সার্স-কভ-২ এদের শুধু কাঁটা অথবা কাঁটা যদি অন্য কোন ভাইরাসের উপরে বসানো হয় তাহলে আসল ভাইরাসের মতই আমাদের কোষে যুক্ত হতে পারে এবং ভিতরে চলে যেতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে, মূল ভাইরাসের আর এন এ না থাকলেও শুধু কাঁটা এসিই-২ এ যুক্ত হতে পারে এবং এসিই-২ কমিয়ে দিতে পারে। আর এসিই-২ কমে যাওয়া মানেই এঞ্জিওটেনসিন-২ বেড়ে ভয়াবহ শারীরিক ঝুঁকি তৈরী হওয়া (চিত্র-২৯.১)।



চিত্র ২৯.১: সার্স-কভ-২ এবং ভ্যাক্সিন এর মাধ্যমে বয়স্ক ও অসুস্থ ব্যক্তিদের শরীরে গুরুতর উপসর্গ তৈরী হবার তুলনামূলক ছবি।

মানবদেহে যতগুলো ভ্যাক্সিনের পরীক্ষা হয়েছে বেশী ছিল সৃস্থ মানুষের সংখ্যা এবং অধিক সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বা দের যেটুকু করা পৃথিবীর বয়স্ক ও অসুস্থ দের অনুপাতে। সারা করোনাভাইরাসে সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে থাকা অংশের মানুষের ভ্যাক্সিনের প্রভাব এখনো বিস্তারিত ও পর্যাপ্ত ভাবে জানার কোন সুযোগ পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি যাদের উপর পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া গুলো যেমন জ্বর, ব্যথা, খারাপ লাগা এগুলো দেখা হয়েছে, শরীরে এন্টিবডি তৈরী হচ্ছে কিনা সেটা দেখা হচ্ছে। কিন্ত তাদের এঞ্জিওটেনসিন ২ কতটা বাড়ছে সেটা দেখা হচ্ছেনা। অন্তত প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলোয় তেমন কোন তথ্য আসেনি। তাই স্বাভাবিক ভাবে সারাবিশ্বে বয়স্ক ও অসুস্থ ব্যক্তিদের যদি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভ্যাক্সিন দেয়া হয়, তাদের নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ব্যাপারে বিশ্লেষণ সত্যিকার অর্থে পর্যাপ্ত নয় এবং কিছুটা অবহেলিত। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাই শংকা জাগে খরগোশের গতিতে ভ্যাক্সিন মানবকল্যাণে প্রয়োগ করতে যেয়ে আমরা করোনার সবচে ক্ষতির স্বীকার অংশকে আবার না ঝুঁকিতে ফেলে দিই। বিজ্ঞান ভাগ্য কে তেমন পাত্তা না দিলেও ভাগ্যজোরে যদি আমরা তেমন প্রতিক্রিয়া থেকে বেঁচে যাই তা ভালো কথা। নাহলে দূর্ভাগ্যজনক ভাবে হয়তো ঐ প্রবাদ টিই সত্যি হয়ে যেতে পারে, "ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না"।

্কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ এই লেখার পিছনে চিন্তা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং তথ্য উপাত্ত দিয়ে সমান ভাবে কাজ করে যাবার জন্য মাহমুদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, মেডিকেল বায়োটেকনোলজি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস এবং মারুফ হাসান, সহযোগী অধ্যাপক, বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং, মিলিটারি ইসটিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজি এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

তথ্যসূত্র

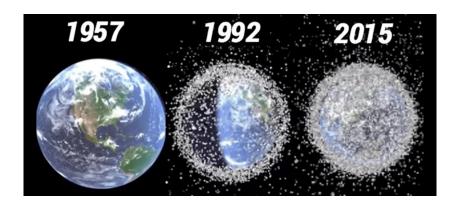
আরো বিস্তারিত জানার জন্য এই রেফারেন্স গুলো সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

♦ Callaway E. The race for coronavirus vaccines. Nature. 2020; 580:576-7.

- Wallentin L, Lindback J, et al. Angiotensinconverting enzyme 2 (ACE2) levels in relation to risk factors for COVID-19 in two large cohorts of patients with atrial fibrillation. European heart journal. 2020.
- ♦ Luo L, Fu M, Li Y, et al. The potential association between common comorbidities and severity and mortality of coronavirus disease 2019: A pooled analysis. Clinical Cardiology. 2020.
- ♦ Ou X, Liu Y, Lei X, et al. Characterization of spike glycoprotein of SARS-CoV-2 on virus entry and its immune cross-reactivity with SARS-CoV. Nat Commun. 2020; 11(1):1620.



§ 90



মহাকাশে আবর্জনা: ঝুঁকি ও ভবিষ্যৎ

মোঃ ফোরকান

হাকাশের প্রতি মানুষের কৌতুহল সেই প্রাচীনকাল থেকে। রাতের আকাশে উজ্জ্বল তারা দেখে দেখে পৃথিবী নামক গ্রহের অধিবাসীদের মহাকাশের প্রতি ভালবাসা, আবেগ ও অনুভূতি জন্মায়। মহাকাশের সৌন্দর্য মানুষের মনে জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়। নানা সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে মানুষের মাথায় মহাকাশ ভ্রমণের ভূত মাথায় চেপে বসে।

নানা চড়াই উৎড়াই পেড়িয়ে উনবিংশ শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে মানুষের কাজ্ঞিত মহাকাশ যাত্রা সফলতার মুখ দেখে। পৃথিবীর বাইরের জগৎ অম্বেষণের জন্য মহাকাশযুগের সূচনার পর থেকে আমরা প্রতিনিয়ত পৃথিবীর কক্ষপথে মহাকাশ অভিযান পরিচালনা করছি। বিভিন্ন কক্ষপথের উদ্দেশ্য হাজার হাজার রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করছি। কিন্তু নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য এসব মহাকাশযান ও উপগ্রহগুলো তাঁদের কাজ সম্পাদন করে সেখানেই থেকে যাচ্ছে। মৃত বা বিকল হলে পড়ে আছে পৃথিবীর কক্ষপথে। এসব মৃত উপগ্রহ, রকেট বা তাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ কক্ষপথে আবর্জনার সৃষ্টি করছে। যা বর্তমানে উপকারের থেকে ক্ষতিই বেশি করছে। হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে সমস্ত মহাকাশ ব্যবস্থা-পনাকে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন স্পেস জাঙ্ক বা মহাকাশ আবর্জনা।

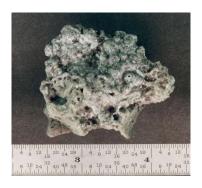


চিত্র ৩০.১: কক্ষপথে ঘূর্ণয়মান স্পেস জাঙ্ক বা মহাকাশ আবর্জনা। ছবি সূত্র: ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি

মহাকাশ আবর্জনা কি?

মহাশূন্যে পৃথিবীর কক্ষপথে মানুষের প্রেরিত কোন মহাকাশ্যান বা উপগ্রহের ধ্বংসাবশেষ অথবা ইচ্ছা বা আনিচ্ছাকৃতভাবে মানুষের রেখে আসা যন্ত্রাংশই স্পেস জাঙ্ক, বা মহাকাশ আবর্জনা। এটি যেমন উপগ্রহের মত বিশাল আকৃতির কয়েকশো কেজি ভরের একটি বস্তু হতে পারে তেমনি একটি সাধারণ ক্ষুদ্র ক্র, নাট-বোল্ট, কাঁচের টুকরাও হতে পারে। বিজ্ঞানীরা এই অব্যবস্থাপনাকে মহাকাশ দূষণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২০২০ সালের ২৬ জুন নাসার নভোচারী ক্রস কেসেডি ও বব ভেনকেন ISS'র বাইরে ব্যাটারির কাজ করছিলেন। তখন কেসেডির স্পেস স্যুটে লাগানো একটা আয়না খুলে যায়। তাঁর কবজিতে বাঁধা ৫ ইঞ্চি বাই ৩ ইঞ্চির আয়নাটা মহাকাশে দ্রুত বেগে হারিয়ে যায়। সেটাও এখন অরবিটাল ট্রাশ হিশেবে কক্ষপথে আছে।



চিত্র ৩০.২: শাটল রকেট থেকে ছিটকে পড়া রকেট বুস্টারের ধ্বংসাবশেষ যা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের একটি মহাকাশ বর্জ্য। ছবি সূত্র: নাসা

এরকম মহাকাশযান ও নভোখেয়াযানের রকেট বুস্টার, পে-লোড অ্যাডাপ্টর, নভোচারিদের পোশাক সহ আনুষাঙ্গিক খুলে পড়া বা ছিটকে যাওয়া বস্তুগুলোও মহাকাশে থেকে যাচ্ছে। এসব বর্জ্যগুলো কক্ষপথে ঘন্টায় ১৭ হাজার মাইলের উপরে বেশি গতি নিয়ে ঘুরছে। সেগুলোই এখন মহাকাশে জটিলতার সৃষ্টি করছে।

স্পেস ট্রাশ কিভাবে তৈরি হয়?

১৯৫৭ সালে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-১ পৃথিবীর কক্ষপথে প্রবেশের সাথেই মহাকাশ আবর্জনা যুগেরও সূচনা ঘটে। তখন থেকেই নর্থ আমেরিকা অ্যারোস্পেস ডিফেন্ড কমান্ড (NORAD) কক্ষপথে উৎক্ষেপিত উপগ্রহ ও রকেটের সার্বিক অবস্থা নিয়ে ডাটাবেস তৈরি করা শুরু করে। নাসা সেই ডাটাবেস সংরক্ষণ করে এবং পরবর্তীতে ১৯৮০'র দশকে সেলস ট্রাক বুলেটিন বোর্ড সেই সংবাদ প্রকাশ করে।

১৯৬০ এর দশকে প্রথম স্পেস জাঙ্ক নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানিরা সবথেকে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন ইউএস মিলিটারি প্রজেক্ট ওয়েস্ট ফোর্ড নামের একটি প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ তামার উত্তেজ-ককর-নিডল (Needles) কক্ষপথে পাঠাতে চেয়েছিলো। এগুলো রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবে এবং দীর্ঘ দূরত্বের রেডিও তরঙ্গকে প্রতিবিম্বিত করতে সক্ষম। ১৯৬৩ সালে ইউএস বিমানবাহিনী এসব নিডলকে কক্ষপথে পাঠায় এবং প্রতিফলক বেল্ট গঠন করতে সফল হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো পৃথিবীর উপরিভাগে একটি কৃত্রিম আয়োনোক্ষিয়ার তৈরি করা। কিন্ত পরের তিন বছরে নিডলগুলো কক্ষপথের বাইরে ছিটকে পড়ে। মহাকাশ ব্যবস্থাপনার হুমকি বিবেচনা করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর বিরোধীতা করেন। পরবর্তীতে এই প্রকল্প তথন স্থণিত করা হয়।

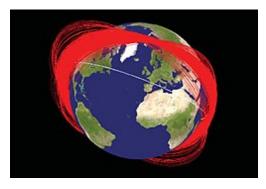
কক্ষপথে বৃহদাকার স্পেস ট্রাশের থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্জনাগুলো বেশি ক্ষতিকর। নিয়ন্ত্রণহীন বিকল স্যাটেলাইটের মধ্যকার পারস্পরিক সংঘর্ষ ও অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিশনের (ASAT) মত বিধ্বংসী ও আত্মঘাতী পরিকল্পনাগুলো এই আবর্জনা তৈরির জন্য সবথেকে বেশি দায়ী।

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র ৩০.৩: কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশ বর্জ্যের সাথে সংঘর্ষে ধ্বংসাবশেষ বর্জ্য তৈরি। ছবি সূত্র: ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি কক্ষপথের উদ্দেশ্যে চীন তাঁদের প্রথম অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিসাইল পাঠায়। আবহাওয়া পর্যবক্ষেণকারী ফেঙ্গুইন সিরিজের ৭৫০ কেজি ভরের ৮কি.মি/সেকেন্ডে ঘুরতে থাকা FY-1C স্যাটেলাইটটি তাঁরা ধ্বংস করে ফেলে। মিশনে তাঁরা সফল হলেও স্যাটেলাইটিরি প্রায় তিন হাজার ছোট ছোটু টুকরো ধ্বংসাবশেষ এখন পর্যন্ত কক্ষপথে ঘুরছে।



চিত্র ৩০.৪: চীনের FY-1C ধ্বংসের একমাস পরের ঘূর্ণয়ণরত ধ্বংসাবশেষের কক্ষপথ। ছবি সূত্র: উইকিপিডিয়া

২০০৮ আমেরিকা তাঁদের গুপ্তচর – স্যাটেলাইট USA-193 ধ্বংস করে।

২০১৫ সালে রাশিয়া তাঁদের PL-19 Nudol নামের অ্যান্টি-স্যাটেলাইট মিশন পরিচালনা করে। পরবর্তীতে ইসরাইল, ভারত ইত্যাদি দেশ যুদ্ধের সক্ষমতা দেখাতে অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিশন পরিচালনা করে। উপগ্রহগুলো ধ্বংসের পর সেগুলো বিচূর্ণ হয়ে যায়। পরবর্তীতে সেগুলোই পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। যুদ্ধ বিগ্রহ এখন কেবল পৃথিবীকেই অস্থির করে তুলছেনা, মহাকাশকেও অস্থির করে তুলছে। সামরিক সক্ষমতা দেখাতে গিয়ে ধ্বংসের লালসা আমাদের উপরিভাগকেও দিন দিন ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।



চিত্র ৩০.৫: ভারতের অ্যান্টি স্যাটেলাইট ASAT মিশনের একটি বিশ্লেষণ চিত্র। ছবি সূত্র: নিউস্কেইপ

এছাড়াও অনিচ্ছাকৃত ভাবে মহাকাশে সংঘর্ষ ঘটে থাকে। ১৯৯৪ সালে Soyuz TM-17 এবং রাশিয়ান মির স্পেস স্টেশনের সাথে ধীর গতির সংঘর্ষ ঘটে। ১৯৯৭ সালে Progress M-34 সাপ্পাই শিপের সাথে রাশিয়ার মির স্পেস স্টেশনের সাথে সংঘর্ষ ঘটে। ২০০৫ সালে USA DART spacecraft এবং কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট USA MUBLCOM মধ্যে লো স্পিড সংঘর্ষ ঘটে।

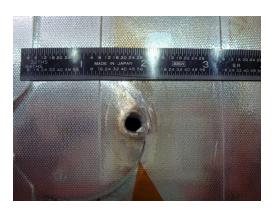
১৯৯৬ সালে ফ্রান্সের চেরিস মিলিটারি পুনরুদ্ধার স্যাটেলাইট ও আরিয়ানা রকেটের ধ্বংসাবশেষের সাথে উচ্চ গতির সংঘর্ষ ঘটে। ২০০৯ সালে ইরিডিয়াম-৩৩ ও রাশিয়ান মহাকাশযান কসমস্ ২২৫১ এর সাথে হাই স্পিড সংঘর্ষ ঘটে।

মহাকাশ আবর্জনা কেন ক্ষতিকর?

২০১৩ সালে চীনের অ্যান্টি স্যাটেলাইন মিশনে ধ্বংস হওয়া ফেব্লুইন-১ সি স্যাটেলাইটের ধ্বংসাবশেষের সাথে রাশিয়ান ন্যানো স্যাটেলাইট BLITS এর সাথে সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষের কিছুদিন পর থেকে এটার সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

২০১৮ সালে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির পরিবেশ গবেষণার জন্য প্রেরিত ক্রায়োসাট-২ স্যাটেলাইটটি একটি উচ্চ গতি সম্পন্ন ধ্বংসাবশে-ষের সাথে সংঘর্ষরে সম্মুখীন হতে যাচ্ছিলো। পরে স্যাটেলাইটটিকে নিম্ন কক্ষপথে নিয়ে এসে সেই সংঘর্ষের হাত থেকে রক্ষা করা হয়।

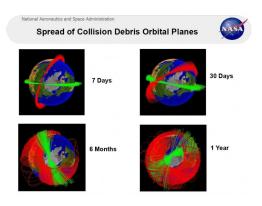
২০০৭ সালে উচ্চ গতিতে ঘূর্ণ্যমান একটি ক্ষুদ্র ধ্বংসাবশেষের টুকরার সাথে নাসার নভোখেয়াযান এনডেভারের সংঘর্ষ ঘটে। বস্তুটি এনডেভারের গায়ে ০.২৫ ইঞ্চির এইট ক্ষত সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে ক্ষতটি দ্বিগুন হয়ে যায়।



চিত্র ৩০.৬: স্পেস শাটল এনডেভারের সাথে স্পেস বর্জ্যের সংঘর্ষে সৃষ্ট ক্ষত। ছবি সূত্র: নাসা

কক্ষপথে ঘুরতে থাকা বস্তু নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে একের পর

এক বস্তু ধ্বংস হয়ে নতুন কোন ধ্বংসাবশেষ তৈরি করে। সেগুলো আবার পরবর্তীত অন্যান্য সক্রিয় বস্তুগুলোর জন্য হুমিক হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে কৃত্রিম ও অনিয়ন্ত্রিত সংঘর্ষগুলো প্রতিদিন বেড়েই চলছে। এক ধ্বংসাবশেষ থেকে তৈরি হচ্ছে নতুন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য আবর্জনা। যা কিনা কক্ষপথের সমস্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাকে হুমিকর মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

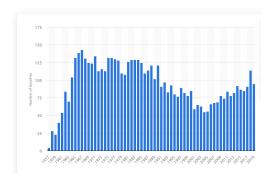


চিত্র ৩০.৭: সংঘর্ষের পর ধ্বংসাবশেষ অরবিটালে কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। ছবি সূত্র: নাসা

মহাকাশে কি পরিমাণ স্পেস জাঙ্ক রয়েছে?

পৃথিবীর নিম্নকক্ষপথ গুলোতে মহাকাশ বর্জ্যের পরিমাণ বেশি। কারণ সর্বোচ্চ ২০,০০০ কি.মি. উচ্চতায় LEO-তেই (LEO-Low Earth Orbit) অধিকাংশ কৃত্রিম উপগ্রহ ঘূর্নয়মান অবস্থায় রয়েছে। ১৯৫৭ সালে মহাকাশ যাত্রা শুরু করে এখন পর্যন্ত অবিরত চলছে। ১৮ নভেম্বর, ২০২০ সালে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মহাকাশ যুগের সূচনার পর থেকে এখন পর্যন্ত মোট ১০,৪৯০ টি স্যাটেলাইট মহাকাশে প্রেরণ করা হয়েছে। উপগ্রহগুলো প্রেরণের জন্য ৫৯৯০ টি রকেট ব্যবহার করা হয়। মহাকাশে ৬০৯০ টি

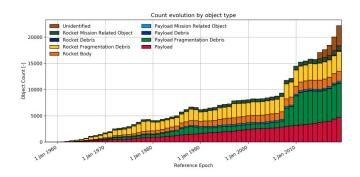
স্যাটেলাইট এখনো রয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে ৩৩০০-টি কৃত্রিম উপগ্রহ সক্রিয় রয়েছে। বাকিসব উপগ্রহগুলো মৃত ও বিকল অবস্থায় এখনও কক্ষপথে ঘুরছে। এদের মধ্যবর্তী ভাঙ্গন, বিক্ষোরণ, সংঘর্ষ ও অন্যান্য বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলির আনুমানিক সংখ্যা ৫৫০। নিয়ন্ত্রণহীন হওয়ার কারণে সংঘর্ষের ফলে আপনাআপনি কক্ষপথ পরিবর্তন করে অন্যসব সক্রিয় উপগ্রহের কর্মকান্ডে বাধা প্রদান করছে। এসব মৃত স্যাটেলাইট ও তাঁদের ধ্বংসাবশেষ স্পেস বর্জ্যে সৃষ্টির প্রধান কারণ।



চিত্র ৩০.৮: ১৯৫৭ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রেরিত স্যাটেলাইটের সমীক্ষা। ছবি সূত্র: স্টটিসটা.কম

ইউরোপিয়ান স্পেস এজেনির উক্ত তথ্য মতে ১০ সেন্টিমিটারের বড় এমন ৩৪,০০০ আবর্জনা বস্তু মহাকাশের কক্ষপথে ভ্রমণরত অবস্থায় রয়েছে। ১-১০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ৯ লক্ষ বর্জ্য মহাকাশে রয়েছে। ১মি.মি -১ সে.মি দৈর্ঘ্যের ১২০ মিলিয়ন ট্রাশ অবজেক্ট রয়েছে। এসকল বর্জ্যের ভর ৯১০০ টন। কোটি কোটি ক্ষুদ্র আবর্জনা বস্তু যা নিমিষেই কোন সক্রিয় স্যাটেলাইটকে যে কোন সময় ধ্বংসের মুখে ফেলে দিতে সক্ষম। এই বিপুল সংখ্যক মহাকাশ বর্জ্য মহাকাশের পরিবেশকে দিন অধিকতর অস্থির করে তুলছে।

আমরা যে কেবল কক্ষপথে আবর্জনা ফেলে রেখেছি তা নয় বরং আমাদের ফেলে রাখা বর্জ্য মহাকাশের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ছে। চাঁদের



চিত্র ৩০.৯: মহাকাশে কোন সময়ে কি ধরণের বর্জ্যের পরিমাণ বেড়েছে তার বিশ্লেষণ ছবি। ছবি সূত্র: ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি

পৃষ্ঠেও অনেক ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। চন্দ্র অভিযানের স্পেস শিপ ও রোবটণ্ডেলো সেখানে রয়ে গিয়েছে। অ্যাপোলো ১৫, ১৬, ১৭ এর বগি গুলো সেখানে রয়েছে। চন্দ্র পৃষ্টে অবতরণ করেছে বা ক্রাশ হয়ে পড়ে আছে এমন ৫৫ টি অভিযানের ধ্বংসাবশেষ সেখানে আছে। যার মোট ভর প্রায় দুই লক্ষ কেজি!

ভবিষ্যৎ ঝুঁকি কি?

সময়ের সাথে দিন দিন মহাকাশে অভিযান বেড়েই চলছে। স্যাটেলাইট মালিকের তালিকায় দিন দিন যুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশ সহ নতুন নতুন দেশ। বানিজ্যিক স্যাটেলাইটের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেস-রকারি মহাকাশ কোম্পানি স্পেস-এক্স ইন্টারনেট স্টারলিংকের জন্য এই বছর প্রতি মাসে একটি করে স্যাটেলাইট উড্ডয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই প্রকেল্পের আওতাধীন ইতোমধ্যে তাঁরা ৬০০ টিরও বেশি স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠিয়েছে। আরও ১০০০ স্যাটেলাইট উড্ডয়নের পরিকল্পনা তাঁদের রয়েছে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অ্যামাজন সম্প্রতি বিশ্বের ইন্টারনেট আন্তঃ-সংযুক্ত অংশগুলিতে ইন্টারনেট সংযোগ সরবরাহ করতে ৩০০০ এর বেশি উপগ্রহের একটি মেগা পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

গবেষণা সংস্থা ইউরোকনসাল্ট ২০২০ সালকে ছোট বা ক্ষুদ্র উপগ্রহের দশক হিসাবে পূর্বাভাস দিয়েছে এবং তাঁরা প্রতি বছর গড়ে এক হাজার ছোট (ন্যানো) স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরকম প্রকল্পগুলো সফল হলে খুব শীঘ্রই পৃথিবীর কক্ষপথে প্রায় ৫০,০০০ হাজার স্যাটেলাইট যুক্ত হবে। যা কক্ষপথে জট লাগাতে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। এসব প্রকল্পগুলোকে সফল করতে ও উপগ্রহগুলোকে নিরাপদ রাখার জন্য হলেও মহাকাশ পরিস্কার রাখা দরকার। মহাকাশের বর্জ্যে নিষ্কাষণ দরকার। নয়ত মহাকাশে স্যাটেলা-ইট জটের পাশাপাশি স্পেস জাঙ্কের সংঘর্ষের সব ধ্বংসের মুখোমুখি হবে।

১৯৭৮ সালে নাসার বিজ্ঞানী ডোনাল্ড কেসলার মহাকাশ বর্জ্য নিয়ে ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল -এর হয়ে তার একটি একটি গবেষণা প্রকাশ করেন। তিনি বলেছিলেন যে, কক্ষপথে যদি খুব বেশি জায়গার জঞ্জাল থাকে তবে এটি একটি চেইন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে যেখানে আরও বেশি সংখ্যক বস্তু সংঘর্ষে নেমে প্রক্রিয়াটি পৃথিবীর কক্ষপথকে অকেজো করে দিতে পারে। বিজ্ঞানী কেসলারের এই ধারণাকে কেসলার সিনড্রোম বলা হয়।

কিভাবে কক্ষপথ পরিস্কার করা যায়?

কক্ষপথ পরিস্কার রাখার চিন্তাকে মাথায় রেখে নাসা, রস-কসমস, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি সহ বিভিন্ন দেশের মহাকাশ সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ বেশ কিছু কার্যকরী সমাধান খুঁজে বের করেছে। তাঁদের প্রস্তাবিত বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে ৭ টি পদ্ধতি সমাদৃত হয়েছে। ডিফেন্স এডভান্সড রিসার্চ প্রজেন্ত্রস এজেন্সি (ডারপা) পরামর্শ দিয়েছে জাল, লেজার বা বড়শির মাধ্যমে বর্জ্যগুলোকে ধীরে ধীরে উচ্চ কক্ষপথ থেকে নিম্ন কক্ষপথে নিয়ে আসা হবে অতঃপর কক্ষপথের বাইরে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে ফেলে দিলে সেগুলো কক্ষপথ থেকে সরে আসবে। বাতাসের সাথে ঘর্ষণে আগুন ধরে পুড়ে ছাই হবে যাবে অথবা ভূপৃষ্ঠে পতিত হবে।

বর্জ্য শিকারি স্যাটেলাইট গুলো বড়শির মত আংটা দিয়ে বর্জ্যগুলোকে ধরে ফেলতে পারে। সেজন্য উচ্চ শক্তি সম্পন্ন চৌম্বকের ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছে।

রাশিয়ার মহাকাশ সংস্থা স্টার্ট-রকেট ফোম ব্যবহার করে বিপদজ্জনক বর্জ্যগুলো অপসারণের একটি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।



চিত্র ৩০.১০: রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা স্টার্ট-রকেট পলিমার ফোম ব্যবহার করে মহাকাশ বর্জ্য অপসারণ পদ্ধতি। ছবি: স্টার্ট-রকেট

স্যাটেলাইট দিয়ে জাল ব্যবহার করেও স্পেস আবর্জনাগুলোকে ধরে ফেলা সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। সেগুলো পরবের্তীতে স্পেস শা-টল দিলে পৃথিবীতে নিয়ে আসা হবে অথবা বায়ুমন্ডলে নিক্ষেপ করা হবে।

জাপানি অ্যারোস্পেস এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি ইলেকট্রোডায়নামিক পাওয়ার ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করে বর্জ্যের গতি কমিয়ে বর্জ্যগুলোকে ধীরে ধীরে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে ছিটকে ফেলার প্রস্তাবনা দিয়েছে।

এছাড়াও ফায়ারিং লেজার ব্যবহার করে বর্জ্যগুলোকে উত্তপ্ত করে পুড়ে ফেলে বা বায়মন্ডলীয় টান বাড়িয়ে সেগুলোকে অরবিট থেকে ফেলে দেওয়া সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

জাতিসংঘ ইতোমধ্যে সকল কোম্পানিকে মিশন শেষে তাঁদের স্যাটেলাই-টগুলোকে কক্ষপথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য ২৫ বছরের সময়সীমা দিয়েছে। অনেকটা জটিল প্রক্রিয়া হলেও বেশ কিছু কোম্পানি জাতিসংঘের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। ২০০০ সালে ইন্টার এজেন্সি স্পেস ডেব্রিস কোঅর্ডিনেশন কমিটি এ বিষয়ে কিছু নীতিমালা প্রনয়ণ করে।

২০১৮ সালে জুনে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের(আইএসএ) নভোচারীরা নিম্ন কক্ষপথের কিছু স্পেস বর্জ্য পরিস্কারের জন্য একটি স্পেসক্রাফট চালু করেন। যেটি সক্রিয় বর্জ্য অপসারণ (এডিআর) প্রযুক্তি ব্যবহার করে। ইউনিভার্সিটি অব সারে দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মহাকাশ যানটি বর্জ্য অপসারণের জন্য একটি জাল ও একটি হারপুন (আংটা), একটি ড্রাগ সেল ও দুটি কিউবসেট ব্যবহার করে। জাল এবং হারপুন বর্জ্যের লক্ষ্যে সফল হলেও অন্য দুটি ব্যর্থ হয়।

সম্প্রতি ২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর, ইউরোপিয়ান স্প্রেস এজেন্সি সুইস স্টার্টআপ কোম্পানী ক্লিয়ার স্প্রেস এস.এ. -র সাথে ১০২ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি করেছে। চুক্তি অনুযায়ী ২০২৫ সালে মহাকাশ আবর্জনা ধ্বংসাবশেষ অপসারণ মিশন পরিচালিত হবে। মিশনের প্রথম পর্যায়ে ১২০ কেজি ভরের একটি রকেটের ভেসপা পে-লোড অ্যাডাপ্টরকে অপসারণ করা হবে। যেটি ২০১৩ সালে একটি স্যাটেলাইট উড্ডয়নের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিলো। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এটিই হতে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে প্রথম মহাকাশ বর্জ্য অপসারণ মিশন।

তবে, এই পদ্ধতিগুলি কেবলমাত্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে বড় উপগ্রহগুলির জন্যই কার্যকর। ছোট ছোট টুকরো বর্জ্যগুরো অপসারণের জন্য এখন পর্যন্ত আমাদের সত্যিই কোন উপায় জানা নেই। আমাদের কেবল তাদের প্রাকৃতিকভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাই সবশেষ প্রশ্ন থেকেই যায় কক্ষপথে ভবিষ্যতে কি ঘটবে। সকল ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়বে নাকি তার পূর্বেই কোন সমাধান পাওয়া যাবে।

তথ্যসূত্র

- ♦ History of spaceflight Wikipedia
- ♦ What is space junk and why is it a problem?
 National Hustory Museum
- ♦ Space junk facts and information National Geographic
- ♦ What is Space Junk and What Can We Do About It? Earth.org
- ♦ The quest to conquer Earth's space junk problemNature
- Project West Ford Wikipedia
- ♦ 2007 Chinese anti-satellite missile test Wikipedia
- ♦ Endeavor Space Debris Damage USGS
- ♦ 29 thoughts on "How many satellites are orbiting the Earth in 2018?" − Pixalytics.com
- ♦ UCS Satellite Database ucsusa.org
- ♦ ESA Space debris by the numbers European Space Agency

- ♦ How many satellites orbit Earth and why Space Traffic Mgmt is crucial − GEOSPATIAL WORLD
- ♦ Space Junk Clean Up: 7 Wild Ways to Destroy Orbital Debris - Space.com
- ♦ space debris Facts, Removal, & Research Britannica
- ♦ Astronaut Drops a Mirror During a Spacewalk. Now There's Another Piece of Space Junk – Universe Today
- ♦ Watch a satellite spear space debris with a harpoon − The Verge
- ♦ Nations Collaborate to Remove Space Debris from Low Orbit – Laboratory Equipment



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

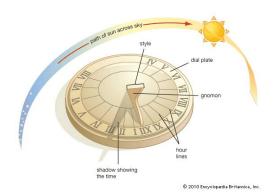
§ 03



ঘড়ি আবিষ্কারের গল্প

সাজেদা আক্তার জেরিন

ময় জানা এখন খুব মামুলি একটি বিষয় হলেও যখন ঘড়ি ছিল না তখন সঠিক সময় জানা ছিল অসাধ্য একটি কাজ। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরীয়রা প্রথম সূর্যঘড়ি বা ছায়াঘড়ি নামে এক ধরণের ঘড়ি আবিষ্কার করেছিল। এর আগে মানুষ সময় বুঝতো দিনের আলো বা রাতের তারা দেখে। মিশরীয়রা সময় নির্ণয় করতে খোলা জায়গায় একটি লাঠি পুতে রাখতো। সেই লাঠিকে ঘিরে ছোটো বড় কিছু চক্র এঁকে সময়ের সংকেত লিখে রাখতো। লাঠির ওপর সূর্যের আলো পড়লে তার ছায়া পড়তো মাটিতে, তা থেকেই সময় বোঝা যেত। এটাই ছিল সূর্যঘড়ি। এমন একটি ঘড়ি আজোরক্ষিত আছে বার্লিন মিউজিয়ামে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টেও এই ঘড়ির কথা উল্লেখ রয়েছে। সেখানে এই ঘড়িকে বলা হয়েছে 'ডায়াল অব আহাজ'। তখনো ইংরেজি 'Clock' শব্দটির উদ্ভব হয়নি। মাত্র ৭০০ বছর আগে ল্যাটিন শব্দ 'Clocca' থেকে 'Clock' শব্দটি এসেছে।

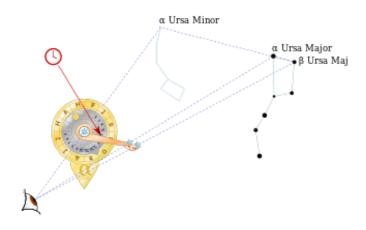


চিত্র ৩১.১: সূর্যঘড়ি

তারাঘড়ি

সূর্যঘড়ি দ্বারা দিনের সময় জানা গেলেও রাতের সময় বোঝা যেত না। এজন্য জার্মানরা তৈরি করেছিলো তারাঘড়ি। তারাঘড়ি মূলত আকাশের বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

কয়েকটি তারা, যা দেখতে অনেকটা 'w' এর মতো। এটা আকাশের উত্তর দিকে ওঠে আর ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যায়। এ তারাগুচ্ছ মেরুকে কেন্দ্র করে ঘড়ির কাঁটার মত ঘুরতে থাকে যা দিয়ে অনায়াসে সময় নির্ধারণ করা সম্ভব। এর নাম 'ক্যাসিওপিয়া'।



চিত্র ৩১.২: তারা দেখে কিভাবে সময় নির্ধারণ করা হয়। এখানে সপ্তর্ষীমন্ডলকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

জলঘড়ি

খ্রীষ্ট পূর্ব ১৪ শতকে মিশরীয়রা জলঘড়ি প্রচলন করে। একটি ফানেলের মধ্যে জল ভরে তার নিচে লাগানো হতো একটি সরু পাইপ। ফানেলের জল পাইপ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তো একটি জারে। জারটিতে ২৪ টি দাগ দেয়া থাকতো। এতে কতটুকু পানি জমা হলো তা থেকে নির্ণয় করা হতো সময়।প্রাচীন ইরানে জলঘড়ি ব্যবহার করা হত কৃষি কাজে এবং ঋতুর হিসাব রাখার জন্য। তাঁদের জলঘড়ি মিশরীয় সভ্যতার চেয়ে ভিন্ন ছিলো। সে সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বছরের বড় দিন ও ছোট দিন নির্ণয়ে সমর্থ হয়েছিল। বছরকে বিভিন্ন ঋতুতে বিভক্ত

করা হয়েছিল পারস্য শাসন আমলেই। পৃথিবীর বহুদেশে এই জলঘড়ি জনপ্রিয়তা পায়। এটিতে সূর্যঘড়ির মত অসুবিধা ছিল না, ফলে এটি দিনে-রাতে ব্যবহার করা যেত এবং যেকোন স্থানে বহন করা যেত। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালতে এই ঘড়ি ব্যবহৃত হতো। আমদের দেশে রাজধানী ঢাকা সহ অন্যান্য শহরেও জলঘড়ি ও সূর্যঘড়ির প্রচলন ছিল। তবে এত সুবিধা থাকার পরেও জলঘড়ির কিছু অসুবিধা ছিল। এই ঘড়ি জাহাজে ব্যবহার করা যেত না। এছাড়া শীতপ্রধান দেশগুলোতে এ ঘড়ি ছিল অচল। ফলে মানুষ জলঘড়ির বিকল্প খোঁজা শুরু করে।

বালুঘড়ি

বারোশ খ্রিস্টাব্দে তৈরী হয় বালুঘড়ি। বালুঘড়ি ছিল কিছুটা জলঘড়ির মতোই। তবে এ ঘড়ির ফানেলের মাঝখানটা সরু। ফানেলের ওপরের অংশে কিছুটা বালি ঢেলে দিলে সেই বালি ফানেলের মাঝখানে যেয়ে বাধা পেয়ে ধীরে ধীরে নিচে পড়তে থাকে। ফানেলের নিচের অংশে আঁকা হতো সময় নির্দেশক স্কেল। জমা হওয়া বালির পরিমাণ থেকে নির্দিষ্ট সময় বোঝা যেত।

মোমবাতি আবিষ্কারের পর থেকে সময় নির্ণয়ে মোমবাতির ব্যবহার শুরু হয়। মোমঘড়িতে ১২ ইঞ্চি লম্বা ৬টি মোমবাতি পাশাপাশি রাখা হয়। প্রত্যেকটি মোমবাতি সমান পুরুত্বের হত এবং তাদের গায়ে প্রতি ১ ইঞ্চি অন্তর অন্তর দাগ কাটা থাকতো। প্রতিটি মোমবাতি চার ঘন্টা জ্বলত। তাই মোমবাতির গায়ে কাটা প্রতিটি দাগ ২০ মিনিট প্রদর্শন করত। একটি নির্দিষ্ট আকৃতির মোমবাতি পুড়ে শেষ হতে কত সময় লাগছে তা থেকে সময় নির্ণয় করা হতো। সেই সময় মোমঘড়ি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল।

এগুলো সবই প্রাচীন ঘড়ির ধরণ। জানা যাক ঘড়ির আধুনিক সংস্করণ সম্পর্কে।

অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ঘড়ি

১১ শতকে চীনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী হরলজিস এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সু সং একত্রে কাজ করে পানি চালিত একটি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ঘড়ি তৈরী করেন তাদের শহরের কেন্দ্রে স্থাপন করার জন্য। বিশেষজ্ঞরা বলেন, পুরোপুরি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরী প্রথম ঘড়ি হচ্ছে ক্লক। কেউ কেউ মনে করেন গ্রীক পদার্থবিদ আর্কিমিডিস খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে প্রথম ক্লক আবিষ্কার করেন। আর্কিমিডিস চাকাযুক্ত ঘড়ি তৈরী করেছিলেন। সর্বপ্রথম গির্জায় এ ধরণের ঘড়ির প্রচলন হয়। এসব ক্ষেত্রে ভারি কোনো বস্তুকে একটি চাকার সাথে যুক্ত করা হতো। ফলে মহাকর্ষ শক্তির টানে চাকাটি ঘুরতে থাকতো। কিন্তু চাকার এই ঘুর্ণনকে বিশেষ কৌশলে নিয়ন্ত্রন করা হতো যাতে চাকাটি ধীরে ধীরে ঘুরে। এই চাকার সাথে লাগিয়ে দেওয়া হতো সময় নির্দেশক কাঁটা। পরে এ ধরণের ঘড়িতে ডায়ালের প্রচলন শুরু হয়। ১২০৬ সালে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল-জাহেরি নামাজ ও রোজার সময় সঠিক ভাবে নির্ণয় করার জন্য পানি চালিত অন্য একটি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ঘড়ি তৈরী করেন যাতে একবার পানি পূর্ণ করে দিলে ঘড়ি অনেক দিন এমনকি এক বছরও চলত।

মেকানিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ঘড়ি

১৪৬২ সালে Prague Astronomical Clock নামে একটি ঘড়ি তৈরী করা হয় যার মধ্যে বিভিন্ন সাইজের গিয়ার বক্স সংযুক্ত করা হয়েছিল। এই ঘড়িতেই সর্বপ্রথম ঘন্টা, মিনিট এবং সেকেন্ডের কাঁটার সূক্ষ্ম ব্যবহার করা হয়। ১৪ শতকের দিকে ম্যাকানিক্যাল ঘড়ি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরে। ১২৮৮ সালে ওয়েস্ট মিনিস্টার হলে এবং ১২৯২ সালে ক্যান্টাবেরি ক্যাথিড্রালে এই ধরণের ঘড়ি বসানো হয়। মধ্যেযুগে ক্লকের প্রচলন অনেক বেড়ে যায়। তবে এদের কোনটাই সঠিক সময় দিত না। ১৩৬৪ সালে ফ্রান্সের রাজা পঞ্চম চার্লস একটি

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

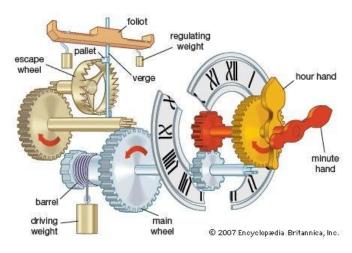


চিত্র ৩১.৩: প্রাগের বিখ্যাত ঘড়ি। সূত্র: উইকিপিডিয়া

ঘড়ি নির্মাণ করার পরিকল্পনা করেন। ১৫ বছর পর এ ঘড়ি নির্মাণ শেষ হয়। এটাই ছিল সে যুগের সবচেয়ে আধুনিক ঘড়ি।

দোলক ঘড়ি

নিখুঁত সময় নির্ণয়ের জন্য এরপর মানুষ ঘড়ি তৈরীতে স্প্রিংয়ের ব্যবহার শুরু করে। ফলে ঘড়িগুলোর আকার অনেক কমে আসে। যোল শতকে ইউরোপে নবযুগের সূচনা হয়। এ সময় ঘড়ির অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়। এরপর বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও প্রথম দোলকের ধর্ম সম্পর্কিত সূত্র আবিষ্কার করেন। যা পরবর্তীতে ঘড়িতে ব্যবহৃত হয়। ফলে আমরা বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



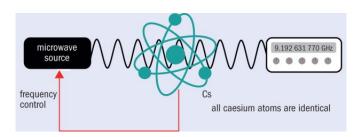
চিত্র ৩১.৪: পেন্ডুলাম ঘড়ির যন্ত্রাংশ

পাই দোলকযক্ত ঘডি। পরে আঠারো শতকে ঘডি নির্মাণের ক্ষেত্রে আরো অনেক উন্নয়ন ঘটে। এই ঘড়ির আবিষ্কারক বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। তিনি দোলকের দোলনকালকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম দোলক ঘডির थिउति मां करतिष्टलन। जाँत थिउतिरक कार्क नागिरा छा विछानी मि. হাইজেনস সর্বপ্রথম দোলক ঘড়ি তৈরী করেন।১৬৭৩ সালে ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্স একটি ঘড়ি তৈরী করেন যেটি দোলক ঘড়ির একটি সংস্করণ ছিলো। দোলক ঘড়ি বৃত্তীয় বক্রপথে এজন্য এই ঘডির দোলন-কম্পাঙ্ক তার দোলন-বিস্তারের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। যত বেশী বিস্তারে দুলতে দেওয়া হয়, কেন্দ্রে ফেরত আসতে ববের তত বেশী সময় লাগে। ববটি যদি একটি সাইক্লয়েডীয় বক্রপথে দুলতো, তাহলে আর এই সমস্যাটি থাকতো না। কারণ সাইক্লয়েডের বৈশিষ্ট্য হলো. এর উপরকার যে কোন দৃটি বিন্দু হতে মহকর্ষের প্রভাবে কেন্দ্রে গড়িয়ে আসতে কোন বস্তুর একই পরিমাণ সময় লাগে। ক্রিশ্চিয়ান হাইগেনস সমুদ্র-সমতলে নিখুঁতভাবে দ্রাঘিমাংশ পরিমাপ করার প্রয়োজনে এমন একটি দোলক ঘড়ি তৈরী করেন যার ববটি একটি সাইক্লয়েডীও বক্রপথে দোলে। তাঁর নামানুসারে এই ঘড়ির নাম দেওয়া হয় হাইগেনের ঘড়ি। তিনি ববটিকে সূক্ষ সূতার সাহায্যে ঝুলিয়ে দেন এবং দোলন নিয়ন্ত্রণের জন্য সুতাকে কেন্দ্রে রেখে দুই পাশে দুইটি সাইক্লয়েড আকৃতির দন্ড সংযোজন করেন। ফলে দোলেনের সময় যেকোন পাশে ববটি যখন কেন্দ্র থেকে দূরে সরতে থাকে এবং সুতাটি একটু একটু করে সাইক্লয়েড আকৃতির দন্ডের সংস্প-র্শে আসতে থাকে, যার দরুন ববের অনুসৃত গতিপথটি হয় সাইক্লয়েডীয়।

১৮১৪ সালে স্যার ফ্রান্সিস রোনাল্ড লন্ডনে সর্বপ্রথম ব্যাটারী চালিত ঘড়ির প্যাটার্ন তৈরি করেন। ১৮৪১ সালে আলেকজেন্ডার বেইন এবং জন বারউইচ সর্বপ্রথম ব্যাটারী চালিত দোলক ঘড়ি প্রস্তুত করেন।

ডিজিটাল ঘড়ি

ডিজিটাল ব্যাটারী চালিত ঘড়ির আগমনে কাঁটা ঘড়ির অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হতে চললো। এ ঘড়ির সাহায্যে সরাসরি সংখ্যায় সময় জেনে নেওয়া যায়। এতে প্রতি ৬০ সেকেন্ড পর পর মিনিটের সংখ্যা পরিবর্তিত হয় এবং ৬০ মিনিট পর পর ঘন্টার সংখ্যা পরিবর্তন হয়। ডিজিটাল ঘড়ির সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম সময়ও জানা যায়। ঘড়ির বহু পরিবর্তনের পর ১৮৮৩ সালে জোসেফ পালয়েবার সর্বপ্রথম পকেটে বহনযোগ্য ডিজিটাল ঘড়ি তৈরি করেন। এরপর ১৯৭০ সালে LED ডিসপ্লে যুক্ত প্রথম হাতঘড়ির প্রচলন হয়।



চিত্র ৩১.৫: ছবিটি Physics World থেকে নেওয়া

এটমিক ঘড়ি

এটমিক ঘড়ি হলো সবচেয়ে সঠিক এবং সুক্ষ্মভাবে সময় নির্ণয় করার যন্ত্র। এই ঘড়ির সাহায্যে এক সেকেন্ডের কয়েক লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাপা সম্ভব। ১৮৭৯ সালে লর্ড কেলভিন সর্বপ্রথম এটমিক ঘড়ি ব্যবহারের প্রস্তাব দেন। ১৯৪৯ সালে এটমের কম্পন মাপার যন্ত্র আবিষ্কার হয় আমেরিকায়। তখন থেকেই বিজ্ঞানীরা ঘড়ি তৈরি করার জন্য বিভিন্ন অ্যাটম নিয়ে কাজ করতে থাকে।১৯৫৫ সালে সিজিয়াম ১৩৩ পরমাণুর কম্পনের সাহায্যে প্রথম ঘড়ি তৈরি করা হয়। এটমিক ঘড়ির ক্ষেত্রে সেকেন্ডের সংজ্ঞা হল শূন্য কেলভিন তাপমাত্রায় একটি অনুত্তেজিত সিজিয়াম ১৩৩ পরমাণুর ৯,১৯২,৬৩১,৭৭০ টি স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাকে ১ সেকেন্ড বলে। বর্তমানে হাইড্রোজেন এবং রুবিডিয়াম পরমাণু নিয়েও কাজ করা হচ্ছে আরও সূক্ষ্মভাবে সময় মাপার জন্য।

স্মার্টওয়াচ

হাতঘড়ির সর্বাধুনিক রূপ হচ্ছে স্মার্ট্য়াচ। আগেকার সাধারণ ডিজিটাল হাতঘড়িতে ক্যালেন্ডার, ক্যালকুলেটর প্রভৃতি থাকলেও সর্বপ্রথম স্মার্ট্ওয়াচ চালু হয় ২০১০ সালে। এই স্মার্ট্ ওয়াচগুলোতে বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপ চালানো যেত। বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন স্মার্ট্ওয়াচে অভিও-ভিডিও প্লেয়ার, ক্যামেরা, এফ এম রেডিও, ব্লুটুথ, জিপিএস, ইন্টারনেট, অয়াইফাই সব ধরনের প্রযুক্তিই যুক্ত করা হয়েছে। একটি স্মার্ট্ফোন দিয়ে যা যা করা যায় তার প্রায় সবই এখন করা যাচ্ছে স্মার্ট্ওয়াচ দিয়ে। এছাড়া স্মার্ট্ওয়াচ খুব সহজেই স্মার্ট্ফোনের সাথে ব্লুটুথ কিংবা ওয়াইফাই দিয়ে যুক্ত করে স্মার্ট্ফোনের কল কিংবা মেসেজ রিসিভ করা যায়। হাঁটার সময় স্টেপ কাউন্ট, হার্টবিট নির্ণয়, ঘুমের হিসাব রাখা ইত্যাদি কাজও আজকাল করা যাচ্ছে স্মার্ট্ওয়াচের মাধ্যমে। প্রায়্ন সব স্মার্ট্ফোন র্নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আজকাল স্মার্ট্ওয়াচের মাধ্যমে। প্রায়্ন সব স্মার্ট্ফোন র্নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আজকাল স্মার্ট্ওয়াচের নির্মাণে মনোযোগ দিয়েছে। ফলে

আশা করা যাচ্ছে সামনের দিনগুলোতে আরও উন্নতি ঘটবে স্মার্টওয়াচের।

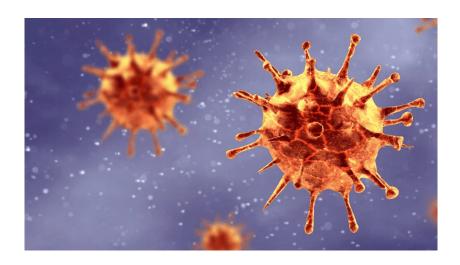
তবে একটি কথা, যতো উন্নত প্রযুক্তিই আসুক না কেনো মানুষের পক্ষে কখনো সময়কে ধরে রাখা সম্ভব নয়। সময় তার আপন গতিতেই বয়ে যেতে থাকবে।

তথ্যসূত্র

🗞 সময়-নির্ধারণ যন্ত্রের ইতিহাস – উইকিপিডিয়া



§ ৩২



অনকোলাইটিক ভাইরাস থেরাপি

মনির হোসেন

রোনামটা একটু কঠিন মনে হতে পারে, তাই শুরুতে কয়েকটা সংজ্ঞা পরিষ্কার করে নিলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাবুঝতে সুবিধা
হবে। অনকো (onco) শব্দের অর্থ টিউমার (tumor), আর
লাইটিক (lytic) মানে ধ্বংস বা বিনাশ করা (destruction)। অতএব,
অনকো লাইটিক মানে হলো টিউমারকে ধ্বংস করা বা বিনাশ করা।
এখন, যদি বলি অনকো লাইটিক ভাইরাস, তার মানে দাঁড়ায়, যে
ভাইরাস টিউমারকে ধ্বংস করে। তাহলে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, অনকো লাইটিক ভাইরাস থেরাপি হলো ভাইরাস দিয়ে টিউমার চিকিৎসা করা।

ব্যাপারটা খুবই ইন্টারিস্টং, তাই তো! কিন্তু মনে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়?

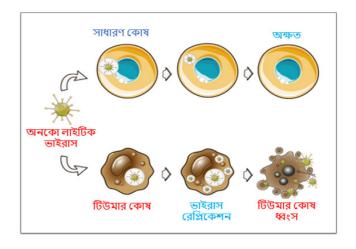
ভাইরাস টিউমার কে বিনাশ করবে কিভাবে? ভাইরাস তো নি-জেই ক্যান্সার বা টিউমার হতে সাহায্য করে। যেমন হেপাটাইটিস বি ভাইরাস (HBV) লিভার ক্যান্সার হতে সাহায্য করে, অন্যদিকে হি-উম্যান পেপিলোমা ভাইরাস (HPV) জরায়ুর ক্যান্সার হতে সাহায্যে করে।

প্রশ্নের উত্তর খুজতে হলে, সর্বপ্রথম দুইটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার, এক ভাইরাস কী? দুই টিউমার বা ক্যন্সার কী?

ভাইরাস কী?

ভাইরাস হলো এমন কণা বা বস্তু যা আমাদের কোষগুলিকে সংক্রামিত (infect) করে কোষের ভিতরে প্রবেশ করে। তারপর, কোষের জেনেটিকাল ম্যাটারিয়াল ব্যবহার করে নিজের অনুলিপি (copy) তৈরি করে এবং অবশেষে তৈরিকৃত নতুন ভাইরাসগুলো কোষটা ধ্বংস করে পরবর্তীতে আশেপাশের অরক্ষিত কোষগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে, যা লাইটিক সাইকেল নামে পরিচিত।

অপর দিকে এমন কিছু ভাইরাস আছে যারা কোষে প্রবেশ করার পরে তাদের জেনেটিকাল ম্যাটারিয়াল গুলো ওই কোষের জেনেটিক ম্যাটারিয়ালের সাথে যুক্ত করে দীর্ঘদিন সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে, যা লাইসোজেনিক সাইকেল নামে পরিচিত। যা পরবর্তীতে লাইটিক সাইকেলে পরিবর্তিত হতে পারে।



চিত্র ৩২.১: অনকো লাইটিক ভাইরাস থেরাপি। সূত্র: Creative Biolabs

টিউমার বা ক্যন্সার কী?

আমরা জানি, আমদের শরীরের কোষগুলো একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর মারা যায়। এই পুরনো কোষগুলোর জায়গায় নতুন কোষ এসে জায়গা করে নেয়। সাধারনভাবে কোষগুলো নিয়ন্ত্রিতভাবে এবং নিয়মমতো বি-ভাজিত হয়ে নতুন কোষের জন্ম দেয়।

যদি কোনো কারনে এইসব সাধারন কোষগুলো একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর মারা না যায়, তাহলে কি ঘঠনা ঘতে পারে? হ্যাঁ, ঠিক তখনই শরীরে অনিয়ন্ত্রিতভাবে কোষের সংখ্যা বাড়তে থাকে যার ফলে ত্বকের নিচে মাংসের দলা অথবা চাকা দেখা যায়, যাকে টিউমার বলে। যা পরবর্তীতে ক্যান্সারে রুপান্তরিত হয়। তার মানে, যদি একেবারেই সহজ করে বলি সাধারণ কোষ একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে মারা যায় আর টিউমার বা ক্যান্সার কোষ একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে মারা যায় না।

যদি কোনভাবে টিউমার বা ক্যান্সার কোষগুলোকে বিনাশ করা যায় তাহলে অতি সহজে ক্যান্সারকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। আর এখন পর্যন্ত ক্যান্সার বা টিউমারের যতগুলো চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে যেমন কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি সবগুলো ট্রিটমেন্ট এর মূল উদ্দেশ্য হলো ক্যান্সার বা টিউমার কোষকে ধ্বংস করা।

উপরে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি যে,ভাইরাস সাধারণ কোষকে লাইটিক সাইকেলের মাধ্যমে ধ্বংস করতে পারে, ভাইরাসের এই বৈশিষ্ট্যটাকে কাজে লাগিয়ে যদি টিউমার কোষকে ধ্বংস করা যায়, তাহলে খুব সহজেই টিউমাররে চিকিৎসা করা যাবে। যা জীববিজ্ঞানের ভাষায় অনকো লাইটিক ভাইরাল থেরাপি নামে পরিচিত।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, ভাইরাস যে টিউমার বা ক্যনাসার কোঙ্কে বিনাশ করতে পারে তা আবিষ্কার হলো কীভাবে?

এইতো, ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত রিপোর্টে ছিলো যে ভাইরাস কাকতালীয় ভাবে টিউমারকে রিগ্রেশন করে পারে, কিন্তু তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কিংবা ধারনা কারোই জানা ছিলো না।

পরবর্তীতে, ১৯০০ সালের শুরুতে দেখা গেলো অনেক ক্যন্সার আক্রান্ত রোগী সাধারণ ভাইরাস দ্বারা আকান্ত হওয়ায় আশ্চর্যজনকভাবে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়। তারপরেই ব্যাপারটা নিয়ে সব মহলে একটা ব্যপক সাড়া পড়ে যায়।

১৯০৪ সালের ঘটনা, ৪২ বছরের এক মহিলা ক্রোনিক মায়োলেজেনাস লিউকেমিয়ায় (chronic myelogenous leukemia) আক্রান্ত ছিলেন, যার কারণে উনার শরীরে প্রচুর পরিমাণের শ্বেত রক্তকণিকা ছিলো। উনি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হসপিটালে ভর্তি হন। তখন এই ব্যাপারটা দৃষ্টিগোচর হলো যে ভাইরাল ইনফেশনের কারনে তার শ্বেত রক্ত কনিকা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গিয়েছে।

এই পর্যবেক্ষণগুলো দ্বারা বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছিলো যে সরাসরি ভাইরাস দিয়ে বা ভাইরাসের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে ক্যান্সার চিকিৎসা করা যেতে পারে।

অবশেষে, ১৯৪৯ সালে সর্বপ্রথম হেপাটাইটিস বি ভাইরাস দিয়ে (Hodgkin's disease) হটগিনক্স ডিজিজে আক্রান্ত ২২ জন রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছিলো। এবং তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে Egypt virus, APC virus, Mumps virus ইত্যাদি ভাইরাস দিয়ে বিভিন্ন ক্যন্সার আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করা শুরু হইয়েছিলো। যদিও সেই সময় সম্পুর্ণ সুস্থ হওয়ার হারটা কম ছিলো কিন্তু তা সত্ত্বেও এই আবিষ্কার খুলে দিয়েছে ক্যন্সার চিকিৎসার এক বিশাল দ্বার।

১৯৯১ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা একটু নতুনভাবে ভাবতে শুরু করলেন। তারা ভাইরাসের ভিরুলেন্ট (virulent) অংশটা (ভাইরাসের যে অংশটি রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে বাদ দিয়ে দেন। বিজ্ঞানীরা সেই জেনেটিক্যালি মডিফাইড ভাইরাস দিয়ে ক্যান্সার চিকিৎসার নতুন পদ্ধিতি আবিস্কার করেন। এই পর্যায়ে সফলাতার হার অনেক অংশে বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

২০০৫ সালে সর্বপ্রথম চীনে (nasopharyngeal cancer) নসোফে-রিংজিয়াল ক্যান্সার চিকিৎসায় জেনেটিক্যালি মডিফাইড H101 virus ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া হয়। তারও ১০ বছর পরে ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে FDA (US Food and Drug Administration) বিশ্বব্যাপী T-VEC ভাইরাসকে (যা herpes simplex virus এর মডিফাইড স্ট্রেইন) অনকোলাইটিক ভাইরাস হিসেবে ক্যান্সার চিকিৎসার অনুমোদন দেয়। যদিও বর্তমানে আরো অনেক গুলো অনকো-লাইটিক ভাইরাস ট্রায়েল ফেইজে আছে।

সব কিছুর পরেও একটা কথা কিন্তু থেকে যায় কারণ অনকো-লাইটিক ভাইরাস থেরাপি নিয়ে এখনো আমদের অনেক কিছু অজানা। তাছাড়া রয়েছে কিছু সীমাবদ্ধতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা আশাবাদী। সেদিন হয়তো আর বেশি দেরি নেই যেদিন ভাইরাস দিয়ে আমরা ক্যঙ্গারকে জয় করবো।



§ 99



বিশেষ আপেক্ষিকতার বিশেষ ভর: আপেক্ষিক ভর কি সত্যি?

মুবতাসিম ফুয়াদ

স্তুর বেগ কখনোই আলোর বেগের সমান হতে পারে না - এ কথাটা আমরা সবাই কম বেশি জানি। স্পেশাল রিলেটিভিটির (বিশেষ আপেক্ষিকতা) জ্ঞান না থাকলেও জনপ্রিয়ধারার বিজ্ঞান কন্টেন্টের প্রভাবে কৌতৃহলী পাঠকদের কাছে এটা আর অজানা নয়। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে কেন বস্তুর বেগ আলোর বেগের সমান হতে পারে না? আর একটু ঘাটতেই তারা চট করে পেয়ে যায় একটা প্রচলিত ব্যাখ্যা এবং তাতে সম্ভুষ্ট হয়ে যায়। সেই ব্যাখ্যাটা সহজ কথায় এরকমঃ ''বস্তুর ভর আপেক্ষিক। বেগ বাড়ার সাথে সাথে তার ভরেরও পরিবর্তন হয়। তাই কেউ যদি বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে করে বেগ বাড়াতে বাড়াতে আলোর বেগের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করে, সে দেখবে বেগ না বেড়ে ভর বেড়ে যাচ্ছে।" তো এই ব্যাখ্যার ভিত্তি 'আপেক্ষিক ভর' বিষয়টা কতটুকু যৌক্তিক? গতির জন্য বস্তুর ভর কি সত্যিই পরিবর্তন হয়?



চিত্র ৩৩.১: ভরের আপেক্ষিকতা – কার্টুন ছবিটি ইউটিউব চ্যানেল minutephysics থেকে অনুপ্রাণিত।

স্পেশাল রিলেটিভিটির ধারণা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সেই ১৯০৫ সালে। মাঝে শত বছরের বেশি পেরিয়ে গিয়েছে। কাল দীর্ঘায়ন, দৈর্ঘ্য সংকোচনের পাশাপাশি ভর বৃদ্ধির কথাও তো স্পষ্টভাবে বলা থাকে জনপ্রিয়বিজ্ঞানের বিভিন্ন লেখালেখিতে, এইচএসসির পদার্থবিজ্ঞান বইয়ে,

স্নাতক পর্যায়ের অনেক পাঠ্যবইতে। তাহলে আপেক্ষিক ভরের বিষয়ে যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতার প্রশ্ন আসছে কেন? আসলে শুরুর দিকে আপেক্ষিকতার বিভিন্ন ধারণা খোদ আইনস্টাইন-সহ তৎকালীন পদার্থবিদেরা ঠিকমত বুঝতে পারেননি। তেমনই একটা সে-কেলে ধারণা হচ্ছে আপেক্ষিক ভর। এই ধারনাটা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে বেশ কিছু সময় লেগেছে। কিন্তু ততদিনে তা পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়ে গিয়েছিল। পুরান বইয়ে থাকা সেই স্থির-ভর্ গতিশীল-ভর এর কনভেনশনটাই পরের প্রজন্মের বইগুলো অনুসরণ করতে থাকে। এবং বর্তমানের অনেক পাঠ্যবইয়ে সেই অনুসরণ এখনো চলমান। কারণ সেইসব বই-লেখকদের মতে. এটা ব্যবহার করে ইন্ট্রোডাক্টরি পর্যায়ে রিলেটিভিটি বোঝানো সহজ হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিক্ষার্থী, শিক্ষক, লেখকদের মধ্যে এই ধারণাটি এমনভাবে গেথে গিয়েছে যে এটাকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে pedagogical virus হিসেবে। যাই হোক, পদার্থবিদেরা যারা বর্তমানে প্রফেশনালি আপেক্ষিকতা নিয়ে কাজ করেন, তারা কিন্তু কেউ আর স্থির-ভর গতিশীল-ভর টার্মগুলো ব্যবহার করেন না। তাদের নতুন কনভেনশন অনুসারে ভর দুইরকম নয়, বরং একটাই। আগের কনভেশনে স্থির ভর বলতে যা বোঝানো হতো, সেটাই হল একমাত্র ভর। রিলেটিভিটির আধুনিক পাঠ্যবইগুলোতে আপনারা এই নতুন কনভেনশনই দেখতে পাবেন। বার বার 'নতুন কনভেনশন' বলায় ভেবে বসবেন না যে ভরের ধারণার এই পরিবর্তন হয়েছে সাম্প্রতিক। তা কিন্তু নয়, বরং এই নতুন কনভেনশন পদার্থবিদেরা ব্যবহার করে আসছেন গত অর্ধ শতক ধরে।

আজকের এই লেখায় আমরা গাণিতিক ভাবে দেখব কিভাবে ভর অপরিবর্তনশীল থাকে। দেখব কেন আপেক্ষিক ভরের ধারণাটা আনা হল; সেই সাথে এই ধারণার অসুবিধা বা অযৌক্তিকতাও কিছুটা দেখার চেষ্টা করব এই লেখায়। চলুন শুরু করা যাক। লেখাটিকে তিনটা সেকশনে ভাগ করেছিঃ

😝 ভেক্টর এবং স্থানাংক পরিবর্তন

- ৡ বিশেষ আপেক্ষিকতায় ভর
- 🗞 আপেক্ষিক ভরের অবতারণা

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইল, কোন সেকশন বাদ না দিয়ে পুরোটুকু পড়বেন। লেখায় গণিত আছে বিধায় অনেক পাঠক হয়তো শুরুতেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু যদি পদার্থবিজ্ঞানে সত্যিকার আগ্রহ থাকে, তাহলে গণিতে অনীহা কাম্য নয়। গণিত লুকিয়ে পদার্থবিদ্যার এই বিষয়গুলো চর্চার একটা প্রবণতা দেখা যায়। তাই ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়েও অনেকে এসব বিষয়ে Illusory superiority (Dunning-Kruger effect) অনুভব করেন। প্রয়োজনীয় গণিত থাকলে এই প্রভাব কিছুটা কমানো যাবে, আশা করছি।

ভেক্টর এবং স্থানাংক পরিবর্তন

বিশেষ আপেক্ষিকতার গণিতে যাওয়ার আগে চলুন প্রথমে ভেক্টর এবং কোঅর্ডিনেট (স্থানাংক) পরিবর্তনে ভেক্টরের স্বরূপ কেমন হয় সেবিষয়গুলো রিভিউ করে আসি।

ধরা যাক, একটা ভেক্টর, ঠিক করে বললে পজিশন ভেক্টর হল \vec{X} । এটাকে একটা দ্বিমাত্রিক কার্টেশিয়ান কোঅর্ডিনেটে থেকে আমরা লিখি এভাবেঃ

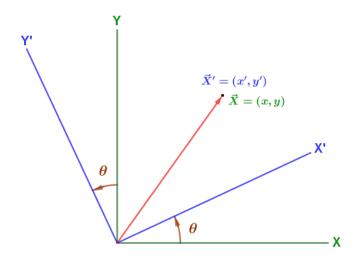
$$\vec{X} = (x, y) = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath}$$

এখানে বেসিস ভেক্টর \hat{i},\hat{j} দিয়ে না লিখে \hat{x},\hat{y} অথবা \vec{e}_x,\vec{e}_y দিয়েও লিখতে পারি।

$$\vec{X} = x\hat{x} + y\hat{y} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y$$

এখন আরেকটা কোঅর্ডিনেটের কথা চিন্তা করা যাক যেটা আগেরটার সাপেক্ষে ঘড়ির-কাটার বিপরীত দিকে θ কোণে ঘুরানো। এই নতুন কোঅর্ডিনেটে থেকে একই ভেক্টর \vec{X} কে লেখা যায়ঃ

$$\vec{X}' = x'\vec{e}_x' + y'\vec{e}_y'$$



 ${
m X-Y}$ এবং ${
m X'-Y'}$ কোঅর্ডিনেটে ভেক্টরটির উপাংশ (x,y) এবং (x',y') এর মধ্যকার সম্পর্কঃ

$$x' = x \cos \theta + y \sin \theta$$
$$y' = -x \sin \theta + y \cos \theta$$

এই বিষয়টা ভেক্টরটাকে ঘড়ির-কাটার দিকে θ কোণে ঘুরিয়ে পরিমাপ করার সমতুল্য। যাইহোক, এই সমীকরণদ্বয়কে ম্যাট্রিক্স আকারে লিখলে দাঁড়ায়ঃ

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$
$$\implies X' = RX$$

যেখানে, $R = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ হল $2\mathrm{D}$ রোটেশন ম্যাট্রিক্স। এ তো গেল ভেক্টরের উপাংশ পরিবর্তনের কথা। উপাংশের পাশাপাশি বেসিস ভেক্টর পরিবর্তন হয়।

ছবিটা খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন, কোঅর্ডিনেট পরিবর্তনে ভেক্টরেরটির

হিসাব করা উপাংশ আর বেসিস ভেক্টরের পরিবর্তন এসেছে ঠিকই। কিন্তু ভেক্টরটা নিজে কি সাইজে ছোট-বড় হয়েছে? হয় নি। চলুন দেখি ভেক্টরের নিজের সাইজ যে একই থাকছে সেটা গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা যায় কি না।

আমরা জানি, ভেক্টরের নর্ম বা দৈর্ঘ্য একটা স্কেলার রাশি।

X-Y কোঅর্ডিনেটে আমাদের আলোচিত পজিশন ভেক্টরের দৈর্ঘ্য হলঃ

$$||\vec{X}|| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\implies ||\vec{X}||^2 = x^2 + y^2$$

আর X'-Y' কোঅর্ডিনেটে ভেক্টরটির দৈর্ঘ্যঃ

$$||\vec{X}'|| = \sqrt{x'^2 + y'^2}$$

$$\implies ||\vec{X}'||^2 = (x\cos\theta + y\sin\theta)^2 + (-x\sin\theta + y\cos\theta)^2$$

$$\implies ||\vec{X}'||^2 = x^2 + y^2$$

তার মানে বুঝতে পারছেন, কোঅর্ডিনেট ঘুরানোর জন্য ভেক্টরের দৈর্ঘ্যে কোন পরিবর্তন হয় নি। অর্থাৎ রোটেশনের সাপেক্ষে ভেক্টরের দৈর্ঘ্য ইনভ্যারিয়েন্ট (অপরিবর্তনশীল)। এই ভেক্টর দৈর্ঘ্যকে আরেকভাবে প্রকাশ করা যায়, সেটা হল ভেক্টরটির নিজের সাথে নিজের ক্ষেলার বা ডট গুণন (এটা ভেক্টর-দৈর্ঘ্যের বর্গের সমান)।

$$||\vec{X}||^2 = ||\vec{X}'||^2 = \vec{X} \cdot \vec{X} =$$
 ইনভ্যারিয়েন্ট ক্ষেলার প্রডাক্ট

দৈর্ঘ্যের চেয়ে এই স্কেলার গুণন ফর্মটাই আমাদের জন্য বেশি ব্যবহার উপযোগী হতে চলেছে।

এতক্ষন আমরা দ্বিমাত্রিক ভেক্টর বা 2-ভেক্টর দিয়ে কথা বললাম। এগুলো আমাদের ত্রিমাত্রিক ভেক্টর বা 3-ভেক্টরের জন্য সত্যি। 3-পজিশন ভেক্টরকে লিখি এভাবেঃ

$$\vec{X} = (x, y, z)$$
$$= x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

$$= X^{1}\vec{e}_{1} + X^{2}\vec{e}_{2} + X^{3}\vec{e}_{3}$$
$$= (X^{1}, X^{2}, X^{3})$$

রিলেটিভিটিতে (x,y,z) না লিখে 1,2,3 ইন্ডেক্স দিয়ে (X^1,X^2,X^3) আকারেও লেখা হয়। তাই আপনাদের অবগতির জন্য এই নোটেশনও লিখে রাখলাম।

তো কোঅর্ডিনেট ঘোরানোর আলোচনাটি 3-পজিশন ভেক্টরের জন্য সারমর্ম করলে দাড়ায়ঃ

ভেক্টরটির উপাংশঃ
$$X^i \leftarrow \stackrel{\gamma_{\mathrm{flatof}}}{\longleftarrow} X'^j$$

যেখানে i, j = 1, 2, 3

রোটেশনের সাপেক্ষে ইনভ্যারিয়েন্টঃ $ec{X}\cdotec{X}=x^2+y^2+z^2$

বিশেষ আপেক্ষিকতায় ভর

স্পেশাল রিলেটিভিটির আলোচনা চতুর্মাত্রিক স্থানকাল নিয়ে। এখানে বস্তু যে পথে ভ্রমণ করে, সেটা হল তার ওয়ার্ল্ড লাইন। বস্তুর এই অবস্থান, গতির ব্যাখ্যার আমাদের দরকার চারমাত্রিক ভেক্টর বা 4-ভেক্টর বা মিনকোস্কি ভেক্টর। এটা আমাদের পরিচিত 3-ভেক্টরের মতই, সাথে অতিরিক্ত যোগ হয় সময় অক্ষ বরাবর ভেক্টর-উপাংশ, কারণ স্থানের মত সময়ও একটা মাত্রা।

3-ভেক্টরে ছিল 3টা উপাংশ X^i যেখানে i=1,2,3। মানে $(X^1,X^2,X^3)=(x,y,z)$ ।

আর এখানে 4-ভেক্টরে 4 টা উপাংশ X^{μ} , যেখানে $\mu=0,1,2,3$ । এই $\mu=0$ দিয়ে নির্দেশ করছি সময় বরাবর উপাংশ। বাকি তিনটা $(\mu=1,2,3)$ দিয়ে নির্দেশ করছি স্থানের তিনটা উপাংশকে যারা 3-ভেক্টরের বেলায় i=1,2,3 দিয়ে নির্দেশিত ছিল। মানে এখানে $(X^0,X^1,X^2,X^3)=(t,x,y,z)$ । বলে রাখি, আমি ন্যাচারাল

ইউনিটে লিখছি। ন্যাচারাল ইউনিটে $(c=1\,$ ধরে) আমরা 4-পজিশন ভেক্টরকে লিখতে পারি এভাবেঃ

$$X = (X^{0}, X^{1}, X^{2}, X^{3})$$

$$= (t, x, y, z)$$

$$= t\vec{e}_{t} + x\vec{e}_{x} + y\vec{e}_{y} + z\vec{e}_{z}$$

ভেক্টর রিভিউ অংশে আমরা দ্বিমাত্রিক কোঅর্ডিনেট রোটেশনে কিভাবে ভেক্টর উপাংশ পরিবর্তন হয় সেটা দেখে এসেছি। এখানে আমরা 4-ভেক্টর উপাংশ পরিবর্তন দেখব লরেন্টজ রূপান্তর এর প্রেক্ষিতে। এটাও এক ধরনের চারমাত্রিক কোঅর্ডিনেট রোটেশন বলতে পারেন। তবে পুরোপুরি এক জিনিস নয়। লরেন্টজ রূপান্তরে 4-পজিশন ভেক্টরের সম্পর্ককে লেখা যায় এরকমঃ

$$4$$
-ভেক্টরের উপাংশঃ $X^{\mu} \xleftarrow{\operatorname{লের-টজ রূপান্তর}} X'^{
u}$

যেখানে $\mu, \nu=0,1,2,3$ ম্যাট্রিক্স আকারেঃ $X'=\Lambda X.$ এখানে Λ হল লরেন্টজ ট্রান্সফর্মেশন ম্যাট্রিক্স।

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

এই ম্যাট্রিক্স x অক্ষ বরাবর আপেক্ষিক গতিতে চলমান দুইটা ফ্রেমের কোঅর্ডিনেট রূপান্তরকে প্রকাশ করে। এখানে আপেক্ষিক গতি =v এবং লরেন্টজ সহগ $\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ যেখানে $\beta=\frac{v}{c}$ । ন্যাচারাল ইউনিটে থাকতে চাচ্ছি। তাই এগুলোতে c=1 বসালাম, $\beta=v,\ \gamma=\frac{1}{\sqrt{1-v^2}}$ । কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম, 2D কোঅর্ডিনেট রোটেশনে 2-ভেক্টরের ডট প্রডাক্ট পরিবর্তন হয় না। একইভাবে 4-ভেক্টরের ডট প্রডাক্টও পরিবর্তন হয় না লরেন্টজ রূপান্তরে। আর যেহেতু এটার ফলাফল

একটা স্কেলার রাশি এবং লরেন্টজ রূপান্তরে অপরিবর্তনশীল, এটার আরেক নাম লরেন্টজ স্কেলার। মানে যেকোন 4-ভেক্টরের দৈর্ঘ্য হল একটা লরেন্টজ স্কেলার।

এখন চলুন দেখা যাক আমাদের এই 4-ভেক্টরের ডট প্রডাক্ট কিভাবে লেখা হয়। ডট প্রডাক্ট,

$$X_{\mu}X^{\mu} = (X^{0})^{2} - (X^{1})^{2} - (X^{2})^{2} - (X^{3})^{2}$$
$$= (t)^{2} - (x)^{2} - (y)^{2} - (z)^{2}$$
$$= t^{2} - r^{2}$$

এই প্রডাক্টের একটা নাম আছে, একে বলে স্পেসটাইম ইন্টারভাল। এর থেকে সহজে যথার্থ সময়, সময় সম্প্রসারণের বিষয়গুলো আনা যায়। সে আলোচনায় যাচ্ছি না আজ।

আর এখানে ডট প্রডাক্টে নেগেটিভ সাইন কিভাবে আসল তা জানতে 4-ভেক্টরের ডট প্রডাক্ট কিভাবে করতে হয়, সেটা বুঝতে হবে। এখানে ব্যবহার করা মেট্রিক ম্যাট্রিক্সের বিষয়টা জানতে হবে। এটার দুইরকম কনভেনশন আছে, এই কনভেনশনকে বলা হয় মেট্রিক সিগনেচার। একটা হল (-,+,+,+), আরেকটা হল (+,-,-,-)।

সহজ করে বলতে চাইলে, আমরা আমাদের 3-ভেক্টরের বেলায় আমরা ব্যবহার করি $\hat{\imath}\cdot\hat{\imath}=\hat{\jmath}\cdot\hat{\jmath}=\hat{k}\cdot\hat{k}=1$ বা আরেক ভাবে লিখলে $\vec{e}_x\cdot\vec{e}_x=\vec{e}_y\cdot\vec{e}_y=\vec{e}_z\cdot\vec{e}_z=1$ । 4-ভেক্টরের ক্ষেত্রে (-,+,+,+) সিগনেচারের বেলায় এদের সাথেই যুক্ত হয় $\vec{e}_t\cdot\vec{e}_t=-1$ । অন্যদিকে (+,-,-,-) সিগনেচারে কনভেনশনটা বিপরীত। মানে সেক্ষেত্রে $\vec{e}_t\cdot\vec{e}_t=1$ এবং $\vec{e}_x\cdot\vec{e}_x=\vec{e}_y\cdot\vec{e}_y=\vec{e}_z\cdot\vec{e}_z=-1$ । সময় অক্ষ থেকে স্থানের অক্ষণ্ডলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে এই বিপরীত সাইন আনা। পদার্থবিজ্ঞানের ভিন্ন শাখায় এই দুইরকম সিগনেচারেরই চাহিদা আছে। আজকের এই লেখাটির প্রেক্ষিতে আমি ব্যবহার করছি (+,-,-,-) সিগনেচার।

গাণিতিক কচকচানি বোধ হয় বেশি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এগুলো প্রয়োজন ছিল। এই গাণিতিক বিষয়গুলো আরো ভালভাবে শিখতে আগ্রহী পাঠকেরা তথ্যসূত্রে উল্লেখিত বইগুলো দেখতে পারেন। এখন চলুন মূল আলোচনায় ফেরা যাক।

আইনস্টাইনের বিখ্যাত ভর-শক্তি সমতা ন্যাচারাল ইউনিটে লিখতে পারিঃ

$$E^2 = m^2 + p^2$$

$$\implies m^2 = E^2 - p^2$$
(2)

বিশেষ আপেক্ষিকতার আলোচনায় সরণ, বেগ, ভরবেগ, ত্বরণ সবই 4-ভেক্টর। তো চতুর্মাত্রিক ভরবেগ বা 4-মোমেন্টামকে লেখা যায় এভাবেঃ

$$\mathbb{P} = E\vec{e}_t + P^x\vec{e}_x + P^y\vec{e}_y + P^z\vec{e}_z$$
$$= E\vec{e}_t + \vec{p}$$

এই ভেক্টরের উপাংশগুলোকে ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখলে দাঁড়ায়,

$$P^{\mu} = \begin{pmatrix} P^{0} \\ P^{1} \\ P^{2} \\ P^{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P^{t} \\ P^{x} \\ P^{y} \\ P^{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E \\ P^{x} \\ P^{y} \\ P^{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E \\ p \end{pmatrix}$$

তো কিছুক্ষণ আগে দেখলাম 4-পজিশনের স্কেলার প্রডাক্ট কেমন হয়। একইভাবে 4-মোমেন্টামের স্কেলার প্রডাক্ট দেখাতে পারিঃ

$$\begin{split} P_{\mu}P^{\mu} &= (P^0)^2 - (P^1)^2 - (P^2)^2 - (P^3)^2 \\ &= E^2 - p^2 \end{split} \tag{3}$$

এখন সমীকরণ (১) আর (২) তুলনা করে দেখা যাচ্ছে,

$$m^2 = P_\mu P^\mu \tag{9}$$

তাহলে ঘটনা কী দাঁড়াচ্ছে! আপনারা বুঝতে পারছেন, স্কেলার গুণন $P_\mu P^\mu$ লরেন্টজ রূপান্তরে অপরিবর্তীত থাকে। আর সেটাই হচ্ছে ভর।

ঠিক করে বললে, ভর হল 4-মোমেন্টামের দৈর্ঘ্য।
ভরের যদি লরেন্টজ রূপান্তর সম্ভব হতো, তাহলে তাকে তো এরকম ক্ষেলার গুণন আকারে প্রকাশ করা যেত না। তাহলে আমরা দেখতে চাচ্ছি, তিনমাত্রিক কোঅর্ডিনেট রোটেশনে একটা 3-ভেক্টরের দৈর্ঘ্য যেভাবে ইনভ্যারিয়েন্ট থাকে, তেমনিভাবে চারমাত্রিক লরেন্টজ রূপান্তরে ইনভ্যারিয়েন্ট (লরেন্টজ ক্ষেলার) থাকছে বস্তুর ভর।

আপেক্ষিক ভরের অবতারণা

এই পর্যায়ে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন- ভর যদি ইনভ্যারিয়েন্ট বা লরেন্টজ স্কেলার হয়, তবে বইতে যে ভরের আপেক্ষিকতা দেখানো এভাবেঃ

$$m_{\rm rel} = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma m$$

এটা কিভাবে হল? চলুন দেখা যাক। আমরা আগের আলোচিত লরেন্টজ রূপান্তর ম্যাট্রিক্স দিয়েই বিষয়টা দেখব। ধরছি, দুইটা ফ্রেম S এবং S' একটা আরেকটার সাপেক্ষে x অক্ষ বরাবর নির্দিষ্ট v বেগে চলমান। তাহলে, দুই ফ্রেম থেকে হিসাব করা 4-মোমেন্টামের সম্পর্ককে ম্যাট্রিক্স আকারে আমরা লিখতে পারিঃ

$$P' = \Lambda P$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} E' \\ P'^x \\ P'^y \\ P'^z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E \\ P^x \\ P^y \\ P^z \end{pmatrix}$$

সমীকরণগুলো আলাদা করে পাইঃ

$$E' = \gamma (E - \beta P^x) \tag{8}$$

$$P'^{x} = \gamma(-\beta E + P^{x}) \tag{(c)}$$

$$P'^y = P^y$$
$$P'^z = P^z$$

যেহেতু আপেক্ষিক গতি শুধু $_{
m X}$ অক্ষ বরাবর, তাই $P'^y=P^y=0$ এবং $P'^z=P^z=0$ ।

এখন যেকোন একটা ফ্রেমকে বস্তুর গতির সাপেক্ষে রেস্ট ফ্রেম ধরে যাক। ধরলাম, S' ফ্রেম হচ্ছে সেই রেস্ট ফ্রেম। তাহলে, এই ফ্রেমে $P'^x=0$ এবং (১) অনুসারে শক্তিঃ

$$(E')^2 = m^2 + (P'^x)^2$$

$$\implies (E')^2 = m^2 + 0$$

$$\implies E' = m$$
(4)

(8) থেকে পাইঃ

$$m = \gamma (E - \beta P^x)$$

$$\implies E = \frac{m}{\gamma} + \beta P^x$$

(৫) থেকে পাইঃ

$$0 = \gamma(-\beta E + P^{x})$$

$$\Rightarrow P^{x} = \beta E$$

$$\Rightarrow P^{x} = \beta(\frac{m}{\gamma} + \beta P^{x})$$

$$\Rightarrow (1 - \beta^{2})P^{x} = \beta \frac{m}{\gamma}$$

$$\Rightarrow \frac{P^{x}}{\gamma^{2}} = v \frac{m}{\gamma}$$

$$\Rightarrow P^{x} = \gamma m v$$

$$\therefore \vec{p} = \gamma m \vec{v}$$
(9)

মূল পয়েন্ট এসে গিয়েছি আমরা। এখানে দেখা যাচ্ছে, 3-ভরবেগের সূত্রে mv এর সাথে লরেন্টজ সহগ γ গুণ আকারে আছে। কিন্তু নিউটনিয়ান মেকানিক্সে ভরবেগের সংজ্ঞায় আমরা দেখে এসেছি,

$$\vec{p} = m\vec{v}$$
 (b)

তাই পরিচিত নিউটনিয়ান ভরবেগের সাথে মিল রাখতে তৎকালীন অনেক পদার্থবিদেরা সমীকরণ (৭) কে লিখেছিলেন এভাবেঃ

$$\vec{p} = m_{\rm rel} \vec{v}$$
 (5)

আর এটা করতে গিয়ে আনা হয়েছিল ভরের একটা নতুন সংজ্ঞা-পরিবর্তনশীল ভর বা আপেক্ষিক ভরঃ

$$m_{\rm rel} := \gamma m$$
 (30)

এই নতুন ডেফিনিশন উপস্থাপনের ফলে একটা সুবিধা পাওয়া গেল। রিলেটিভিস্টিক 3-ভরবেগ 'দেখতে' নিউটনিয়ান ভরবেগের মত হয়ে গেল।

কিন্তু এটার ব্যবহারে বিপত্তি বা অসুবিধা আছে ঢের। স্পেশাল রিলেটিভিটি আর নিউটনিয়ান মেকানিক্সে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য আছে। তাই ভরবেগের পুরাতন সূত্রের সাথে মিল আনতে এখানে ভরের নতুন আরেকটা ডেফিনিশন আনা উপযোগী আইডিয়া নয়। $\vec{p}=m\vec{v}$ শুধু অল্প গতিতে চলা ভারী বস্তুর জন্য খাটে। আর যে সংজ্ঞা্টা সবজায়গায় খাটে, সেটা জড়তার সাথে সম্পর্কিত। মানে ভরবেগ হল সেই জিনিসটা যার পরিবর্তনের হার হচ্ছে ফোর্স। আর $m_{\rm rel}$ দিয়ে ভরবেগের দুইরকম স্বরূপ (৭) ও (৮) কে জোর করে মিলানো গেল ঠিকই। কিন্তু অন্যান্য টার্মের ক্ষেত্রে ক্লাসিকাল মেকানিক্সের সাথে রিলেটিভিটির সেই মিল আনতে এটা ব্যর্থ হয়। মানে $m_{\rm rel}$ দিয়েও তারা 'দেখতে' একই হয় না। যেমন, \vec{F} এর হিসাবটা দেখুনঃ

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$= \frac{d}{dt}(m_{\rm rel}\vec{v})$$

$$= \frac{d}{dt}(\gamma m\vec{v})$$

$$= \gamma m \frac{d\vec{v}}{dt} + m\vec{v} \frac{d\gamma}{dt}$$

$$= m_{\rm rel}\vec{a} + m\gamma^3(\vec{v} \cdot \vec{a})\vec{v}$$

এখানে $m_{\mathrm{rel}}\vec{a}$ এর সাথে আরেকটি এক্সট্রা টার্ম চলে আসছে। মানে বিশেষ শর্ত $(\vec{v}\cdot\vec{a}=0)$ আরোপ না করলে রিলেটিভিস্টিক 3-ফোর্স এর জন্য $\vec{F}=m_{\mathrm{rel}}\vec{a}$ সত্যি হচ্ছে না। তেমনি গতিশক্তির বেলাতেও আপনারা চেক করে দেখতে পারেন, $E_k=\frac{1}{2}m_{\mathrm{rel}}v^2$ সত্যি হয় না। এজন্য পদার্থবিদদেরা যারা প্রফেশনাল রিলেটিভিটিস্ট তাদের কাছে m_{rel} এর অবতারণা অযৌক্তিক এবং এটার ব্যবহারের বিষয়ে তাঁরা নিরুৎসাহিত বহু বছর ধরেই।

সারকথা, স্পেশাল রিলেটিভিটিতে স্বীকৃত ভর আসলে একটাই। রেস্ট ভর বলতে যা বুঝতেন, সেটাই হল একমাত্র ভর। আর আপেক্ষিক গতি দ্বারা প্রভাবিত বা পরিবর্তিত হয় বস্তুর শক্তি, ভরবেগ; কিন্তু ভর নয়। কারণ এখানে বস্তুর ভর একটা ইনভ্যারিয়েন্ট (ক্ষেলার) রাশি হিসেবে সংজ্ঞায়িত যা নির্দেশ করে বস্তুর 4-ভরবেগের দৈর্ঘ্যকে(৩) এবং বস্তুর নিজ ফ্রেমে তার মোট শক্তিকে(৬)।

যে প্রশ্ন দিয়ে আজকের লেখা শুরু করেছিলাম, সেটাতে ফিরি। বস্তুর বেগ আলোর বেগের সমান হতে পারে না কেন? ভর তো পরিবর্তন বা বৃদ্ধি পায় না, তাহলে? ভর বাড়ে না ঠিকই, কিন্তু বল প্রয়োগ করে বেগ বাড়ানোর সাথে সাথে বাড়তে থাকে জড়তা। কারণ এই জড়তার বৃদ্ধি কেবল ভরের উপর নয়; বস্তুর ভরবেগ, গতিশক্তি বৃদ্ধির উপরেও এটা নির্ভর করে। আর আলোর বেগের কাছাকাছি যেতে থাকলে বস্তুর নিজের বর্ধনশীল জড়তাই একসময় বস্তুটির বেগের বৃদ্ধিকে অসম্ভব করে তোলে।

লেখা আপাতত এখানে শেষ করছি আইনস্টাইনের উক্তি দিয়ে।

It is not good to introduce the concept of the mass $M=m/\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$ of a moving body for which no clear definition can be given. It is better to introduce no other mass concept than the `rest mass' m. Instead of introducing M, it is better to mention the expression for the momentum and energy of a body in motion.

— আলবার্ট আইনস্টাইন লিংকন বার্নেট-কে পাঠানো চিঠিতে, ১৯ জুন ১৯৪৮

তথ্যসূত্র

- ♦ L. Susskind, A. Friedman. Special Relativity and Classical Field Theory: The Theoretical Minimum. 2017.
- ♦ D. Fleisch. A Student's Guide to Vectors and Tensors. 2011.
- ♦ J. R. Taylor. Classical mechanics. 2005.
- S. Thornton, J. Marion. Classical Dynamics of Particles and Systems. 2004.
- ♦ A. Momen. Relativistic Mass: A Lost Cause. 2013 - Facebook Note.
- Why is relativistic mass considered a bad concept?Quora.

- § E. Hecht. How Einstein Confirmed $E_0 = mc^2$. 2011. DOI: 10.1119/1.3549223.
- ♦ E. Hecht. Einstein Never Approved of Relativistic Mass. 2009. DOI: 10.1119/1.3204111.
- ♦ L. B. Okun. Mass versus Relativistic and Rest Masses. 2009. DOI: 10.1119/1.3056168.
- ♦ P. M. Brown. On the Concept of Relativistic Mass. 2007. arXiv: 0709.0687.
- ♦ L. B. Okun. The Concept of Mass in the Einstein Year. 2006. arXiv: hep-ph/0602037.
- ♦ G. Oas. On the Abuse and Use of Relativistic Mass. 2005. arXiv: physics/0504110.
- ♦ C. G. Adler. Does mass really depend on velocity, dad? 1987. DOI: 10.1119/1.15314.



§ ७8



মন্তিক্ষের চেতনা রহস্য

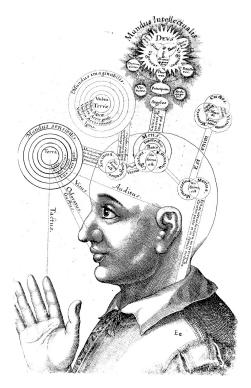
রাফায়েতুল ইসলাম রুপম

নবদেহের সবচেয়ে জটিল, রহস্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে মস্তিষ্ক। এটি স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রীয় অঙ্গ যা সুষুম্নাকাণ্ডের সা-থে মিলে মানবদেহের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠন করেছে। মানব অস্তিত্বের অনেক কিছুই মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিত হয়।

মন্তিষ্ক এমন একটি বিস্ময়কর সত্তা যার বিষয়ে যত জানা যায় ততই অবাক হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের এই মন্তিষ্ককে যদি অর্ধেক কেটে ফেলা হয় তাহলেও বাকি অংশটুকু কেটে ফেলা অংশের কাজ করার সামর্থ রাখে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ধরুন আপনার মন্তিষ্ক অর্ধেক কেটে ফেলা হলো এবং সেই অংশটুকু যদি অন্যকোন জায়গায় স্থাপন করা হয় তাহলে কোন অংশটুকুকে আপনি নিজেকে ধরবেন? আবার ধরুন,আপনি কোন ঘটনা দেখে কোন কিছু চিন্তা করলেন কিন্তু কি চিন্তা করলেন সেটা আপনি ছাড়া এই পৃথিবীর আর কেউ জানতে পারবে না, এই যে নিজের আত্ম-অভিজ্ঞতা, যেটি শুধু আপনিই অনুধাবন করছেন সেটাই আপনার চেতনা। তবুও এই একটি জিনিসের উপর সকলের যথেষ্ট ধারণা এখনো অস্পষ্ট। সে বিষয়ে বিস্তারিত যাওয়ার আগে 'চেতনা কি' সে বিষয় নিয়ে আরেকটু জানা যাক।

চেতনা হলো মস্তিষ্কের শত কোটি কোটি নিউরনের একত্রে কাজ করার ফলে উত্থিত সেই সব অভিজ্ঞতা, যা বিশ্ব সম্পর্কে জানতে এবং অন্যকে তা জানাতে সাহায্য করে। এর সরলতম উদাহরণ হিসেবে বলা যায় "অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা"।

প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞানীরা এখন 'মস্তিষ্কের চেতনা' বিষয়ে বোঝার জন্য উদ্ধুদ্ধ হয়ে পড়েছেন, এর পিছনে অবশ্য কিছু কারণও রয়েছে।কিন্তু আজ থেকে ১০০ বছর আগেও যখন বিজ্ঞানীদের আবিস্কারের জোয়ারে ভাসছিলো মানুষ, মনোবিজ্ঞানীগন মানুষের আচার আচরণ নিয়ে গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করলেন, নিউরোসায়েন্টিস্টগণ মস্তিষ্কের সকল বিষয়ে গবেষণার সাফল্য অর্জন করলেন কিন্তু মস্তিষ্কের চেতনা বিষয়টিকে তারা একপ্রকার বাদই দিয়ে দিলেন এমনকি তার উপর বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাতও



চিত্র ৩৪.১: চেতনা কী? সতেরশ দশকের চিত্রকর্ম (উইকিপিডিয়া)। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ নিয়ে বিস্তারিত: মগজ-ঘরে বসত করে কয়জনা?

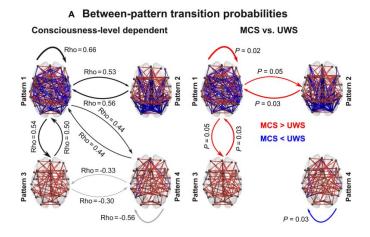
করলেন না। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় দেখা গেলো মানব কাজের সকল উৎস এই চেতনা। চেতনা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে ইহজাগতিক যাবতীয় সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ দর্শন সম্ভব নয়।

র্য়নে দেকার্তে দেহ ও মস্তিষ্কের চেতনার দ্বৈততা বা ডুয়ালিজমের ধারণা দিয়ে বলেছিলেন 'আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি' (cogito ergo sum)। মস্তিষ্ক এবং এর সকল স্নায়ুকোষ এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডকে বিবেচনা করে তিনি মানবদেহকে একটি মেশিনের সাথে তুলনা করতেও পিছুপা হন নি।

মানুষের হাসি-কান্নাই শুধু নয়, ব্যাথা-বেদনা, আর্তনাদ-চিৎকার, অশ্রু সব কিছুর আড়ালেই মস্তিষ্কের চেতনা কাজ করছে, তবে এই সকল কোন কথাই আমার নয়, এগুলো বলে গেছেন যীশু খৃষ্টের জন্মেরও আরো ৪০০ বছর আগের চিকিৎসকরা কিন্তু তাঁদের সেই জ্ঞানটি সে কালের মানুষ গ্রহণ করেনি। তাদের মধ্য অনেকের বিশ্বাস ছিলো সকল হার্দিক অনুভূতির উৎস হলো হৎপিণ্ড, যার কম্পনের ফলেই বুকের মাঝে সকল অনুভূতির সৃষ্টি হয় এবং একথা সকল প্রেমিকমাত্রই দাবী করে থাকেন। প্রাচীন আসিরিয় ও ইহুদিরা বিশ্বাস করত যে লিভার বা যকৃত থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি।অবশ্য,প্রাচীন যুগে পর্যায়ক্রমে মানুষের প্রায় সকল প্রত্যঙ্গেই চেতনার উৎস বলে একসময়-না-একসময়ে মনে করা হতো তবে স্পষ্টত উত্তর আজও কেও দিতেন পারেন নি।

এই ভূতুড়ে মস্তিষ্কের চেতনা সম্পর্কিত জ্ঞান আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তবে এখনো উত্তরহীন প্রশ্ন হিসাবে রয়ে গেছে। যদিও 'সায়েন্স অ্যাডভান্স' এ প্রকাশিত নতুন গবেষণাটি (Human consciousness is supported by dynamic complex patterns of brain signal coordination নামে) মস্তিষ্কের যে নেটওয়ার্ক-গুলি কাজ করছে এর বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করেছে। তাছাড়া মস্তিষ্কের গুরুত্বর আঘাতের পরে রোগী "সচেতন" কিনা তা নির্ধারণ করা চিকিৎসক এবং পরিবার, উভয়েরই তাদের পরিচর্যার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে কেননা আধুনিক মস্তিষ্কের ইমেজিং কৌশলগুলি এই অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে তুলতে শুরু করেছে। যা আমাদের মানবিক চেতনায় অভূতপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি দিতে বাধ্য করছে।

সচেতনতা আপাতদৃষ্টিতে হারিয়ে যায়, আবার পুনরুদ্ধার হয়, আমাদের ঘুমিয়ে পড়ে থেকে ঘুম থেকে ওঠা পর্যন্ত। সচেতনতাকে ফার্মাকোলজিকাল এজেন্টদের দ্বারা বা আরও স্থায়ীভাবে মস্তিষ্কের আঘাতের মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ীভাবে বিলুপ্ত করা যায়। সচেতন জাগ্রত হওয়া থেকে এই প্রতিটি প্রস্থান মস্তিষ্কের কার্যকারিতা, আচরণ এবং স্নায়ুরসায়নে বিভিন্ন পরিবর্তন নিয়ে আসে। তবুও, তারা সকলেই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য



ভাগ করে নিয়েছে: ব্যক্তিকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা প্রতিবেদনের অভাব।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি যে, "প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স" বা "প্রিফিউনিয়াস" সহ জটিল মস্তিষ্কের অঞ্চলগুলি, যা অনেকগুলি উচ্চতর জ্ঞানীয় কার্যের জন্য দায়ী, সাধারণত সচেতন চিন্তায় জড়িত। তবে মস্তিষ্কের "বৃহত অঞ্চলগুলিও" অনেক কিছুই করে থাকে যেসকল কাজ সম্পর্কে আমরা এখনো অবগত নই সুতরাং বলা যেতে পারে নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের স্তরে মস্তিষ্কে "সচেতনতাকে" কীভাবে প্রতিনিধিত্ব করছে তা এখনো সবার কাছে অপরিস্কারই রয়ে গেছে।

"মস্তিষ্কের চেতনা" নিয়ে অধ্যয়ন করা এত কঠিন হওয়ার পেছনে কারণ হল এগুলি সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ এবং সহজে কোন কিছু এটিতে প্রবেশ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা দুইজন ব্যাক্তি দেয়ালে ঝুলছে এমন একই ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি, তবে ছবিটি দেখার পরবর্তী অভিজ্ঞতা বা আমরা দুইজন কি অনুরূপ ভাবছি কিনা তা জানার কোনও উপায় নেই,যদি না দুইজনই সেই সম্পর্কে না বলি। কেবল সচেতন ব্যক্তিদেরই বিষয়গত অভিজ্ঞতা থাকতে পারে অতএব, কেউ সচেতন কিনা তা নির্ধারণের স্বাধিক প্রত্যক্ষ উপায় হল তাদের

সম্পর্কে আমাদের বলার জন্য জিজ্ঞাসা করা।

এই বিষয়গুলো এতো সৃক্ষ ও জটিল যে বিশ্বের শীর্ষ সাতটি দেশের বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের চেতনা নিয়ে একত্রে কাজ করেও এর কোন অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। তারা ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেজোনান্স ইমেজিং (এফএমআরআই) এর মাধ্যমে ১২৫ জন ব্যক্তির মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ পরীক্ষা করেছিলেন যাতে স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে জটিল ও তীক্ষ্ণ যোগাযোগ প্রদর্শন করেছিল আর দূর্বলদের মস্তিষ্কের বেলায় সেটা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিল। জটিল যোগাযোগের ক্ষেত্রে যখন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিদের চেতনানাশক দেয়া হত, তখন তাদের মধ্যে এই জটিল যোগাযোগের ধরণটি হারিয়ে যেত, কিন্তু কিভাবে এবং কেন? তার কোন যথোপযুক্ত উত্তর তারা দিতে পারেন নি।

বৈজ্ঞানিক ছাড়াও সমাজের বাইরের বিভিন্ন সংস্কৃতির দার্শনিকরাও এই "চেতনা" নামের গবেষণাক্ষেত্রটির সমস্যার সমাধান খোঁজার প্রচেষ্টা করে-ছেন কিন্তু সম্পূর্ণ সফল কেও হতে পারে নি এবং অদূর ভবিষ্যতে পারবেন কিনা সেই প্রশ্ন এই বিশাল মস্তিষ্ক ভান্ডারের কোন এক ছোট্ট কোটরে রেখে দেয়াই যেতে পারে।

তথ্যসূত্র

- ♦ Human consciousness is supported by dynamic complex patterns of brain signal coordination – Science Advances.
- ♦ Scientists identify brain patterns associated with consciousness Science in the News, Harvard.

Pattern that Signals Consciousness – Discover.

- ♦ How our brain generates consciousness and loses it Science Daily.
- Susan Blackmore. Consciousness: A Very Short Introduction (2005).



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

§ 00



তামাকের মোজাইক ভাইরাস: রোগ ও প্রতিকার

জান্নাতুল ফিজা

মাক অর্থনৈতিক ভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি গাছ। তামাকের বৈজ্ঞানিক নাম নিকোটিয়ানা টেবাকাম (Nicotiana tabacum)। তামাকের ব্যবহার ইতিহাস ৮,০০০ বছরেরও
বেশি সময় ধরে নথিভুক্ত করা আছে। মধ্য মেক্সিকোতে ভুটাভিত্তিক
কৃষিক্ষেত্রের বিকাশের সাথে সাথে খ্রিস্টপূর্ব ৫,০০০ সালে তামাকের চাষ
শুরু হয়েছিলো। তামাকের ব্যবহার অবশ্য ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগের
কারণ। জীববিজ্ঞান গবেষণাগারে যারা সেল কালচার নিয়ে কাজ করেন,
তারা সবাই হেলা সেল-লাইনের সাথে পরিচিত। তামাক চাষে জড়িতদের
ক্যানারের ঝুঁকি থাকে। হেনরিয়েটা ল্যাক্স ভার্জিনিয়ার একজন তামাক
চাষী ছিলেন যিনি ১৯৫১ সালে জরায়ু মুখের ক্যান্সারে মারা যান। তাঁর
অজান্তে তার অমৃত ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ নিয়েই পরবর্তীতে হেলা
কোষ নামে গবেষণাগারে ক্যান্সার কোষ চাষ করা হয়। তাই ক্যান্সার
কোষ-লাইন আবিষ্কারে ও তামাক চাষের বড়োসড়ো ভূমিকা ছিলো বলা
যায়।

তামাকের ফলনে বড় ধরণের ক্ষতির কারণ হলো তামাকের মোজাইক রোগ। এই রোগটি তামাকের মোজাইক ভাইরাসের কারণে হয় (Tobacco Mosaic Virus/TMV)। রেডিওকার্বন প্রক্রিয়ায় জানা যায়, আমেরিকার নিউ মেক্সিকোতে উঁচু গুহায় ১৪০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ অবধি বন্য তামাক চাষ করা হতো। তখন কলম্বিয়ায় চাষকৃত তামাক পাতা জার্মানে সিগারের জন্য রপ্তানি করা হতো।

তখন বিশ্ব জুড়ে তামাক ও টোস্টেড বাদামে তৈরি নোট কাগজ এর মতো দেখতে সিগারের ধোঁয়া নেওয়া খুব জনপ্রিয় হয়েছিলো। সিগার হলো গাঁজন প্রক্রিয়ায় তৈরি শুকানো তামাক পাতার প্যাঁচানো শুচ্ছ বিশেষ যার ধোঁয়া নেওয়া হতো। সিগার দেখতে অনেকটা আমাদের দেশে পানের সাথে প্রচলিত সাদা পাতার মতো।



চিত্র ৩৫.১: সিগার



চিত্র ৩৫.২: তামাক চাষ

আবিষ্কার ও অনুসন্ধান

উনবিংশ শতাব্দীতে তামাকের মোজাইক রোগ ইউরোপে বড় অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ ছিলো। ১৮৭৯ সালে ডাচ তামাক চাষীরা তরুণ রসায়নবিদ এডলফ মেয়ারের কাছে সাহায্যের জন্য যান। মেয়ার তামাক গাছগুলো যে পরিবেশে জন্মায় সে পরিবেশের মাটি, তাপমাত্রা, সূর্যালোক নিয়ে নিরীক্ষা করলেন। কিন্তু তিনি সুস্থ ও অসুস্থ গাছকে আলাদা করার কোন উপায় খুঁজে পেলেন না। তিনি ভাবলেন গাছগুলো হয়তো কোন অদৃশ্য রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে বলেছেন আলু এবং অন্যান্য উদ্ভিদের রোগের জন্য ছত্রাক দায়ী হতে পারে। তাই মেয়ার তামাক গাছে ছত্রাক আর পরজীবী পোকাও খুঁজলেন তবুও তিনি কিছু'ই পেলেন না। তিনি অসুস্থ গাছের রস নিয়ে তা সুস্থ তামাক গাছে প্রবেশ করালেন। সুস্থ গাছগুলো অসুস্থ হয়ে গেলো! মেয়ার বুঝতে পারলেন কোন আণুবীক্ষণিক জীব গাছগুলোর ভিতরে বংশবৃদ্ধি করছে। न्यानत्तर्धेतिरः তिनि অসুস্হ গাছের রস निरा অনুকূল পরিবেশে রাখলেন। তাতে ব্যাক্টেরিয়ার বসতি হলো। তারা ধীরে ধীরে এত বড় হলো যে মেয়ার খালি চোখেই ব্যাক্টেরিয়ার কলোনি দেখতে পেলেন। মেয়ার এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে সুস্থ গাছে প্রবেশ করালেন এবং ব্যাক্টেরিয়াগুলো রোগ সৃষ্টি করে কি না তা দেখার জন্যে অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু গাছগুলোতে কোন রোগ সৃষ্টি হলো না। এই ব্যর্থতার সাথেই মেয়ারের গবেষণা কিছু সময়ের জন্যে আড়ালে চলে গেলো। তখনও ভাইরাসের উপস্থিতি ছিলো সবার কাছে অজানা। টিএমভি

হলো এক শতান্দী আগে আবিষ্কৃত প্রথম বিশুদ্ধ ভাইরাস। ভাইরাস যেভাবে তাদের পোষক কে আক্রান্ত করে তা বিমোহিত করার মতো। পরবর্তীতে প্রাণের সাধারণ নীতিতে নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্ত আবিষ্কারেও তামাকের মোজাইক ভাইরাসের গবেষণা নেতৃত্ব দিয়েছিলো। মেয়ারের ব্যর্থতার পর রাশিয়ান উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী দিমিত্রি আইভানোস্কি ১৮৮৭ থেকে ১৮৯০ সালে মধ্যে পূর্ব ইউরোপে তামাক গাছের মোজাইক রোগটি অনুসন্ধান করেন। তিনি আক্রান্ত তামাক গাছ ধোয়া তরল নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিনি দেখতে পান রোগ, সৃষ্টিকারী জীবাণু একটি সৃক্ষ ছিদ্রের চীনামাটির ফিল্টারের ভেতর ব্যাকটেরিয়া আটকে রাখতে পারে ছাকনীর মতো। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত তরলে কোন ব্যাকটেরিয়া না থাকলেও তা পুনরায় সুস্থ তামাক গাছে রোগ তৈরি করছে। কিন্তু তখনো আইভানস্কি এই আবিষ্কারের পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি।



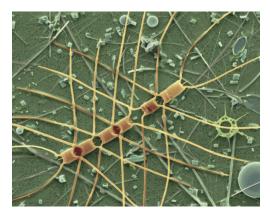
চিত্র ৩৫.৩: দিমিত্রি আইভানোস্কি



চিত্র ৩৫.৪: মার্টিন বেঞ্জেরিঙ্ক

১৮৯৮ সালে নেদারল্যান্ডসের মার্টিন বেঞ্জেরিঙ্ক প্রমাণ করেন যে পরিশ্রুত তরলে মোজাইক রোগের জন্য দায়ী কারণটি খুব ক্ষুদ্র এবং সংক্রামক। বেঞ্জেরিঙ্ক এটির নাম দিয়েছিলেন ছোঁয়াচে প্রাণরস। তিনি দেখান যে গবেষণাগারে টিএমভি ব্যাকটেরিয়ার মতো পেট্রিডিশে কালচার বা চাষ করা যায়না। একমাত্র-জীবন্ত ও বর্ধমান গাছপালাতেই এটি দেখা যায়। তখনো মানুষ ভাইরাস সম্পর্কে কিছু জানতোনা। বিজ্ঞানীরা রোগের কারণ হিসেবে শুধু ব্যকটেরিয়াকেই সংক্রামক বলে মনে করতো। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয় 'জীবাণু' অকোষীয় হতে পারে। তাই চিরতরে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর সংজ্ঞা পরিবর্তন করা উচিত। বেঞ্জেরিঙ্কই

সর্বপ্রথম ভাইরাস নামকরণ করেন। এর পরে ওয়েন্ডলে স্ট্যানলি টি-এমভি ভাইরাসকে কেলাসায়িত করে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ছবি তুলেন।



চিত্র ৩৫.৫: ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে টিএমভি ভাইরাস

এজন্য তিনি ১৯৪৬ সালে নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। তবে ঐ সময়ে তিনি ভুল বলেন যে, মোজাইক ভাইরাস সম্পূর্ণটাই প্রোটিন দিয়ে তৈরি। ঠিক সে সময়ে ইংল্যাণ্ডে বাইডেন এবং পেরি দরকারী প্রমাণ পেশ করেন টিএমভি আসলে একটি রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিন, আরএনএ ও কোট প্রোটিন দিয়ে তৈরি। ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি সময়ে জার্মান এবং আমেরিকান বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন ভাইরাসের আরএনএ-ই শুধু সংক্রোমক ছিলো। এই তত্ত্বই আণবিক ভাইরাস বিদ্যার আধুনিক যুগ সূচিত করে।

আজ অবধি টিএমভি ভাইরাস গবেষণায় উদ্ভিদের ভাইরাস প্রতিরোধী জিন হিসেবে এখনও শীর্ষে ব্যবহৃত হয়। ভাইরাসকে বিকশিত করতে ট্রাসজেনিক (সংকারয়ন) প্রযুক্তির জন্ম হয়। যা ওয়ার্ক হর্স হিসেবে ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ভ্যাকসিন উৎপাদনে উদ্ভিদের বাইরের জিনকে প্রকাশ করে। এখানে ওয়ার্কহর্স ভাইরাসকে বলা যায় যা একটি দলের প্রতিনিধির কাজ করে।

ভাইরাসের গঠন ও বৈশিষ্ট্য

তামাকের মোজাইক ভাইরাস হলো টোবামো ভাইরাস বংশের একটি ধনাত্মক-সূত্রক (পজেটিভ স্ট্রেন্ডেড) একক-প্রসারিত আরএনএ ভাইরাস প্রজাতি। যেসব ভাইরাসের জিনগত তথ্য আরএনএর একক স্ট্র্যান্ড নিয়ে গঠিত তাদের (পজিটিভ স্ট্রেন্ডেড) বলে। এটি দেখতে পাইপের মত প্যাঁচানো। টোবাকো মোজাইক ভাইরাস হলো টোবাকো মোজাইক ভাইরাস ভাইরাস প্রজাতির বৃহৎ দলের সদস্য যা সোলানেসি পরিবারের উদ্ভিদ তামাক ও অন্যান্য উদ্ভিদকে আক্রান্ত করতে পারে। টিএমভি রড-আকৃতি ভাইরাস কণা ৩০০ ন্যানোমিটার দৈর্ঘ্যের এবং ১৫ ন্যানোমিটার প্রস্কের হয়।

একটি একক টিএমভি কণা কোট প্রোটিনের ২,১৩০টি অনুলিপি দিয়ে গঠিত। এটি প্রায় ৬,৪০০ নিউক্লিওটাইড দৈর্ঘ্যের আরএনএ অণুকে আবৃত করে রাখতে পারে। নিউক্লিওটাইড আরএনএ অণু চারটি জিনকে সংকেত আকারে প্রকাশ করে। টিএমভি মেসেঞ্জার আরএনএ কে সরাসরি ট্রাঙ্গলেশন করে দুইটি প্রতিরূপের মতো প্রোটিনের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার আলোড়ন সৃষ্টি করে। আবৃত প্রোটিন সাবজেনোমিক আরএনএ কে ট্রাঙ্গলেশন করে প্রোটিনে রূপান্তর করে এক গাছ থেকে আরেক গাছে স্হানান্তর করে। এই পুরো প্রক্রিয়ায় মেসেঞ্জার আরএনএ বার্তা বাহকের কাজ করে।

উপসর্গ ও লক্ষণ

তামাকের মোজাইক ভাইরাস দিয়ে হওয়া রোগের লক্ষণসমূহ কিছুটা পোষক উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। মোজাইক, নেক্রোসিস, স্টান্টিং, পাতা কুঁকড়ানো এবং গাছের টিস্যু হলদেটে হতে পারে। লক্ষণগুলো আক্রান্ত গাছের বয়স, পরিবেশ, পরিস্থিতি, ভাইরাসের জাত এবং পোষক গাছের জিনগত পটভূমির উপর নির্ভর করে। ভাইরাসের জাত টমেটোতেও



চিত্র ৩৫.৬: তামাকের মোজাইক ভাইরাস

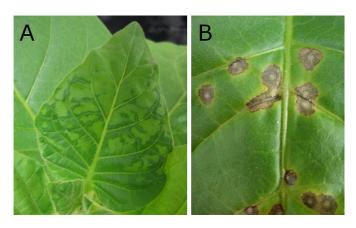


চিত্র ৩৫.৭: কুঁকড়ানো পাতা

সংক্রামিত হলে কখনও খারাপ ফলন বা বিকৃত ফল দেখা যায়। ফল পাকতে দেরি হয় এবং ফলের রঙ ভিন্ন হয়।

অনুলিপনচক্র ও রোগ তত্ত্ব

তামাকের মোজাইক রোগে আক্রান্ত পাতা বাগানের দূষিত সরঞ্জামের মাধ্যমে অন্য কোন স্বাস্থ্যকর গাছের পাতার পিঠে ঘষলে তা আক্রান্ত হয়।

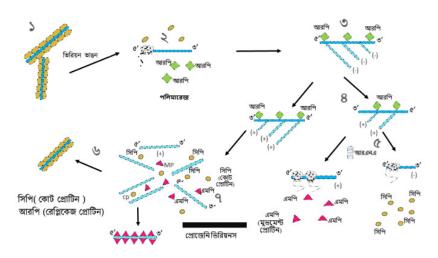


চিত্র ৩৫.৮: সৃস্থ ও আক্রান্ত পাতার তুলনা

মাঝে মাঝে কর্মীদের হাতে সিগারেটে থাকা তামাকের গুঁড়ায় মোজাইক ভাইরাস থেকে সহজেই সংক্রমণ হয়। আহত উদ্ভিদ কোষে টিএমভি প্রবেশের ছাড়পত্র দেয়। ভাইরাসটি বীজের বহিরাবরণকেও দূষিত করতে পারে। ফলে সেই বীজ থেকে অঙ্কুরিত গাছও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। টিএমভি অডুতরকম স্হিতিশীল।। পরিশোধিত টিএমভি পরিক্ষাগারে ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ৫০ বছর সংরক্ষণের পরেও সংক্রমণক্ষম থাকে।

গাছের কোষে ছোট ক্ষত করে প্রবেশ করার পর ভাইরাস কণা টিএমভির আরএনএ প্রকাশে সাহায্য করতে জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ভাইরাসের পজেটিভ সেন্স আরএন সরাসরি একটি মেসেঞ্জার আরএনএ (এমআরএনএ) তৈরি করে। এটি পোষকের রাইবোসোমকে কাজে লাগিয়ে ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ায় নতুন ভাইরাসের বিভিন্ন কণা সংশ্লেষণ শুরু করে। রেপ্লিকেজ সংশ্লিষ্ট প্রোটিন সংক্রমণের কয়েক মিনিটের মাঝে ট্রান্সলেশন শুরু করে।

টিএমভির এই প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়ে প্রতিরূপটির আরএনএর ৩' প্রান্তের সাথে যুক্ত হয় নেগেটিভ সেন্স আরএনএ তৈরি করে। আরএনএ হলো বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র ৩৫.৯: অনুলিপন চক্র

পূর্ণ দৈর্ঘ্যের জিনোমিক যা (+) আরএনএ এর পাশাপাশি (+) পজেটিভ সাবজেনোমিক আরএনএ (এসিজি-আরএনএ) উভয় তৈরি করার ছাঁচ তৈরি করে। ক্যাসিজি-আরএনএ (CCACG-RNA) পোষক রাইবোসোম দিয়ে ট্রাঙ্গলেট করে মুভিং প্রোটিন (এমপি) ৩০ কিলোডাল্টন এবং কোট প্রোটিন ১৭.৫ কিলোডাল্টন উৎপাদন করে (কিলোডাল্টন হলোপ্রোটিনের আকারের পরিমাপ)। তারপরে আবৃত প্রোটিন ও প্রজনিত ভিরিওন সমাবেশ করতে নতুন সংশ্লেষণ করে টিএমভির আরএনএর সাথে যোগাযোগ করে। এই ভাইরাসের কণাগুলি এতোই স্থিতিশীল যে কোথাও কোষ নম্ভ হলে বা পাতা শুকিয়ে গেলে ও তারা নতুন গাছকে আক্রান্ত করে। বিকল্পভাবে টিএমভি আরএনএর নড়নক্ষম প্রোটিন দিয়ে আবৃত থেকে জটিল প্রণালীতে কোষে ছড়িয়ে পড়ে।

সংক্রমণ ও বিস্তার

ভাইরাসটি প্রোটিন ব্যবহার এক কোষ থেকে অন্য কোষে প্লাজমোডে-স্মাটার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এটি উদ্ভিদের কোষকে যুক্ত করে বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র ৩৫.১০: তামাকের মোজাইক ভাইরাসের জিনোমিক গঠন





চিত্র ৩৫.১১: আক্রান্ত হলদে পাতা

চিত্র ৩৫.১২: কোষে প্লাজমোডেস্মাটা। ছবিসূত্র: Shutter Stock

রাখে। অক্ষত টিএমভি প্লাজমোডমাস্ট নামক ছোট একটি চ্যানেল দিয়ে প্রতিবেশী উদ্ভিদ কোষের সাইটোপ্লাজমকে একে অপরের সাথে সরাসরি যুক্ত করে কোষের মধ্যে জীবন্ত সেতু স্থাপন করে।

মুভমেন্ট প্রোটিন অজানা পোষক প্রোটিনের সহায়তায় প্লাজমোডম্যাটাল চ্যানেল প্রসারিত করে যাতে টিএমভি আরএনএ এর পাশে থাকা কোষে চলে যেতে পারে। যা আন্দোলিত প্রোটিন আর পোষক প্রোটিনকে নতুন দফা সংক্রমণের সুযোগ করে দেয়। তখন ভাইরাসটি এক কোষ থেকে অন্য কোষে স্থানান্তরিত হয়। সেই সময়ে অনবরত উদ্ভিদের শিকড় এবং ডগায় ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে দিতে উদ্ভিদের পরিবহন টিস্যুতে (ভাস্কুলার সিস্টেমে) পৌঁছে যায়।

মোজাইক ভাইরাসের মহামারি

টিএমভি রোগ চক্রের সাথে মোজাইক ভাইরাসের মহামারির অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। কারণ ভাইরাস পুরোপুরিভাবে প্রতিলিপি হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পোষক উদ্ভিদের প্রয়োজন। জমিতে রোগ শুরুর সময় এবং শস্য আবাদের উপর নির্ভর করে রোগের প্রকোপের মধ্যে অনেকগুলো প্রকারণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মৌসুমের শুরুর দিকে কয়েকটি গাছ সংক্রামিত হতে পারে। বীজের আবরণ থেকে টিএমভি শ্রমিকদের মাধ্যমে গাছে দূষিত হয়। রোগটি তখন টিএমভি আক্রান্ত গাছের সাথে স্বাস্থ্যকর গাছের যোগাযোগের মাধ্যমে, সরঞ্জাম বা শ্রমিকদের মাধ্যমে পুরো ক্ষেত্র বা গ্রিনহাউস জুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। টিএমভি আক্রান্ত উদ্ভিদের ধ্বংসস্তৃপ বা বহুবর্ষজীবী (আগাছা) পোষকে এমনকি মাটিতেও বেঁচে থাকতে পারে বা নির্জীব থাকতে পারে। কৃষি জমিতে অনবরত একই ফসল চাষ করলে রোগটি পুনরায় হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। গ্রিনহাউজে টিএমভির (ইনোকুলাম) জীবাণু টিকে থাকলে একাধিক গাছের প্রজাতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে।

রোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রতিকার

- ৡ গ্রিনহাউস ব্যবস্থাপনা: বাগান চর্চায় গাছের সংক্রমণ কমাতে সব
 সরঞ্জামগুলো সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে বা ভাইরাসটি নিজিয়
 করতে ঘরে তৈরি ১০% ব্লিচিং দ্রবণ ব্যবহার করতে হবে।
 টিএমভি-দৃষিত মাটি ফেলে দিতে হবে। সংক্রামিত গাছ থেকে
 স্বাস্থ্যকর গাছে ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে, জল দেওয়ার পাইপ
 এর সাথে গাছের স্পর্শ এড়ানো উচিত। মরা পাতা এবং পুরাতন
 গাছপালা নিম্পত্তি করা উচিত। কারণ শুকনো, আক্রান্ত পাতা
 গ্রিনহাউসের চারপাশে 'ধুলাবালি' হিসেবে উড়িয়ে দিলে স্বাস্থ্যকর
 গাছ ও আক্রান্ত হতে পারে।
- 🗞 ক্রস সুরক্ষা: কচি গাছে ভাইরাসের একটি মৃদু জাতকে তীব্র

জাত দিয়ে কলম করে (গ্রাফটিং) টিএমভির সংক্রমণ মুক্ত করা যেতে পারে। এটি হলো একটি তথ্যচিত্র ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ কৌশল, "ক্রস সুরক্ষা" নামে পরিচিত গ্রিনহাউস ক্রিয়াকলাপে সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়। ট্রান্সজেনিক গাছ ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের বিকল্প কৌশল হিসেবে কাজে লাগায় কৃষকরা। বেশ কয়েকরকম তামাক এবং টমেটোতে টিএমভি প্রতিরোধী জিন পাওয়া গেছে।

- ৡ জৈব প্রযুক্তি: জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা
 ট্রাঙ্গজেনিক তামাক এবং টমেটো গাছে টিএমভির কোট প্রোটিন
 জিনকে প্রকাশ করেছিলো। এই নিয়য়্রণ কৌশলটি ভাইরাস এর
 সাথে ঘনিষ্ট জাত থেকে বাঁচাতে রক্ষাকবজ হিসেবে কাজ করে।
- ইনোকুলাম নির্মূল: পরীক্ষামূলকভাবে এটি দেখানো হয় শ্রমিকেরা
 গাছ রোপণের আগে দূষিত হাত ধুয়ে নিলে টিএমভি নিদ্ধিয়
 হতে পারে। এই সামান্য কৌশলে রোগের প্রকোপ অনেকটাই
 কমে যায়। টিএমভি-দূষিত মূল বা গাছের ধ্বংসস্তৃপ রয়ে গেলে
 পরিচিত সংবেদনশীল চারাগাছ ঐ মাটিতে স্থানান্তর করা উচিত
 নয়।
- ঔ শস্য ক্ষেত পরিচালনা: রোগের জন্য বাড়ন্ত মৌসুমে দেখাশোনা, আক্রান্ত গাছের শেকড় মাটি খনন করে, জোগাড় করে ক্ষেত থেকে সরানো উচিত। ঘূর্ণন অনুশীলনে প্রতিরোধী উদ্ভিদ বা অপোষক ফসল চাষে জীবাণুর পরিমাণ কমানো উচিত।
- ङ ফসল ও সংরক্ষণ পরিচালনা: টিএমভি সহজেই বীজের বহিরাবরণে
 নির্জীব থাকতে পারে, তখন পরবর্তী রোপণ চক্রে জীবাণুর উৎস
 হতে পারে। তাই টিএমভি-দৃষিত তামাকের বীজকে ১৫ মিনিট
 ট্রাইসোডিয়াম ফসফেটের ১০% দ্রবণে চুবিয়ে রাখা জরুরি।
 টিএমভিতে দৃষিত টমেটো বীজ রোপণের ২-৪ দিন আগে
 ৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ও আক্রান্ত হতে পারে। উভয়
 পদ্ধতিতে বীজের বহিরাবরণে থাকা ভাইরাস নিষ্ক্রিয় হলেও বীজের
 অঙ্কুরোদগমে নিছক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।



চিত্র ৩৫.১৩: ক্রস সুরক্ষা। ছবিসূত্র: Science Direct

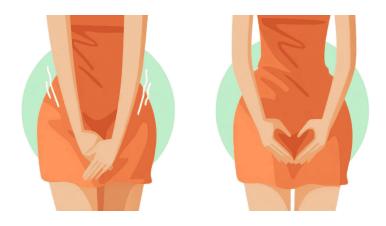
তথ্যসূত্র

- ♦ Tobacco mosaic virus APS.
- ভু অণুজীববিজ্ঞানে ভাইরাসের প্রথম সূচনা ও বেঁচে থাকার কঠিন
 সংগ্রাম
 বিজ্ঞান ব্লগ।



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

§ ৩৬



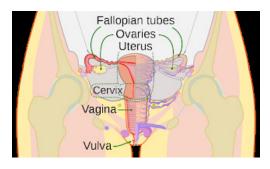
মেয়েদের ঋতুস্রাব: ঋতুচক্র কী এবং কীভাবে কাজ করে?

তানভীর রানা রাবিব

তুস্রাব (menstruation) হলো যোনি রক্তপাত যা প্রতিমাসে ঘটে থাকে। এটি নারীদেহে ঘটে যাওয়া সম্পূর্ণ প্রকৃতিক এবং স্বভাবিক একটা শরীরকার্য। মুলতঃ জরায়ুর আন্তরণ (endometrium) রক্তপাতের মাধ্যমে বের হয়ে যাওয়াকে ঋতুস্রাব বলা যেতে পারে। আর এই পুরো প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ই হলো ঋতুচক্র (menstrual period)। তাছাড়া এটিকে মাসিক, কুসুম, রজঃস্রাব, menses, menstrual period, period সহ নানা নামেও ডাকা হয়ে থাকে।

জরায়ু: জরায়ু হল স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের একটি ন্যাসপাতির আকারের অঙ্গ, যা প্রগতিশীল মহিলা প্রজনন অঙ্গ, যা মূত্রাশয় এবং মলদ্বার মধ্যে শ্রোণীতে অবস্থিত।

মাসিক চলাকালীন যোনিপথ (vagina) দিয়ে যে রক্ত বের হয় (menstrual blood) সেটা মুলত সাধারণ রক্ত এবং টিস্যুর (যা ও সময়ে জরায়ুর নির্দিষ্ট কাজ না হওয়ায় অপ্রয়োজনীয় আন্তরণ) সমস্বয়ে তৈরি। এই তরল জরায়ু থেকে ছোট্ট পথ cervix-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং যোনি দিয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।



চিত্র ৩৬.১: নারীদের প্রজননতন্ত্র। উৎস: Wikimedia - CDC

বেশিরভাগ সময়ই ঋতুস্রাবের রক্তপাত ৩ থেকে ৫ দিন পর্যন্ত থাকে। এ সময় ১৫ গ্রাম থেকে ৭০ গ্রাম menstrual blood বা period blood নির্গত হতে পারে। গর্ভাবস্থায় ঋতুচক্র বন্ধ থাকে। ঋতুস্রাব বয়ঃসন্ধির সময় থেকে (menarche বা প্রথম ঋতুচক্র) শুরু হয় এবং মেনোপজের (menopause) সময় থেকে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

মেনোপজ: মেনোপজ হলো মহিলাদের বয়সে সাথে সাথে ডিম্বাশয় ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরন উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া। এতে তার মাসিক বা ঋতুচক্র বন্ধ হয়ে যায়। এবং গর্ভধারণে অক্ষম হয়ে যায়।

ঋতুচক্ৰ কি?

ঋতুচক্র হলো প্রাপ্তবয়সী নারীদের দেহে ঘটে যাওয়া একটি চক্র যেটা নারীদের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হবার পর থেকে প্রতিমাসে ঘটে থাকে। ঋতুস্রাব ঋতুচক্রের একটি অংশ এবং এবং এটি মেয়েদের শরীরকে গর্ভাবস্থার সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করে। এ ঋতুচক্রের প্রথম দিনে রক্তপাত হয়ে থাকে। আর ঔ রক্তপাতের দিনকে ঋতুচক্রের দিন-১ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ চক্র গড়ে ২৮ দিন দীর্ঘ হয়ে থাকে। তবে, একটি চক্র ২৮ দিন থেকে ৩৫ দিন পর্যন্ত যে কোন দীর্ঘের হতে পারে। তবে চক্র ২৮ দিনের হলেও বেশিরভাগ সময়ই ঋতুস্রাবের রক্তপাত ৩ থেকে ৫ দিন পর্যন্ত থাকে। ও সময়টাকেই আমরা সাধারণ 'মাসিক' বলে থাকি।

এ চক্রের সময় শরীরের বিভিন্ন হরমোন নিঃস্বরণের উত্থান এবং পতন ঘটে।

হরমোন: হরমোন হলো দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত তরল যেটা রক্তে মিশে দেহের অভ্যন্তরীন বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

ঋতুচক্র হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পিটুইটারি গ্রন্থি দ্বারা উৎপাদিত লুটেইনাইজিং (luteinizing) হরমোন এবং ফলিকল-উত্তেজক (folliclestimulating) হরমোন ডিম্বস্ফোটনে (ovulation) প্রভাব ফেলে। এই হরমোনদ্বয় ডিম্বাশয়কে উদ্দীপিত করার সেক্স হরমোন ইস্ট্রোজেন (estrogen) এবং প্রজেস্টেরন (progesterone) উৎপাদন করতে প্রভাব ফেলে। এই ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরন জরায়ু এবং স্তনদ্বয়কে সম্ভাব্য নিষেকে জন্য প্রস্তুত করতে করে[১]।

ডিম্বাশয়: ডিম্বাশয় ডিম্বাণু উৎপাদনকারী একটি প্রজনন অঙ্গ এবং এটি স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের একটি অংশ।

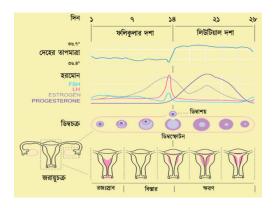
নিষেক: নিষেক হলো একটি জৈবিক প্রক্রিয়া যাতে পুং এবং স্ত্রী গ্যামেট (ডিম্বানু এবং শুক্রানু) মিলনের মধ্য দিয়ে একই প্রজাতির নতুন একটি জীব উৎপাদনের সূত্রপাত ঘটায় এবং কালক্রমে জ্রণ গঠন করে।

ঋতুচক্রের সময় কি ঘটে?

ঋতুচক্রের প্রথম অর্ধেকে নারীর দেহের ইস্ট্রোজেন হরমোন লেভেল বাড়তে থাকে আর এর প্রভাবে জরায়ুর আন্তরণ বৃদ্ধি পায় এবং পুরু হয়ে যায়। এদিকে পিটুইটারি থেকে নিঃসৃত ফলিকল-উত্তেজক (follicle-stimulating) এর প্রভাবে একটা ডিম (ডিম্বানু) যেকোনো একটা ডিম্বাশয়ে mature হতে শুরু করে। মেয়েদের ঋতুচক্রের ১৪ দিনের আশেপাশে লুটেইনাইজিং (luteinizing) হরমোনের প্রভাবে ডিমটি (ডিম্বানু) ডিম্বাশয় থেকে বের হয়ে যায়। একে ডিম্বস্ফোটন বা ovulation বলে।

ঋতুচক্রের দ্বিতীয় অর্ধেকে ডিম্বকটি ফ্যালোপিয়ান নল (fallopian tube) থেকে জরায়ুতে ভ্রমণ করে। এদিকে এসময় প্রজেস্টেরন (progesterone) হরমোন বেড়ে যায় আর হরমোনটি জরায়ুর আস্তর-ণকে (lining) গর্ভধারণের জন্য প্রস্তুত করে।

এ সময়ের মধ্যে যদি কোনো শুক্রানু (যৌন মিলনে পুরুষ থেকে যদি শুক্রানু নারীরে জরায়ুতে যায়) এসে ডিম্বানুকে নিষিক্ত করতে পারে এবং



সেই নিষিক্ত ডিম যদি জরায়ুর আস্তরনের সাথে ভালোমত সংযুক্ত হতে পারে, তখনই গর্ভাবস্থা তৈরি হয়, অর্থাৎ সেই নারী তখন গর্ভবতী। যদি ডিম্বকটির নিষেক না ঘটে তাহলে হয় সেটা দ্রবীভূত হয়ে যায় অথবা শরীর দ্বারা শোষিত হয়ে যায়। এখন যদি গর্ভাবস্থা তৈরি না হয় তাহলে ইস্ট্রোজেন (estrogen) এবং প্রজেস্টেরন (progesterone) হরমোন লেভেল কমে যায় এবং জড়ায়ুর সেই পুরু আস্তরণটি পরিভ্রষ্ঠ হয়ে যায় পিরিয়ডের সময়।

ঋতুচক্রের এই সময় জড়ায়ুর সেই পুরু আস্তরণটি অর্থাৎ টিস্যু এবং সাথে কিছু রক্ত যুক্ত হয়ে যোনিপথ (vaginal canal) দিয়ে বের হয়ে যায়। একটা নারীর পিরিয়ড প্রতিমাসে এরকম নাও হতে পারে, এমনকি অন্য কোনো নারীর সাথে নাও মিলতে পারে। পিরিয়াডের সময় রক্তপাত হালকা, মাঝারি বা, ভারিও হতে পারে। এবং ঋতুস্রাবের সময়কালও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতে পার। বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই ৩ থেকে ৫ দিন হয়ে থাকে। তবে ২ থেকে ৭ দিনের ঋতুস্রাবও স্বভাবিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

একটি প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের মাসিক শুরুর প্রথম কয়েক বছর মাসিক অনিয়মিত হতে পারে। আবার মেনোপজের (menopause) এর আগেও অনিয়মিত হতে পারে। দুটো ক্ষেত্রেই স্বভাবিক। অনেক ক্ষেত্রে অনিয়মিত পিরিয়ডের জন্য ডাক্তার জন্ম নিয়ন্ত্রণ ঔষধ সেবনে পারামর্শ দেয়া হয়ে। থাকে।

স্যানেটারি প্যাড বা ট্যাম্পন (tampon) পরিয়ড ব্লাড শুষে নেয়ার জন্য কটন বা অন্য কোনো বিশোষক উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। এই স্যানেটারি প্যাড নারীরা তাদের আন্তারপ্যান্টের নিচে বা যোনিতে ট্যাম্পন সন্ধিবেশ করতে পরে।

নারীদের পিরিয়ডের সময় বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমর: তীব্র ব্যাথা, ভারী রক্তপাত, অথবা পিরিয়ড স্কিপ করে যাওয়া। নিচে কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ তুলে ধরা হলো।

অ্যামেনোরিয়া (Amenorrhea)

এই শব্দটি ২ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

- যাদের বয়স ১৬ বছর পার হয়ে যাবার পরও এখন পিরিয়ড় ভরু হয় নি।
- যাদের নিয়মিত পিরিয়ড় হতো কিন্তু হটাৎ করে বেশ কিছুদিন যাবৎ পিরিয়ড় বন্ধ হয়ে আছে।

অ্যামেনোরিয়া উল্লেখ করার মতো বেশ কয়েকটি কারণ গুলোর মধ্য গর্ভাবস্থা, বুকের দুধ খাওয়ানো, গুরুতর অসুস্থতার জন্য সৃষ্ট আকাশপাতাল ওজন হ্রাস, খাদ্যাভ্যাসের বিশৃঙ্খলা, অতিরিক্ত ব্যায়াম, অথবা মানসিক চাপ উল্লেখযোগ্য[২]। এর জন্য হরমোনজনিত সমস্যা (পিটুইটারি, থাইরয়েড, ডিম্বাশয় বা অ্যাদ্রিনাল গ্রন্থি) বা প্রজনন অঙ্গের বিভিন্ন সমস্যা জড়িত থাকতে পারে।

ডিসমেনোরিয়া (Dysmenorrhea)

এটি মাসিকের সময় 'প্রচন্ড ব্যথা' হিসাবে উদ্ভাসিত হয়[৩]। এর জন্য প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন (prostaglandin) নামক হরমোন দায়ী। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করা যেতে পারে। অনেক সময় জরায়ু ফাইব্রয়েড বা এন্ডোমেট্রিওসিস এর মতো রোগও দায়ী হয়ে থাকে।

অস্বাভাবিক জরায়ু রক্তপাত

কীভাবে জানা যেতে পারে যে নারীর জরায়ু রক্তপাত অস্বাভাবিক? কিছু বিষয় লক্ষনীয় হলে অস্বাভাবিক রক্তপাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তো এর মধ্যে; অত্যন্ত ভারী রক্তক্ষরণ হচ্ছে কি না সেটা লক্ষ্য করা, বিশেষ করে লম্বা মাসিক (যেটাকে menorrhagia বলা হয়, সাধারণত ৭ দিনের বেশ রক্তক্ষরণ হলে সেটাকে menorrhagia, প্রতি ২০ জনের এক জন নারীর উক্ত সমস্য বিদ্যমান), খুবই অল্প বিরতিতে পুনরায় মাসিক শুরু এবং পিরিয়ডের মাঝে রক্তপাত [8] ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিশোরীদের মাসিক শুরুর প্রথমদিকে এবং মেনোপজের কাছাকাছি সময়ে হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে প্রায়ই menorrhagia এবং অনিয়মিত চক্রের সৃষ্টি হয়। এটাকে অনেক সময় dysfunctional uterine bleeding (DUB) ও বলা হয়। অস্বাভাবিক রক্তপাতের অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ফাইব্রয়েড এবং পলিপ উল্লেখযোগ্য।

একটি মেয়ে তার প্রথম পিরিয়ড যে বয়সে পায়?

প্রথম দিকের ঋতুস্রাবকে অর্থাৎ ঋতুচক্রের শুরুর দিকটাকে মেনার্চে (Menarche) নামেও ডাকা হয়। বাংরাদেশে গড়ে একটি মেয়ের ঋতুস্রাব শুরু হয় ১২ বছর বয়সে[৫,৬]। কিন্তু, এর মানে এই নয় যে সব মেয়ের একই বয়সে শুরু হবে। একটি মেয়ের ৮ থেকে ১৬ বছর বয়সের মধ্যে যে কোনও সময় ঋতুস্রাব শুরু হতে পারে।

ঋতুস্রাব ততক্ষণ হবে না যতক্ষণ না একটি মেয়ের প্রজনন তন্ত্রের সমস্ত অংশ পরিপক্ক হয়ে যায় এবং একসাথে কাজ করে।

একজন নারীর পিরিয়ড কত বছর পর্যন্ত থাকে?

মহিলারা সাধারণত মেনোপজ অবধি পিরিয়ড থাকা চালিয়ে যান। মে-নোপজ সাধারণত ৫১ বছর বয়সের আসেপাশে সময়ে ঘটে।[৭] এর মানে হল যে তখন সে আর ডিম্বানু (ডিম উৎপাদন) করদে পরবে না, অতএব আর গর্ভবতী হতে পারবে না।

ঋতুস্রাবের শুরুর মত, মেনোপজ নারী থেকে নারী ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হতে পারে। কিছু নারীদের অস্ত্রোপচার বা অন্যান্য চিকিৎসার ধরন, এমনকি অসুস্থতার কারণে তাড়াতাড়ি মেনোপজ হযতে পারে।

কখন পিরিয়ড সম্পর্কে একজন হেল্থ কেয়ার প্রোভাইডারকে দেখা হবে?

নিম্নলিখিতগুলির জন্য আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে পরামর্শ করা উচিত

- ⊗ আপনার যদি ১৬ বছর বয়সের মধ্যে ঋতুস্রাব শুরু না হয়।
- 🗞 यिन वार्थनात थितिग्रं र्या करत वन्न रात्र याग्रं।
- ⊗ আপনি যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি দিন রক্তপাত হয়ে থাকে।
- 🗞 আপনার যদি অতিরিক্ত রক্তপাত হয়ে থাকে।
- ভ্রাপনি যদি ট্যাম্পন ব্যবহার করার পর হঠাৎ অসুস্থ বোধ
 করেন।
- ভাপনার যদি দুইটি পিরিয়েডের মঝের সময়ে রক্তপাত হয় (মাত্র
 কয়েক ফোঁটার বেশি গলে)।

⊗ আপনার পিরিয়ডের সময় যদি তীব্র ব্যথা অনুভব হয়।

কতবার প্যাড/ট্যাম্পন পরিবর্তন করা উচিত?

স্যানিটারি ন্যাপকিন (প্যাড) প্রয়োজনমত পরিবর্তন করা উচিত, সাধারণত প্যাড ঋতুস্রাব প্রবাহে সম্পূর্ণ ভিজে যাওয়ার আগে। ট্যাম্পন অন্তত ৪ থেকে ৮ ঘন্টা অন্তর পরিবর্তন করা উচিত। নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে আপনি আপনার প্রবাহের জন্য প্রয়োজনীয় শোষণ ক্ষমতার ট্যাম্পন ব্যবহার করেন।

আপনি যদি ঋতুস্রাব এবং ট্যাম্পন ব্যবহার করার সময় নিম্নলিখিত লক্ষণগুলির কোন একটি অনুভব করেন, তাহলে অবিলম্বে আপনার স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করা উচিত:

- 🗞 হঠাৎ তীব্র জ্বর
- ৡ পেশীতে প্রচন্ত ব্যথা
- 😞 ডায়রিয়া
- 🗞 মাথা ঘোরা এবং/অথবা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
- 🗞 সানবার্নের মত ফুসকুড়ি
- 🚷 গলা ব্যথা
- 🗞 রক্তাক্ত চোখ

আজকের আলোচনা অর্থাৎ 'মেয়েদের ঋতুস্রাব এবং ঋতুচক্র কী এবং কীভাবে কাজ করে?' এখানেই শেষ করছি। আর Female Reproductive Endocrinology নিয়ে পরে অ্যাডভান্স পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করে যেতে পারে।

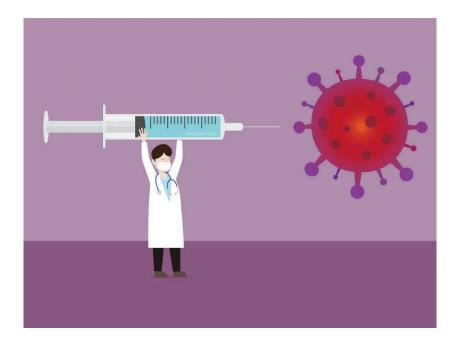
তথ্যসূত্র

- 3. Barbieri RL. The endocrinology of the menstrual cycle. Methods Molecular Biology. 2014.
- Renardi M, Lazzeri L, et al. Dysmenorrhea and related disorders. F1000Research. 2017.
- •. Heiman DL. Amenorrhea: Evaluation and Treatment. American Family Physician.
- 8. Whitaker L, Critchley HO. Abnormal uterine bleeding. Science Direct. 2016.
- Adams hillard PJ. Menstruation in adolescents: what's normal? Medscape J Med. 2008.
- Menstrual hygiene management among Bangladeshi adolescent schoolgirls and risk factors affecting school absence: results from a cross-sectional survey. BMJ Open. 2017.
- 9. Gold EB. The timing of the age at which natural menopause occurs. Science Direct. 2011.
- b. The National Women's Health Information CenterNWHIC

Medically reviewed by Brian Levine, MD



§ ७१



করোনার ভ্যাক্সিন: কার্যক্ষমতা কি একমাত্র মানদন্ড?

মাকসুদুর রহমান শিহাব

০১৯ সালের ডিসেম্বরে, চীনের উহান শহরে প্রথম কোভিড-১৯
এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিলেও তা অতিক্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে
পড়ে। ফলে স্থবির হয়ে পড়ে বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবন। সংক্রমণ
ধরা পরার কিছু দিনের মধ্যেই, ২০২০ সালের ১১ই জানুয়ারি, প্রথম
এই ভাইরাসের জিনোম সিকুয়েঙ্গিং করা হয়। এই জিনোম ভ্যাক্সিন
তৈরীতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। জিনোম সিকুয়েঙ্গিং এর পরপরই
বিশ্বের সকল ভ্যাক্সিন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান উঠেপড়ে লেগেছে। এবছর মার্চ
২০২১-এর মধ্যে ১২ টি ভ্যাক্সিন অনুমোদিত হয়েছে। এই ভ্যাক্সিন গুলোর
মধ্যে ফাইজার এবং মডার্না সর্বোচ্চ কার্যক্ষমতা (efficacy) প্রদর্শন করে,
যথাক্রমে ৯৫% এবং ৯৪%। কার্যক্ষমতার ভিত্তিতে এরপরেই অবস্থান
করে, স্পুটনিক ভি (৯২%), নোভাভ্যাক্স (৮৯%), অক্সফোর্ড/এস্ট্রাজেনেকা
(৬৭%), এবং জনসন এন্ড জনসন (৬৬%)। সাধারন চোখে আমরা
বলে দিতে পারি, যে ভ্যাক্সিনের শতকরা কার্যক্ষমতা যত বেশি সেই
ভ্যাক্সিন ততবেশি কার্যকর। আসলেই কি তাই? চলুন, জেনে নেয়া যাক।

ভ্যাক্সিন	ট্রায়ালে অংশগ্রহনকারী	কার্যক্ষমতা
ফাইজার	৪৩,৪৪৮ জন	৯৫%
মডার্না	৩০,০০০ জন	৯8%
স্পুটনিক ভি	৪০,০০০ জন	৯২ %
নোভাত্যাক্স	৩০,০০০ জন	৮৯ $\%$
অক্সফোর্ড/এস্ট্রাজেনেকা	৩০,০০০ জন	৬৭%
জনসন এন্ড জনসন	৪০,০০০ জন	৬৬%

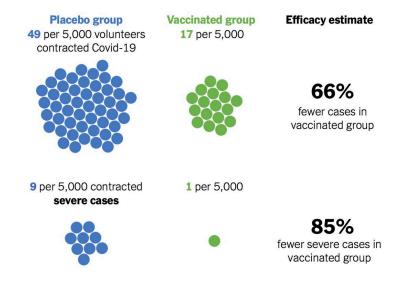
সারণী ৩৭.১: বিভিন্ন কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিনের তুলনা। কার্যক্ষমতাই কি একমাত্র মাপকাঠি?

ভ্যাক্সিনের কার্যক্ষমতা কিভাবে নির্ণয় করা হয়?

অন্য সব ভ্যাক্সিনের ক্ষেত্রে তার কার্যক্ষমতা প্রধান মানদন্ড হলেও করোনার ভ্যাক্সিনের ক্ষেত্রে বিষয়টি কিছুটা ভিন্ন। আমাদের আগে বুঝতে হবে ভ্যাক্সিনের শতকরা কার্যক্ষমতা কিভাবে নির্ণয় করা হয়। ভ্যাক্সিনের কার্যক্ষমতার হার নির্ণয় করার জন্য একটি বিশাল জনসংখ্যার মধ্যে ভ্যাক্সিনের ক্লিনিকাল ট্রায়াল চালানো হয়। এই জনসংখ্যার মান বিভিন্ন হতে পারে, যেমন, মডার্নার ক্লিনিকাল ট্রায়ালে জনসংখ্যা ছিল ৩০ হাজার, ফাইজারের ক্ষেত্রে তা ৪৩ হাজার চারশত আটচল্লিসশ জন আবার জনজন এন্ড জনসনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে অংশগ্রহনকারীছিল ৪০ হাজার। এই বিশাল জনগোষ্ঠিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যাদের এক গ্রুপে ভ্যাক্সিন প্রদান করা হয়, অপর গ্রুপে দেয়া হয় প্লাসিবো। প্লাসিবো হচ্ছে, এমন উপাদান যার কোন ঔষুধি (থেরাপি-উটিক) গুরুত্ব নেই। যদিও গ্রহনকারী সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। অংশগ্রহনকারী ভলান্টিয়াররা এরপরে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান।

এরপর কয়েকমাস তাদেরকে মনিটরিং করা হয় যে তারা কোভিড-১৯ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন কি না দেখার জন্য। আমরা ফাইজারের ট্রায়াল থেকে দেখতে পারি যেখানে ৪৩ হাজারেরও বেশি ভলান্টিয়ার
অংশ নিয়েছিলেন, মনিটরিং শেষে দেখা গেল, ১৭০ জন কোভিড-১৯
দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। এখন এই আক্রান্তরা কোন গ্রুপে পড়ছেন
তার উপরে ভ্যাক্সিনের কার্যক্ষমতা নির্ভর করে। যদি তারা সমান
সংখ্যায়, ৮৫ জন ভ্যাক্সিন গ্রুপ এবং বাকি ৮৫ জন প্লাসিবো
গ্রুপের হয়ে থাকেন, তাহলে এই ভ্যাক্সিনের কার্যক্ষমতা শুন্য। আবার,
যদি এই আক্রান্তদের ১৭০ জনই প্লাসেবো গ্রুপের সদস্য হন এবং
ভ্যাক্সিন গ্রুপে আক্রান্ত সংখ্যা শুন্য হয়, তাহলে ভ্যাক্সিনের কার্যক্ষমতা হবে ১০০%। এবার, এই ট্রায়ালে দেখা গেছে, ১৭০ জন এর
মধ্যে ১৬২ জন হচ্ছে প্লাসেবো গ্রুপে এবং বাকি ৮ জন ভ্যাক্সিন গ্রুপে।

Share of worldwide Johnson & Johnson trial volunteers who got Covid-19



চিত্র ৩৭.১: জনসন এন্ড জনসন কোম্পানীর কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিনের কার্যক্ষমতা মাপার জন্য ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দুই দলে (যাদের ভ্যাক্সিন দেয়া হয় নি বা প্লাসিবো এবং যাদের ভ্যাক্সিন দেয়া হয়েছে) টিকা পরবর্তী কোভিড সংক্রমণের হার। সূত্র:

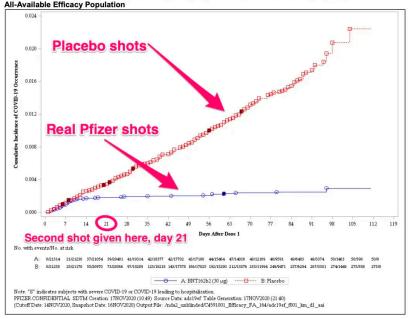
The New York Times।

এটা প্রতীয়মান হয় যে. যারা ভ্যাক্সিন গ্রহন করেছেন. তাদের শত-৯৫ ভাগ সম্ভাবনা আছে যে তারা কোভিড-১৯ দারা আক্রান্ত অতএব. এই ভ্যাক্সিনের কার্যক্ষমতা **እ**৫% ፣ এখানে মনে বুঝায় না যে, ১০০ হবে. ৯৫% দ্বারা এটা রাখতে পরবর্তীতে ভ্যাক্সিন নিলে কোভিড-১৯ তাদের মধ্যে 6 জন যদিও স্বাভাবিক ভাবে ভ্যাক্সিনের কার্যক্ষমতার হতে পারেন. হারকে আমরা এভাবেই বুঝে থাকি. যেটা ভুল। আসলে. এই শতকরা একজন ব্যাক্তির ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ দারা আক্রান্তের সম্ভাবনাকে ৯৫% কার্যক্ষমতার হার বোঝায়, একজন ভ্যাক্সিন গ্রহনকারী ৯৫% কম সম্ভাবনা আছে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হবার একজন ভ্যাক্সিন না গ্রহনকারী ব্যাক্তির চেয়ে। এখানে, ফাইজারের উদাহরণ দেয়া

হলেও প্রত্যেক ভ্যাক্সিন এর কার্যক্ষমতার হার এভাবেই নির্ধারন করা হয়।

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine VRBPAC Briefing Document

Figure 2. Cumulative Incidence Curves for the First COVID-19 Occurrence After Dose 1, Dose 1



চিত্র ৩৭.২: টিকা না দেয়া প্লাসিবো দলে কোভিড-১৯ সংক্রমণ কিভাবে বেড়ে গেলো। ছবিটি ফাইজার ভাক্সিনের ব্রিফিং থেকে নেওয়া।

ক্লিনিকাল ট্রায়াল কোথায়, কখন হয়েছে?

ভ্যাক্সিনের কার্যক্ষমতার হার বুঝতে পারলে এবার আমরা দেখবো ক্লিনি-ক্যাল ট্রায়াল কিভাবে হচ্ছে। প্রত্যেকটা ভ্যাক্সিনের ট্রায়াল হতে হবে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে, স্থানে এবং সময়ে। যেখানে ভ্যাক্সিন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মডার্না তাদের সম্পূর্ন ট্রায়াল চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, গ্রীম্মে (আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত) সময়ে। ফাইজারও একইভাবে এবং একইসময়ে তাদের ট্রায়াল চালিয়েছে। অন্যদিকে, জনসন এন্ড জনসন, যাদের কার্যক্ষমতার মাত্রা হচ্ছে ৬৬%, তারা তাদের ট্রায়াল চালিয়েছে শীতে, ২০২০ এর নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ২০২১ এর জানুয়ারী পর্য-ন্ত, যেই সময়ে অধিক পরিমান মানুষ কোভিড-১৯ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

এছাড়াও তাদের অধিকাংশ ট্রায়াল হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে, প্রধানত দক্ষিন আফ্রিকা এবং ব্রাজিলে। এই দেশগুলোতে শুধু যে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি ছিল এমনটা না, বরং সেখানে করোনা ভাইরাসের নতুন প্রকরণের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। নতুন আক্রান্তদের অধিকাংশই এইসব নতুন প্রকরণ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। দক্ষিন আফ্রিকায় জনসন এন্ড জনসনের ট্রায়ালের ৬৭% আক্রান্ত হয়েছিল নতুন B.1.351 প্রকরন দ্বারা। আশাজনক বিষয় হচ্ছে, জনসন এন্ড জনসন এই নতুন প্রকরনের বিরুদ্ধেও ৬৪% কার্যক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। তাই, ভ্যাক্সিন গুলোর কার্যক্ষমতার মধ্যে সরাসরি পার্থক্য করলে হলে এদের ট্রায়াল হতে হবে একই মানদন্তের ভিত্তিতে,একই সময়ে যেটা আদতে হয়নি । সুতরাং, এই কার্যক্ষমতার হার শুধু সেই ভ্যাক্সিনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল উল্লেখ, এর বেশি কিছুই না।

ভ্যাক্সিনের কাজ মৃত্যু ঠেকানো

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এই কার্যক্ষমতার হার দিয়ে ভ্যাক্সিন মূল্যায়ন সম্ভব। কেননা, সবসময় কোন সংক্রমন সম্পূর্নভাবে রোধ করা ভ্যা-ক্সিনের প্রধান লক্ষ নয় । যেমন, কোভিড-১৯ এর সংক্রমন মাত্রা শুন্যে নিয়ে আসা এর ভ্যাক্সিনের লক্ষ্য নয় বরং এই ভাইরাসকে নিস্তেজ করে দিয়ে এই ভাইরাস দ্বারা কঠিন রোগ সৃষ্টি ব্যহত করার সাথে মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়ে আনাই এর প্রধান লক্ষ্য। তাহলে প্রশ্ন আসে, ভ্যাক্সিনের কাজ তাহলে কি? মনে করি, একজন ব্যক্তি অসংক্রমনিত অবস্থায় আছেন। এরপর তিনি সংক্রমনিত হলেন যদিও

তার মধ্যে কোন লক্ষণ প্রকাশিত হয় নায়। পরবর্তীতে, তার মধ্যে কিছু লক্ষন দেখা যেতে পারে যা তীব্রতর হবে। এইসময় সেই ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হতে পারে এবং পরিস্থিতির অবনতি হলে তার মৃত্যুও হতে পারে। তাহলে ভ্যাক্সিন কি কাজ করবে?

বাস্তবিকপক্ষে, ভ্যাক্সিনের কাজ সংক্রমন দূর করা নয় বরং শরীরকে এমন সুরক্ষা দেয়া যা ওই ব্যাক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া অথবা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। এবং, এই কাজটি প্রত্যেক কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিনই সঠিকভাবে করছে। সবগুলো ট্রায়ালেই দেখা গেছে, প্লাসেবো গ্রুপের আক্রান্ত অনেকেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, এমনকি মারাও গিয়েছেন কিন্তু একজনও ভ্যাক্সিন গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটে নি। সুতরাং, প্রত্যেক কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন মৃত্যুর বিরুদ্ধে শতভাগ কার্যকারীতা প্রদর্শন করেছে।

ভ্যাক্সিনের কার্যক্ষমতার হার অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ন, তবে সেটাই একমাত্র মাপকাঠি বা মানদন্ড নয়। সারাবিশ্বের এখন প্রশ্ন কেবল, কোন ভ্যাক্সিনে মৃত্যুর হার কমে যাবে? কোন ভ্যাক্সিন পুরোপুরি সুরক্ষা দিবে ? কোন ভ্যাক্সিনের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপি এই সংক্রমন কবে শেষ হবে? উত্তর, সবগুলো ভ্যাক্সিন। তাই, আপনার আশেপাশে যে ভ্যাক্সিন দেয়া হচ্ছে, সেই ভ্যাক্সিন গ্রহন করুন। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে প্রমাণিত ভ্যাক্সিনের বিরুদ্ধে যাতে ভুল তথ্য না ছড়ায়। সস্থ থাকুন, সস্থ রাখুন।

তথ্যসূত্র

- ♦ We're not looking at the most important vaccine statistic − Vox.
- ♦ Why comparing Covid-19 vaccine efficacy numbers can be misleading − Vox.

- ♦ Covid-19 vaccine efficacy results are not enough Vox.
- ♦ Thanh Le T, Andreadakis Z, Kumar A, et al. (April 2020). "The COVID-19 vaccine development landscape". Nature Reviews Drug Discovery. doi:10.1038/d41573-020-00073-5.
- ♦ Li YD, Chi WY, Su JH, et al. (December 2020). "Coronavirus vaccine development: from SARS and MERS to COVID-19". Journal of Biomedical Science. doi:10.1186/s12929-020-00695-2.



§ or



শৈবাল থেকেই তৈরি হবে পরিবেশবান্ধব পোশাক

নূর ঈ হাসনাইন সারিখা

সম্প্রতি Scientific American-এ প্রকাশিত এরিকা সেনিরো-এর 'The Environment's New Clothes: Biodegradable Textiles Grown from Live Organisms' লেখাটি পড়া হয়। আমাদের দেশের অর্থনীতির মূলচালিকা শক্তি টেক্সটাইল খাত হলেও বর্তমানে অনেকেরই এ টেক্সটাইল খাত সম্পর্কে তেমন কোনো ধারনা নেই আর না ধারনা আছে এ খাতের পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে।বর্তমান পৃথিবীর মূল উদ্বেগ হচ্ছে পরিবেশ ও এর সুরক্ষা। তাই পরিবেশ দূষণের অন্যতম বড় এই কারন অর্থাৎ টেক্সটাইল খাত থেকে পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য চলেছে অনেক গবেষণা। এ লেখাটি সেরকমই একটি গবেষণার অনুবাদ।

কো

নো কাপড় যখন ছিড়ে যায় বা পুরনো হয়ে যায় তখন প্রায়ই সেটাকে ময়লার স্তপে গড়াগড়ি খেতে দেখা যায়। এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সির মতে, ২০১৪ সালে

যুক্তরাষ্ট্রে ফেলে দেয়া কাপড় ছিলো মিউনিসিপ্যাল সলিড আবর্জনার প্রায় ৯%। আমরা যা পরি তার প্রভাব কেবল ময়লার ভাগাড়েই আটকে থাকে না। পোশাক তৈরি ও বাজারজাত করার বেগ ও পরিমাণের কারণে এখনকার পোশাক কারখানাগুলো যে নীতি অনুসরণ করে চলে তা 'ফাস্ট ফ্যাশন' নামেই পরিচিত। আর ইউরোপিয়ান কমিশনের মতে, এ ফাস্ট ফ্যাশনের সাথে জড়িয়ে আছে প্রচুর পরিমানে শক্তি ও পানির ব্যবহার, উল্লেখযোগ্য মাত্রায় গ্রীন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ ও ব্যাপক পানি দৃষণ।

এখন ছোট কিন্তু দ্রুতই বেড়ে উঠা উদ্ভাবকের একটি দল উদ্যোগ নিয়েছে প্রকৃতির গুণকে এমনভাবে কাজে লাগানোর যা পোশাক কারখানার অপচয় ও দূষণকে দূর করবে সরাসরি কাচামাল পরিবর্তনের মাধ্যমে। তারা পচনশীল কাপড় তৈরির জন্য লিভিং অর্গানিসম ব্যবহার করছে, ল্যাবরেটরিতে পরিবেশবান্ধব সামগ্রি এবং এমনকি ফ্যাক্টরির পরিবেশ ছাড়াই প্রায় সম্পূর্ণ কিছু পণ্য উৎপাদন করেছে।

আজকাল অনেক পোশাক কারখানাতেই কাপড় বোনা, কাটা এবং



সেলাই করতে প্লাস্টিকের তৈরি এক্রেলিক, নাইলন বা পলিয়েস্টার সুতা ব্যবহার করে থাকে। এসব উপাদানগুলো তৈরি হয় রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে এবং এ উপাদানের কোনোটিই পচনশীল না অর্থাৎ মাটিতে মিশে যায় না। কিন্তু এ গবেষকরা মনে করেন বর্তমান সময়ের কিছু পোশাক জীবপ্রকৌশল প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা সম্ভব যেগুলো তৈরি হবে জীবিত ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, ছত্রাক, ইস্ট বা উদ্ভিদকোষ থেকে আর কাপড়গুলো ফেলে দেয়ার পর অবশেষে কাপড়ের উপাদানগুলো নন-টক্সিক ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে যাবে এবং একসময় মাটিতে মিশে যাবে । ''এ পদ্ধতিটি পরিবেশে বর্জ্য ও দূষণ অনেকটাই কমিয়ে আনবে" বলে মন্তব্য করেন নিউ ইয়র্কের ফ্যাশন ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি (F.I.T.) এর গণিত ও বিজ্ঞান অনুষদের সহকারি অধ্যাপিকা থিয়ানা শিরোস। তিনি বলেন,

পচনশীল হওয়ার পাশাপাশি এর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সুফল হচ্ছে ব্যবহারযোগ্য বেশ কিছু অর্গানিসমকে এমনভাবে গড়ে নেওয়া যায় যা সহজেই ছাঁচে এঁটে যাবে যাতে করে ফেলে দেওয়ার মতো বাড়তি অংশ তৈরি ছাড়াই ক্লথিং আর্টিকেল তৈরির জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কাপড় উৎপাদন করা যাবে।

তিনি আরো বলেন,

ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সে আমর প্রকৃতিতে আরো অনেক অনুপ্রেরণা খুঁজে পাচ্ছি। প্রকৃতিতে এমন একটি অরগানিজম খোঁজা উচিত যা খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এবং প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।



চিত্র ৩৮.১: ব্যাকটেরিয়া দিয়ে রাঙ্গানো অর্গানিক সিল্ক শুকানো হচ্ছে। ছবি কৃতিত্ব: Laura Luchtman, Ilfa Siebenhaar

অধ্যাপিকা শিরোসের পছন্দের অর্গানিসমটি হচ্ছে শৈবাল। তিনি এবং FIT এর একদল ছাত্র ও তার অনুষদ মিলে তৈরি করেন এমন এক সুতার মতো ফাইবার (আঁশ বা তন্তু) যেটাকে খুব সহজেই প্রাকৃতিক কোনো রঞ্জক, হতে পারে সেটা কোনো কীটপতঙ্গের খোলস চূর্ণ, দিয়ে অনায়াসে রঙ করা যাবে আবার সে সুতা দিয়ে বোনা যাবে কাপড়ও। শিরোস বলেন,

শৈবাল থেকে কাপড় তৈরিতে ৩ টি ধাপে কাজ করতে হয় । প্রথমে, ক্যাল্প নামক সামুদ্রিক শৈবাল থেকে অ্যালগিনেট নামক শর্করাকে আলাদা করে পাউডারের করে নেয়া হয়। পরবর্তিতে ওই অ্যালগিনেট পাউডার কে ওয়াটার বেসড জেল-এ রূপান্তর করা হয়। এরপর এটাতে প্ল্যান্ট বেসড রঞ্জক যেমন গাজরের রস যোগ করা হয়। সবশেষে ওই জেল থেকে আলাদা করা হয় লম্বা দৈর্ঘের ফাইবার যেটা দিয়ে কাপড় বোনা সম্ভব। শিরোসের মতে শৈবাল থেকে তৈরি কাপড়টি একই সাথে বেশ মজবুত ও নমনীয়। এই দুইটি বৈশিষ্ট্য নিত্যব্যবহার্য পোষাকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপণনযোগ্য জীবপ্রকৌশলকৃত বস্তু সামগ্রী হিসেবে বেশ আস্থাশীল বলে তার গবেষণায় উঠে এসেছে। চীনের ম্যাটেরিয়াল সায়েন্টিস্টরা এ গবেষণার প্রসংশা করে বলেন এই শৈবাল থেকে তৈরি ফাইবারটি প্রাকৃতিকভাবেই অগ্নি-প্রতিরোধক (ফায়ার রেজিস্ট্যান্ট) যা ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনতে পারে কাপড়ে ক্ষতিকর রাসায়নিক অগ্নি প্রতিরোধক উপাদান ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা। সুতি ফাইবার হচ্ছে বহুল প্রচলিত পোশাক তৈরির প্রাকৃতিক ফাইবার আর শৈবাল ফাইবার সুতির চেয়েও কম সময়ে মাটিতে মিশতে পারে এবং এ ফাইবার চাষের জন্য না দরকার পরে কোনো কীটনাশকের, না কোনো বিস্তৃত ভূমি। শিরোস তার এই শৈবাল থেকে তৈরি ফাইবার দিয়ে অনেক ধরনের পোশাকও তৈরি করেছেন তার মধ্যে রয়েছে একটি ট্যাঙ্ক টপ যেটি তিনি এ বছরই পরে এসেছিলেন যেদিন তিনি টেড টক (TED Talk) এ সাসটেইনেবল ফ্যাশন নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। শৈবাল ভিত্তিক বস্ত্রশিল্প তৈরির মাধ্যমে ২০১৬ বায়োডিজাইন চ্যালেঞ্জ জেতার পর শিরোস তার FIT এর এক সহকর্মী, আস্তা স্ককিরকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন "আলগিনেট" নামে একটি প্রতিষ্ঠান যেটি একদিন বাণিজ্যিকভাবে শৈবাল থেকে তৈরি পোশাক বাজারজাত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে চলেছে।

ক্লথিং ম্যাটেরিয়াল তৈরিতে ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহারও শিরোসের আরেকটি আবিষ্কার, ২০১৭ সালে তারই কিছু শিক্ষার্থী একটি তরল ব্যাকটেরিয়া কালচার, ছত্রাক এবং পচনশীল বর্জ্য থেকে তৈরি করে বাচ্চাদের পায়ের মাপের একজোড়া মোকাসিন (এক ধরণের জুতো)। ব্যাকটেরিয়া কালচারটি "বায়োলেদার" এর একটি তন্তুময় ম্যাটে পরিণত হয় যেটা অবশেষে একটি ছাঁচে ফেলে আস্ত একটি জুতা তৈরি হয়ে যায়। সেটিকে ঐ শিক্ষার্থীরা এমন এক তন্তু দিয়ে সেলাই করে দেয় যেটা তারা সংগ্রহ করেছিলো রাস্তার পাশের স্মুদির দোকানে ফেলে দেওয়া আনারসের আগার অংশ থেকে। পরবর্তীতে তারা জুতাজোড়া রঙ্গিন

করতে রঞ্জক পদার্থ তৈরি করেন অ্যাভোকাডো বীজ ও নীল গাছের পাতা থেকে আর শুকানোর আগে এতে গাজরের বীজ ছড়িয়ে দেন। শিরোস বলেন,

এ পদ্ধতিটি উৎপাদন পর্যায়ের বর্জ্য নির্মূল করবে। এ পদ্ধতিটি টেক্সটাইল স্ক্র্যাপ (অব্যবহারযোগ্য টুকরা কাপড় বিশেষ) এর পরিমাণও কমিয়ে আনবে কারন জুতাগুলো পচনশীল আর এতে গাজরের বীজও রয়েছে। জুতাগুলো আপনার বাচ্চাদের পায়ে ছোট হয়ে গেলে সেগুলোকে আপনি বাগানে রোপণ করতে পারবেন তাদের পরের জোড়া জুতা তৈরির জন্য।

তার শিক্ষার্থীরা, যারা নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে GROWAPAIR নামে, তাদের এ সৃষ্টি সবার সামনে তুলে ধরেন গতবছর অনু-ষ্ঠিত বায়োডিজাইন সামিট, নিউইয়র্কে MoMa-The Museum of Modern Art এ আয়োজিত কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য অনুষ্ঠিত একটি জীবপ্রকৌশল প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে।



চিত্ৰ ৩৮.২: Silk textile exposed to S. Coelicolor bacteria for 34 days. Credit: IMMATTERS Studio

শিরোস বলেন ফাস্ট ফ্যাশনের অন্যতম পরিবেশগত সমস্যা হল রঞ্জক

পদার্থ, জীব-প্রকৌশল ব্যবহার করে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। সুইডিশ ক্যামিকেল এজেনির মতে,

বাণিজ্যিকভাবে তৈরি হওয়া পোশাকগুলোকে রঙ করতে আনুমানিক ৩৫০০ টি মানুষের তৈরি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার
করা হয়। এর মধ্যে ২৪০০ টির মতো উপাদান ব্যবহৃত পোশাকে শনাক্ত করতে পেরেছে এজেন্সিটি। তারা বলেন, তৈরি
হয়ে য়াওয়া পোশাকে শনাক্ত করা ২৪০০ টির মতো রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে ৫% পরিবেশের জন্য বেশ বিপজ্জনক
আর ১০% মানবদেহে সরাসরি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।
কাপড়ের সাথে দৃঢ়ভাবে আটকে থাকা এই কালারিং এজেটগুলো বানাতে ব্যবহার করা হয় বিপুল পরিমানে বিষাক্ত
দ্রাবক, ফিক্সিং এজেন্ট, লবণ এবং প্রচুর পানি।এরমধ্যে কিছু
রঞ্জক ল্যাব এনিমেলের স্বাস্থ্যে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে যার
মধ্যে এলার্জিক রিয়াকশনের পাশাপাশি দেখা গেছে প্রজনন ও
বৃদ্ধিগত সমস্যাও।

কাপড় রং করতে সচরাচর ব্যবহার করা হয় বেনজিন ও এর জাতকসমূহকে আর এগুলোকে মানবদেহের ক্যান্সারকোষ সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে ঘোষণা দিয়েছে EPA পরিবেশ রক্ষা সংস্থা, যুক্তরাষ্ট্র। যেসব রঞ্জকে বেনজিন এবং সেই সাথে চিরাচরিত অ্যাজো ডাই নামক রঞ্জককে রগুনি ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। এর মধ্যে কিছু রাসায়নিক পদার্থ আবার পোশাক থেকে সরাসরি ত্বকে প্রবেশ করতে পারে আবার এগুলোকে কাপড় রঙ করার ফ্যান্টুরিগুলোর বর্জ্যপানিতেও পাওয়া যায় যা প্রায়ই কোনো রকম পরিশোধন ছাড়া সরাসরি প্রকৃতিতে ফেলে দেওয়া হয়।

অনেক গবেষক মনে করেন ব্যাকটেরিয়া এই ডাই বা কাপড় রঙ করার সমস্যাকে প্রশমিত করতে পারে। Textilelab Amsterdam এর সহপ্রতিষ্ঠাতা সেসিলিয়া রাসপান্তি, টেক্সটাইল এন্ড ডিজাইন স্টুডিও Kukka এর স্বত্বাধিকারী লরা লুচম্যান এবং বায়োডিজাইন ল্যাব এন্ড

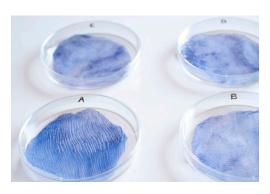
ক্রিয়েটিভ রিসার্চ এজেন্সি Faber Futures এর প্রতিষ্ঠাতাসহ কিছু উদ্ভাবক প্রাকৃতিক ও জীবপ্রকৌশলকৃত পোশাক রঙ করতে ন্যাচারালি পিগমেন্টেড ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করছেন । লুচম্যান বলেন তার প্রক্রিয়ায় প্রথমে কাপড়কে অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে দৃষণ মুক্ত করা হয়। তারপর একটি কনটেইনারে কাপড়টি নিয়ে এতে ব্যাকটেরিয়া পুষ্টিগুনসমৃদ্ধ একটি তরল মিডিয়াম ঢেলে দেওয়া হয়। তারপর তিনি সে ভেজা কাপড়টিকে ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে আনেন এবং একটি তাপ-চাপ নিয়ন্ত্রিত চেম্বারে ৩ দিনের জন্য রেখে দেন। সবশেষে তিনি সে কাপড়টিকে আবার জীবাণু মুক্ত করেন, ভালো কোনো লন্ড্রি ডিটার্জেন্ট দিয়ে কাপড়টি ধুয়ে ফেলেন যেন ব্যাকটেরিয়া মিডিয়ামের গন্ধও ধুয়ে যায়। তারপর তিনি কাপড়টিকে শুকানোর জন্য দেন। শিয়েজা বলেন,

ব্যাকটেরিয়ার রঞ্জকটি বিভিন্ন ধরনের রঙ ও প্যাটার্নে প্রয়োগ করা যায় এবং এতে চিরাচরিত পদ্ধতির চেয়ে ২০% পানি কম খরচ হয়।

তবে এ কৌশলে মানবসৃষ্ট অপচনশীল ফাইবার থেকে বোনা কাপড় এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি রঞ্জক পদার্থকে একই সাথে পরিবর্তন করাটা অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ। জীবপ্রকৌশল থেকে পাওয়া সামগ্রীর সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে একে নিত্যব্যবহার্য জিনিসের মতো শক্তিশালী তথা মজবুত করে গড়ে তোলা। সহজাত/দেশজ সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি এ সমস্যাটি অতিক্রম করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তার মতে তার বায়োলেদারের শক্তি ও পানিপ্রতিরোধ্যতা অনেকটাই বেড়ে গেছে রাসায়নিক পদার্থের বদলে ধোয়ার মাধ্যমে ট্যানিং করে।

এ পরিবেশবান্ধব কাপড় এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে ল্যাবরেটরির রাজ্যে , বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা এবং হাই ফ্যাশন রানওয়ে গুলোতে। কিন্তু যেসব বিজ্ঞানীরা এটিকে প্রচার করছে তারা বলেন বিভিন্ন ঘরানার ভোক্তা বাজারে নতুনত্ব জারি করার আগ পর্যন্ত এটি শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার। শিয়েজা বলেন,

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র ৩৮.৩: পেট্রিডিশে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে রঙ করা ছোট সিল্কের নমুনা। ছবি কৃতিত্ব: Laura Luchtman, Ilfa Siebenhaar

প্রথমে যেটা সামাল দেওয়া দরকার সেটি হচ্ছে জীবপ্রকৌশলকৃত পোশাক-আশাকের দামের সাথে গতানুগতিক পোশাকের
দামের সামঞ্জস্য আনা। উদাহরন হিসেবে বলা যেতে পারে ,
লুচম্যান তার একটি ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে রঙ করা সিল্কের
স্কার্ফ বিক্রি করেন ১৩৯ ডলারে যেখানে হুবহু একই রকম
গতানুগতিকভাবে তৈরি সিল্কের স্কার্ফকে কেনা সম্ভব মাত্র ১০
টাকায়। নবায়নযোগ্য শক্তিকে ঘিরে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে
ঠিক তেমনি ব্যয়-সামঞ্জস্যতা কখনোই শুধু বিজ্ঞান এবং এমন
প্রযুক্তি যা কাজে আসে তার উপর নির্ভর করে বসে থাকবেনা,
এটিকে সক্ষম করতে হবে গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়গের জন্য
সরকারি ভর্তুকি ও মানসিক পরিবর্তন তৈরির মধ্য দিয়ে।

উন্নত ফাইবার প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্র (CRAFT) এর অধিষ্ঠাতা এবং প্যান্সেল্ভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রকৌশলবিষয়ক আধ্যাপক ম্যালিক ডেমিরেল এ ব্যাপারে এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে ভোক্তাবাজারে বায়োডিজাইনকৃত পোশাক আসতে এখনো বশ কিছু সময় লাগবে। কিন্তু, তিনি বলেন, উৎপাদন প্রক্রিয়া যদি সীমিত করা যায় তবে এর সুফলগুলো এর চ্যালেঞ্জগুলোকে ছাপিয়ে যাবে। তিনি মন্তব্য করেন,

প্রোটিন বা শর্করা বেসড ফাইবার বা তন্তুগুলো প্রাকৃতিকভা-বেই পচনশীল এবং প্রকৃতি খুব ভালো করেই জানে কিভাবে সেগুলোকে আবার কাজে লাগানো যাবে।

এছাড়াও এ গবেষণাকে যেসব ডিজাইনাররা সমর্থন করছেন তারা বলছেন পচানোর জন্য কম্পোস্টিং ফ্যাসিলিটিতে পাঠানোর আগে এই কাপড়গুলোকে আবারো কাজে লাগানো যেতে পারে। ব্যবহৃত রঞ্জককে বার বার ব্যবহার করার মাধ্যমে একে বর্জ্যে পরিণত হতে দেরি করাটাই হলো জৈবিক এবং রাসায়নিক দ্রব্য বিহীন টেক্সটাইল রঞ্জক উপাদান তৈরির মূলনীতি।

সুজান লী - যিনি বার্ষিক বায়োডিজাইন সামিট বায়োফেব্রিকেট প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বায়োডিজাইন পরামর্শক সংস্থা বায়োকাউচার প্রতিষ্ঠা করেছেন - তিনি এ ম্যাটেরিয়ালগুলোর জন্য এ জাতীয় পুনর্ব্যবহারমূলক চিন্তার প্রয়োজনীয়তাকে জোর দিয়েছেন স্কেলেবিলিটি ও সফলতার পথ হিসেবে। লী বলেন,

যদি ফাস্ট ফ্যাসন এ অবস্থা ধরে রাখে, তবে যে সামগ্রীগুলা ব্যবহার করা হয় সেগুলো আবার পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে বস্ত্রশীল্পের এ শ্রোতের কাচামাল হিসেবে ব্যবহার শুরু করতে হবে যা ফ্যাশনের ওই অংশকে কাচামালের যোগান দিয়ে সচল রাখবে। ডিজাইন প্রসেসের এ সময়ে এ ম্যাটেরিয়ালগুলোর গন্তব্য কখনোই ভাগার হতে পারেনা। এটা আমাদের কর্তব্য, বিশেষ করে ডিজাইনারদের, এ পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

ৡ ফিচার ছবিসূত্র: Texintel



§ ৩৯

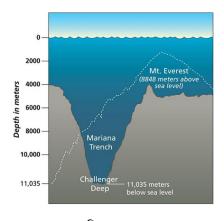


মারিয়ানা ট্রেঞ্চ: পৃথিবীর গভীরতম স্থান

আবিদ আবদুল্লাহ

পনাকে যদি পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কোনটি, এই প্রশ্নটি করা হয় তবে আমি নিশ্চিত আপনি তৎক্ষণাৎ উত্তরটি বলবেন - 'মাউন্ট এভারেস্ট'। কিন্তু আপনি কি জানেন পৃথিবীর গভীরতম স্থান কোনটি এবং কোথায় এটি অবস্থিত?

আজকের এই লেখায় পৃথিবীর গভীরতম স্থান মারিয়ানা ট্রেঞ্চ (খাদ) নিয়ে আলোচনা করব যা প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে অবস্থিত বিশ্বের গভীরতম সমুদ্রখাদ।



চিত্ৰ ৩৯.১

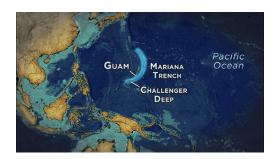
পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা প্রায় ৮৮৫০ মিটার বা ২৯০৩৫ ফিট যা নেপাল ও চীনের সীমান্তরেখায় অবস্থিত। অপরদিকে সমুদ্রের তলদেশে অবস্থিত পৃথিবীর গভীরতম স্থান মারিয়ানা ট্রেঞ্চের গভীরতা প্রায় ১১,০৩৪ মিটার (৩৬,২০১ ফিট) অর্থাৎ প্রায় ৭ মাইলের সমান! অর্থাৎ পুরো মাউন্ট এভারেস্টকেও যদি তুলে এনে এই জায়গায় ডুবিয়ে দেয়া হয় তারপরও এভারেস্ট শীর্ষ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২১৩৩ মিটার (৭০০০ ফিট) নিচে থাকবে! (চিত্র ৩৯.১)

মারিয়ানা ট্রেঞ্চ প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তে মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র ৩৯.২: মারিয়ানা ট্রেঞ্চের অবস্থান (Wikipedia)



চিত্র ৩৯.৩

(Mariana Island) ঠিক পূর্বে অবস্থিত। মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের নামানুসারে এই সমুদ্রখাদটিকে মারিয়ানা ট্রেঞ্চ নামকরণ করা হয়েছ। প্যাসিফিক প্লেট (Pacific Plate) এবং মারিয়ানা প্লেটের (Mariana Plate) সংঘর্ষে অধাগমন (Subduction) নামক এক ভৌগোলিক প্রক্রিয়ায় এই খাতটি তৈরি হয়েছে যা একটি বৃত্তচাপের আকারে উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ২৫৫০ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এবং এর গড় বিস্তার প্রায় ৭০ কিলোমিটার। (চিত্র ৩৯.২, ৩৯.৩)

মারিয়া ট্রেঞ্চ এর গভীরতম অংশটির নাম চ্যালেঞ্জার ডিপ (Challenger Deep) যেটি গুয়াম দ্বীপের (Guam Island) ৩৪০ কিলোমিটার

দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। চ্যালেঞ্জার ডিপ নামটি রাখা হয়েছে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জাহাজ HMS Challenger এর নামানুসারে কেননা এই জাহাজের নাবিকরা এই অংশটি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। ১৮৭৫ সালের অভিযানের পর ১৯৫১ সালে ব্রিটিশ জাহাজ H.M.S Challenger II প্রতিধ্বনি (Echo-Sounder) প্রযুক্তির মাধ্যমে এই গভীরতা পরিমাপ করে যা ১১ কিলোমিটারের (৭ মাইল) সমান!

মারিয়ানা ট্রেঞ্জের গভীরতা এতটাই বেশি যে এই জায়গাটা চির অন্ধকার এবং এটিই সাগরতলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার স্থান। এছাড়াও, পানির চাপ এতটাই যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের স্বাভাবিক বায়ুচাপের তুলনায় তা ১০০০ গুণেরও বেশি! এ কারণেই এখানে স্বাভাবিকের চেয়ে পানির ঘনত্বও প্রায় ৫ শতাংশ বেশি। এতসব প্রতিকূলতার কারণে চ্যালেঞ্জার ডিপে মানুষের অবতরণ সহজ ছিল না।

আজ থেকে ৫০ বছর আগে প্রথমবারের মতো চ্যালেঞ্জার ডিপে মানুষের অবতরণ হয়। ১৯৬০ সালে জ্যাক পিচার্ড (Jacques Piccard) এবং নৌবাহিনী লেফটেন্যান্ট ডন ওয়ালশ (Navy Lt. Don Walsh) ট্রিয়েস্ট (Trieste) নামক গভীর সমুদ্র তলে অনুসন্ধান যোগ্য জলযানে (Submersible) করে চ্যালেঞ্জার ডিপে পৌঁছান।



চিত্র ৩৯.৪: ট্রিয়েস্ট (Trieste), মারিয়ানা ট্রেঞ্চে যাওয়া মানব নির্মিত প্রথম জলযান

মারিয়ানা ট্রেঞ্চে অবতরণ

তাদের এই অবতরণে প্রায় পাঁচ ঘণ্টার মতো সময় লাগে এবং তারা মাত্র ২০ মিনিট সেখানে অবস্থান করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষ, পলি দ্বারা সেখানকার পানি এতটাই ঘোলা হয়ে গিয়েছিলো যে তাদের পক্ষে সেখানকার কোনো ছবি তোলাও সম্ভব হয়নি।

সম্প্রতি ২০২১ সালের পহেলা মার্চ রিচার্ড গেরিয়ট (Richard Garriott) চ্যালেঞ্জার ডিপে অবতরণ করেন (চিত্র ৩৯.৫) এবং এর মাধ্যমে তিনি বনে যান পৃথিবীর প্রথম ব্যক্তি যিনি একই সাথে পৃথিবীর উভয় মেরু, মহাকাশ এবং পৃথিবীর গভীরতম স্থানে গিয়েছেন। লিমিটিং ফ্যাক্টর (Limiting Factor) নামক জলযানে করে তাদের এই অভিযানটি ছিল প্রায় ১২ ঘন্টার! চ্যালেঞ্জার ডিপে অবতরণে প্রায় চার ঘন্টা সময় লেগেছিল, চারঘন্টা তারা সেখানে অবস্থান করেছিলেন এবং চার ঘন্টা সময় ফিরে আসতে ব্যয় হয়েছে।

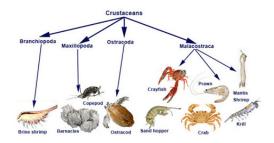


চিত্র ৩৯.৫: লিমিটিং ফ্যাক্টর জলযানে প্রবেশের পূর্বে রিচার্ড গেরিয়ট

পিচার্ড এবং ওয়ালশের এই অবতরণের আগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল এত উচ্চচাপে মারিয়ানা ট্রেঞ্চের অভ্যন্তরে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু ট্রেঞ্চে অবতরণের পর ট্রিয়েস্টের ফ্লাডলাইটে আলোতে পিচার্ড ফ্লাটফিশ (Flatfish) এর মতো প্রাণী দেখেছিলেন যেটি সম্পর্কে পরবর্তীতে তিনি তাঁর এই অভিযান বিষয়ক একটি বইয়ে বর্ণনা করেন। কয়েক দশক ধরে জীববিজ্ঞানীদের করা প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর হিসেবে পিচার্ড লিখেছেন,

পৃথিবীর গভীরতম সমুদ্রখাদে প্রাণের অস্তিত্ব কি থাকতে পারে? হ্যাঁ, অবশ্যই পারে।

পিচার্ডের বর্ণনা অনুযায়ী এত উচ্চচাপে সেখানে আসলেই প্রাণের অস্তিত্ব ছিল কিনা সেটা নিয়ে বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করেছিলেন। তবে প্রকৃতি এর অভিযোজনের অসাধারণ ক্ষমতার দরুণ বিজ্ঞানীদের এর আগেও বহুবার ভুল প্রমাণিত করেছে।



চিত্র ৩৯.৬: ক্রাস্টেশিয়ান উপপর্ব। সূত্র: Marine Education Society of Australasia

রিচার্ড গেরিয়ট তার সাম্প্রতিক অভিযানে চ্যালেঞ্জার ডিপের তলদেশে ক্রাস্টেশিয়ান উপপর্বের (Crustaceans) প্রাণী দেখেছিলেন যা থেকে সেখানে অন্যান্য আরো জৈব পদার্থের উপস্থিতির ধারণা পাওয়া যায়।

গেরিয়টের বিশ্বাস নতুন প্রজাতির অনেক প্রাণের অস্তিত্ব এখানে পাওয়া যাবে যেগুলো সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই বিশ্ববাসীর। বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্ৰ ৩৯.৭

সাধারণত সমুদ্রতলের গভীরে মৃত প্রাণীর কঙ্কাল খোলস জমা পড়তে থাকে। মারিয়ানার তলও আলাদা নয়। এখানকার পানির রং সেজন্যই খানিকটা হলুদ।

এত গভীরেও প্লাস্টিকের উপস্থিতি



চিত্ৰ ৩৯.৮

মারিয়ানা ট্রেঞ্চ থেকে গেরিয়টের নিয়ে আসা গভীর জলের এবং মাটির নমুনা পরীক্ষা করে Scripps Institute সেখানে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি পেয়েছে। অর্থাৎ মানুষের অগোচরে থাকা এই জায়গাটাতেও প্লাস্টিক পৌঁছে গেছে!

মারিয়ানা ট্রেঞ্চে উপস্থিত আণুবীক্ষণিক জীবের উপর গবেষণা থেকে পৃথিবীতে জীবের উত্থান ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সেখানকার মাটি পর্যবেক্ষণ করে আমাদের পৃথিবীর একেবারে প্রথম দিককার অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এছাড়াও সেখানকার পাথর বা শিলা পর্যবেক্ষণ করলে ভূমিকম্প সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ধারণা পাওয়া সম্ভব।

পৃথিবীর গভীরতম স্থান রহস্যময় মারিয়ানা ট্রেঞ্চ হতে পারে চমকপ্রদ জ্ঞানের উৎস।

তথ্যসূত্র

- ♦ Astronaut-explorer sets records on dive to deepest point on Earth − collectSPACE.
- ♦ The Mariana Trench deepseachallenge.com.
- ♦ The Mariana Trench: Earth's Deepest Place National Geographic.
- ♦ Mariana Trench Wikipedia.
- & Challenger Deep Wikipedia.



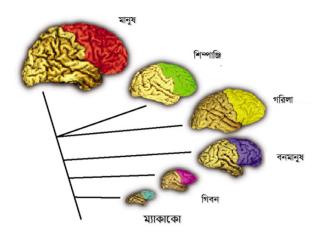
§ 80



আমরা কীভাবে অন্যদের থেকে বড় মস্তিষ্ক পেলাম

সুজয় কুমার দাশ

শৈতিহাসিক বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব থেকে এই অধুনা যুগ পর্যন্ত পারার পেছনে সবচাইতে বড় যে কারণ সেটি হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের উন্নত এবং অনেক বড় একটি মস্তিষ্ক আছে। আমারা ভাবতে পারি, চিন্তা করতে পারি, উদ্ভাবন করতে পারি এসবের পেছনেই রয়েছে আমাদের এই চমৎকার মন্তিষ্কের ভূমিকা। আমাদের মন্তিষ্কের ওজন প্রায় ১.৩৬ কেজি। যা আমাদের শরীরের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন ছিল সে তুলনায় প্রায় সাত গুণ বেশি। এবং এতে আছে প্রায় একশো বিলিয়ন নিউরন বা স্নায়ু কোষ। আমাদের প্রাইমেট বর্গের অন্যান্য নিকট আত্মীয় যেমন শিম্পাঞ্জি, গরিলা এদের কিন্তু এত বড় মন্তিষ্ক নেই। শিম্পাঞ্জির মন্তিষ্ক তার শরীরের তুলনায় মাত্র দুই গুণ বড় এবং গরিলার মন্তিষ্ক আমাদের মন্তিষ্কের চাইতেও ছোট। বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে আমরা এতদূর এসেছি তার কারণ আমাদের এই এত বড় একটা মন্তিষ্ক আছে আর আমরা তার যথাযথ ব্যবহার করে যাচ্ছি।

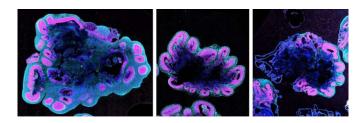


চিত্র ৪০.১: মানুষের সাথে প্রাইমেট বর্গের অন্য প্রাণিদের মস্তিষ্কের আকৃতিগত তুলনা।

প্রাইমেট বর্গের অন্যান্য সদস্যদের কেন আমাদের মতন বড় আকারের

মস্তিষ্ক নেই? সাধারণত শরীরের অন্যান্য অংশের কোষ এর তুলনায় মস্তিষ্ক কোষের শক্তির চাহিদা অনেক বেশি। প্রতি গ্রাম মস্তিষ্ক কোষের শক্তির চাহিদা শরীরের অন্যান্য অংশের প্রতি গ্রাম কোষের চাইতে বেশি। আর বড় আকারের মস্তিষ্কে কোষের সংখ্যাও বেশি। স্বভাবতই তখন শক্তির চাহিদা আরও বেশি হয়ে থাকে। প্রাইমেট বর্গের অন্যান্য সদস্যরা রান্না করা ছাড়াই কাঁচা খাদ্য খায়। যার সবটা এরা পরিপাক করতে পারে না। ফলে গ্রহণ করা খাবারের পরিমাণ অনুযায়ী এরা তেমন শক্তি পায় না। সুতরাং বর্তমানে তাদের মস্তিষ্কে থাকা নিউরন বা স্নায়ু কোষের চাইতে বেশি সংখ্যক নিউরনের শক্তি যুগানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। অপর দিকে আধুনিক মানুষ তথা হোমো স্যাপিয়েসদের পূর্ব পুরুষেরা রান্না করতে শিখেছিল। ফলে তারা অন্য সদস্যদের সমপরিমাণ খাবার থেকে তুলনামূলক বেশি শক্তি পেত এবং আরও বেশি সংখ্যক নিউরন কোষের শক্তির যোগান দেবার ক্ষমতা ছিল।

একটি নতুন গবেষণা কীভাবে মানুষেরা শিম্পাঞ্জি কিংবা গরিলার থেকে অধিক সংখ্যক নিউরন বিশিষ্ট বড় মস্তিষ্ক লাভ করেছে তার কারণ উদ্মাটন করেছে। যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজে অবস্থিত আণবিক জীববিজ্ঞান গবেষণাগার মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল (এমআরসি) এর একদল গবে-ষক গবেষণাটি সম্পাদন করে। গবেষণাপত্রটি সেল জার্নালে প্রকাশিত হয়।



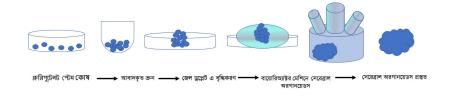
চিত্র ৪০.২: প্রথম ছবিটি মানব মস্তিষ্কের অরগানয়েড এর ছবি। এরপর ক্রমে গরিলা এবং শিম্পাঞ্জির অরগানয়েড এর ছবি। ছবিসুত্রঃ ফিজিক্স ডট ওআরজি।

তারা ইন-ভিট্রু পদ্ধতিতে মানুষ, শিম্পাঞ্জি, গরিলার মস্তিষ্কের অরগানয়েড

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

তৈরি করেন। অরগানয়েড কে বলা যায় ছোট মস্তিষ্ক। এই জন্যে তারা মানুষ, শিম্পাঞ্জি, গরিলার প্লুরিপুটেনট স্টেম (Pluripotent Stem Cells) কোষ নমুনা সংগ্রহ করে তিন মাত্রিক বায়োরিঅ্যাক্টর মেশিনে কালচার করেন। এক একটি মস্তিষ্কের অরগানয়েড তৈরি হতে কয়েক মাস সময় লাগতে পারে। গবেষকরা জানায় অন্যান্য বনমানুষ এর চেয়ে মানুষের ব্রেন অরগানয়েড গুলোর বৃদ্ধি অনেক বেশি হয়ে থাকে। গবেষণায় নেতৃত্বে থাকা ডক্টর মেডলিন ল্যানকাস্টার জানান,

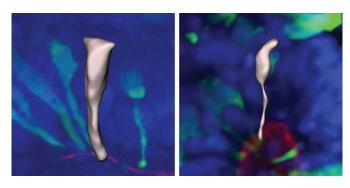
অন্যান্য বনমানুষ বা নিকট আত্মীয়দের চাইতে মানুষদের ব্রেন এর প্রধান পার্থক্য হল মানুষের ব্রেন অবিশ্বাস্য রকমের বৃহৎ। এই পার্থক্য এর কারনেই আমরা অন্যদের থেকে আলাদা।



চিত্র ৪০.৩: ইন ভিট্রু পদ্ধতিতে অরগনায়েড তৈরি।

মস্তিষ্ক গঠন প্রক্রিয়ার প্রথম দিকের নিউরন বা স্নায়ু কোষ গুলো যেসব স্টেম কোষ থেকে তৈরি হয় সেগুলোকে বলা হয় নিউরাল প্রোজেনিটরস বা পূর্বসূরী স্নায়ু কোষ। এই কোষ গুলো প্রথম দিকে সিলিন্ডার আকারের থাকে। এবং তখন তারা খুব সহজেই বিভাজিত হয়ে একই রকমের অপত্য কোষ তৈরি করতে পারে। এই ধাপটা যত দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে মস্তিষ্কে নিউরনের সংখ্যা তত বেশি বাড়তে থাকে। প্রোজেনিটরস কোষ গুলো ধীরে ধীরে পরিণত হতে থাকে এবং একটা সময়ে সেগুলো অনেকটা কোন(Cone) আইসক্রিম এর আকার ধারণ করে। তখন এসব কোষের কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া মন্থর হয়ে আসে এবং এক সময় বন্ধ হয়ে যায়। ইঁদুরের উপর করা এমন একটি গবেষণায় দেখা যায় ইঁদুরের প্রজেনিটরস কোষ গুলো মাত্র

এক ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানে কোন আকৃতি ধারন করে এবং এদের বিভাজন প্রক্রিয়া মন্থর হয়ে যায়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মানুষ, শিম্পা-ঞ্জি, গরিলার ব্রেন অরগানয়েড গঠন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছেন।



চিত্র ৪০.৪: পূর্বসূরী কোষ গুলো কোন আকারের ধারন করে। ছবিসুত্রঃ ফিজিক্স ডট ওআরজি।

তারা লক্ষ্য করেন শিম্পাঞ্জি, গরিলায় পূর্বসূরী কোষ গুলোর পরিণত হতে প্রায় ৫ দিন সময় নেয়। কিন্তু মানুষ এর ক্ষেত্রে ৭ দিন বা তার বেশি সময়ও লেগে যায়। যে কারণে মানুষের ক্ষেত্রে প্রোজেনিটরস কোষ গুলো আরও বেশি সময় ধরে বিভাজিত হবার সময় পায়। আর তাই অন্যান্যদের তুলনায় মানুষদের মস্তিষ্কে নিউনের সংখ্যাও বেশি হয়ে থাকে। এবং তা সংখ্যায় তিন গুণ বেশি! ডক্টর ল্যানকাস্টার বলেছেন:

এটা সত্যি অভিনব যে পূর্বসূরী কোষ গুলোতে ক্ষুদ্র একটা বিবর্তনিয় পরিবর্তন আমাদের মস্তিঙ্কের কোষে বিশাল পরিবর্তন এনেছে। আমাদের মানুষ করে তুলেছে।

এর পেছনে জিনগত কারণ জানবার জন্যে তারা ব্রেন অরগানয়েড গঠনের প্রথম ধাপটির সময় কোন জিন গুলো প্রকট হয় সেগুলো পর্যবেক্ষণ করেন এবং মানুষ, শিম্পাঞ্জি ও গরিলার মধ্যে তুলনা করে দেখেন। তারা শনাক্ত করেন যে, 'ZEB2' নামের একটি জিন মস্তিষ্ক গঠনের সময় গরিলায় মানুষের অনেক আগে প্রকটিত হয়। গবেষকরা এই জিনটির কার্যক্রম মন্থর করে দিয়ে খেয়াল করেন যে পূর্বসূরি কোষ গুলো পরিণত হতে আরও সময় নেয় এবং তখন এগুলো আরও বেশি বেশি বিভাজিত হতে পারে। অপর দিকে মানুষের মধ্যে এই জিন এর প্রক্রিয়া আরও দ্রুত করে দেখা যায় পূর্বসূরি কোষ গুলো আগের তুলনায় তাড়াতাড়ি পরিণত হয়ে যায় এবং কম বিভাজিত হয়। অর্থাৎ 'ZEB2' জিন পূর্বসূরী কোষ গুলোকে তাড়াতাড়ি পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। গবেষণাটি সত্যিই অভিনব। অন্তত আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক এত উন্নতির পেছনে সম্ভবত একটা বড় রহস্যের জাল উন্মোচিত করে।

তথ্যসূত্র

♦ Scientists discover how humans develop larger brains than other apes – Phys.org.



§ 83



এইচআইভি উদ্ভবের আশ্চর্য ইতিহাস

আরাফাত রহমান

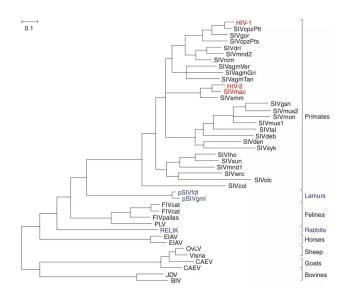
২০২০ বসন্ত-কোয়ার্টারে UCR-এ TA করার সময় শিক্ষার্থীদের বিবর্তন কোর্সে Sharp and Hahn (2011) পেপারটা ডিসকাশন সেকশনে আলোচনা করেছিলাম। তখনো নভেল করোনা ভাইরাস নতুন ছিলো। কিন্তু নভেল করোনা ভাইরাস যেভাবে অতিমারী (pandemic) তৈরি করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে, সেটা নতুন ছিলো না। প্রায় একশ বছর আগেই এইচআইভি ভাইরাস প্রায় একই প্রক্রিয়ায় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। এই লেখাতে আমরা এইচআইভি ভাইরাস উদ্ভবের ইতিহাসটা জানবো।

বানর থেকে এইচআইভি মহামারীর উদ্ভব

৯৮১ সালের কথা। বেশ কয়েকজন সমকামী যুবক একটি রহস্যজনক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনাটা বেশ অবাক করা। কারণ তারা মারা গিয়েছিলেন কিছু ব্যাক্টেরিয়ার সুবিধাবাদী সংক্রমণে। এধরণের সংক্রমণ বেশ দূর্লভ, এসব ব্যাক্টেরিয়া সাধারণত ক্ষতিকর নয়। পরবর্তীতে বোঝা গেলো, একটা ভাইরাসের আক্রমণে আক্রান্ত যুবকদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (অনাক্রম্য ব্যবস্থা বা ইমিউনো সিস্টেম) এতই দূর্বল হয়ে গেছে যে সাধারণত ক্ষতিকর নয় এমন ব্যক্টেরিয়াও রোগ তৈরি করার সুযোগ পেয়েছে। এই রোগটিকে বলা হলো এইডস (অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রোম) আর যে ভাইরাসের কারণে এই রোগটি হয় তার নাম দেয়া হলো এইচআইভি (হিউম্যান ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস)।

কয়েক বছর পরে,আফ্রিকাতে ১৯৮৬ সালে, দেখতে শুনতে একই রকম কিন্তু ভিন্ন ধরণের এন্টিজেন বহনকারী এইচআইভি ভাইরাস আক্রান্ত কয়েকজন রোগীর দেখা পাওয়া গেল। পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেলো, এই এইচআইভি ভাইরাসগুলো এসআইভি (সিমিয়ান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস) এর বংশগতির দিক দিয়ে অনেক জেনেটিক মিল পাওয়া যাচ্ছে। এসআইভি ভাইরাস চিড়িয়াখানায় ম্যাকাক বানরে একই ধরণের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দূর্বল করে দেয়া ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি রোগ করে

বলে জানা ছিলো।



চিত্র 8১.১: HIV (লাল রঙ) ভাইরাসের সাথে SIV ভাইরাসের জেনেটিক মিল লক্ষ্যনীয়। এইচআইভি-১ শিম্পাঞ্জী থেকে আসা এসআইভি-র সাথে সবচাইতে বেশি মিল। অন্যদিকে এইচআইভি-২ ম্যাকাক ও সুটি-ম্যান্সাবে বানরের থেকে আসা এসআইভি ভাইরাসের সাথে বেশি মিল। ছবি মূল গবেষণাপত্র থেকে নেয়া।

পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা আফ্রিকার অন্যান্য প্রাইমেটদের মাঝে এসআইভি ভাইরাস খোঁজা শুরু করেন। দেখা গেলো, আফ্রিকার বিভিন্ন প্রাইমেট প্রজাতিতে এসআইভি ভাইরাস প্রাকৃতিক ভাবেই থাকে। তারা কোন রোগ তৈরি করে না। বংশগতির জাতিজনিক (ফাইলোজেনেটিক) গবেষণায় এইচআইভি ভাইরাস ও এসআইভির সাথে অত্যন্ত মিল দেখা গেলো। যদিও এইচআইভি মানুষের ক্ষেত্রে রোগ তৈরি করছে। সচরাচর ভাইরাস তার পোষক প্রজাতি পরিবর্তন করে না। বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত টানলেন যে কিছু এসআইভি ভাইরাস প্রাইমেট ও মানুষের মাঝে প্রজাতির-বাধা অতিক্রম করেছে। এই প্রজাতি-বাধা অতিক্রম বেশ কয়েকবার ঘটেছে আলাদা আলাদা ভাবে। আসলে এইচআইভি কিন্তু একটি ভাইরাস নয়।

এইচআইভির দুইটি বড় দল রয়েছে, এইচআইভি-১ ও এইচআইভি-২। এইচআইভি-১ ভাইরাসরা হলো শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে পাওয়া এসআইভি-র সাথে বেশি সম্পর্কিত। অন্যদিকে এইচআইভি-২ ভাইরাস শুটি ম্যাঙাবে নামক এক ধরনের বানরের মধ্যে পাওয়া এসআইভি-র সাথে বেশি সম্পর্কিত।

একটা খটকা কি আপনার মাথায় এসেছে? এর আগে বলেছি এসআইভি মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাইমেটদের মধ্যে কোন রোগ তৈরি করে না। কিন্তু শুরুতেই বলেছি যে চিড়িয়াখানায় ম্যাকাক বানরের মধ্যে এসআইভি ভাইরাস দিয়ে রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা দূর্বল করে দেয়া রোগ সৃষ্টি করতে দেখা গেছে। এই দুইটা বক্তব্য পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। আসলে, ম্যাকাক হলো এশিয়ার প্রাইমেট প্রজাতি। এসআইভি ভাইরাস কেবলমাত্র আফ্রিকার প্রাইমেটদের (বানর ও নরবানর) মধ্যেই পাওয়া যায়। সুতরাং ম্যাকাকের মধ্যে যে এসআইভি পাওয়া গেছে, তাদের প্রাকৃতিক পোষক ম্যাকাক নয়।

প্রাইমেট লেন্টিভাইরাসগণ

প্রাইমেটদের মাঝে এইচআইভি বা এসআইভি একটা বড় ভাইরাস পরিবার থেকে এসেছে যাকে বলা হয় লেন্টিভাইরাস। লেন্টিভাইরাসরা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মাঝে দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ করতে পারে। এসব সংক্রমণের একটা অংশ আবার পোষকের মাঝে অন্তঃস্থ হয়ে স্বাভাবিক দশায় পরিণত হতে পারে। তার মানে হলো এ ভাইরাসরা নিজেদের ডিএনএকে পোষকের জননকাষের জিনোমে সংযুক্ত করে দিতে পারে। ফলে তারা মাতা থেকে সন্তানের মাঝে সহজেই ছড়িয়ে যায়। বিভিন্ন প্রাণীর জিনোমে ভাইরাসের ডিএনএ অনুক্রম পাওয়া যায় যাদেরকে অনেক সময় দুর্বল বলা হয়।

এখন পর্যন্ত এসআইভি ভাইরাস শুধু আফ্রিকার প্রাইমেটদের মধ্যেই

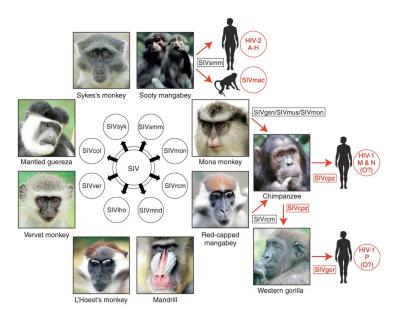
পাওয়া গেছে। তার মানে, ইতিহাসের যে মুহূর্তে আফ্রিকা ও এশিয়ার পুরাতন পৃথিবীর বানরদের বংশ আলাদা হয়ে যায়, তার পরে এসআইভি ভাইরাসের আবির্ভাব। সেটাও প্রায় ৬০-১০০ লক্ষ বছর আগের কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব প্রাইমেট প্রজাতির মাঝে কেবলমাত্র এক ধরনের এসআইভি ভাইরাস প্রকারণ (স্ট্রেইন) দেখতে পাওয়া যায়। তবে, মাঝে মাঝে এসকল বানর-নরবানরদের মধ্যেও এসআইভি ভাইরাসের প্রজাতির বাঁধ অতিক্রম করার ঘটনা ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সকল প্রজাতি-বাঁধ অতিক্রম মূলত ভাইরাসের জন্য অন্ধগলিতে গিয়ে পৌঁছানোর মতো। কারণ তারা প্রজাতি-বাঁধ অতিক্রম করলেও নতুন প্রজাতির বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। তবে কখনো কখনো এসকল নতুন ভাইরাস ঐ প্রজাতির বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এছাড়াও, আমরা মোজাইক ভাইরাস প্রকরণও দেখতে পাই। যখন একই পোষকে দুইটি ভাইরাসের প্রকরণ দিয়ে সংক্রমিত হয়, তখন নতুন ধরনের ভাইরাস তৈরি হতে পারে এই দুইটি ভাইরাসের জিনোমের একাংশ রিকম্বিনেশন প্রক্রিয়ায় জোড়া লেগে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মোজাইক জিনোম তৈরি হয়।

শিম্পাঞ্জি এসআইভি-র উদ্ভব

জাতিজনিক বৃক্ষের বংশগতির মিল-অমিল পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে শিম্পাঞ্জিদের মাঝে থাকা এসআইভি ভাইরাস এইচআইভি-১ ভাইরাসের অত্যন্ত নিকটাত্মীয়। শিম্পাঞ্জির কিন্তু দুইটি প্রজাতি রয়েছে: সাধারণ শিম্পাঞ্জি ও বনোবো। আমরা যদি সাধারণ শিম্পাঞ্জিদের মাইটোকন্দ্রিয়াল ডিএনএ বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখা যাবে যে এদর চারটি ভিন্ন ভিন্ন উপপ্রজাতি রয়েছে। এই উপপ্রজাতিগুলো আবার ভিন্ন আফ্রিকার ভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে আলাদাভাবে বিচরণ করে। এই চারটি উপপ্রজাতি হলো পাশ্চাত্য, নাইজেরিয়া-ক্যামেরুন, মধ্য-আফ্রিকা, ও পূর্ব আফ্রিকা। বিজ্ঞানীরা এসব অঞ্চলের শিম্পাঞ্জিদের মল-নমুনা থেকে নিউক্লিওটাইড

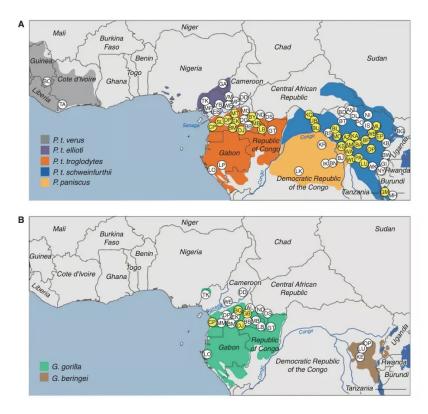
বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র ৪১.২: এসআইভি ভাইরাস ও তাদের প্রাকৃতিক পোষক-প্রাইমেটসমূহ। লাল তীর দিয়ে কিভাবে এসআইভি প্রজাতী বাঁধ অতিক্রম করে সেটা দেখানো হয়েছে। মজার ব্যপার হলো শিম্পাঞ্জী নিজেই দুইটি ভিন্ন বানরের কাছ থেকে এসআইভি পেয়েছে, যা পরবর্তীতে মানুষ ও গরিলা প্রজাতীতে সংক্রমিত হয়েছে। ছবিটি মূল গবেষণাপত্র থেকে নেয়া হয়েছে।

অনুক্রম বের করে এসআইভি ভাইরাস চিহ্নিত করেছেন। সিমিয়ান ইমিউনো ভাইরাস মূলত আরএনএ ভাইরাস। তাই এই গবেষণায় তারা রিভার্স ট্রাঙ্গক্রিপ্টেজ পিসিআর নামক একটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করেন। দেখা গেলো, চারটির মধ্যে মাত্র দুইটি উপপ্রজাতির মাঝে এসআইভি ভাইরাস দেখা যায়। এরা হলো মধ্য-আফ্রিকা ও পূর্ব-আফ্রিকা।

এর মানে কী? সাধারণ শিম্পাঞ্জির চারটির মধ্যে দুইটি উপপ্রজাতির মধ্যে যদি এসআইভি ভাইরাস পাওয়া নির্দেশ করে যে শিম্পাঞ্জি পোষকদের মধ্যে এসআইভি ভাইরাসের সংক্রমণ বেশ সাম্প্রতিক ঘটনা। আরো মজার বিষয় হলো, এই দুই উপপ্রজাতীতে পাওয়া এসআইভি বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র ৪১.৩: আফ্রিকাতে শিম্পাঞ্জি (উপরে) ও গরিলা (নিচে) বিভিন্ন উপপ্রজাতির বিস্তার। গোল দিয়ে নমুনা সংগ্রহের স্থান বোঝানো হচ্ছে। হলুদ রঙের গোল দিয়ে দেখানো হচ্ছে কোথায় কোথায় এসআইভি ভাইরাসের নমুনা পাওয়া গেছে। ছবিসূত্র: মূল গবেষণাপত্র।

মূলত মোজাইক! অর্থাৎ এরা আসলে দুইটি ভিন্ন এসআইভি ভাইরাসের বংশধারা থেকে এসেছে। আরো গবেষণা থেকে দেখা গেলো যে এই মোজাইক ভাইরাস জিনোমের ৫'-LTR, nif, ও ৩'-LTR অংশ এসেছে লাল-মাথা মাঙ্গাবে (রেড ক্যাপড ম্যাঙ্গাবে) থেকে। জিনোমের অন্যান্য অংশ (vpu, tat, rve, int) এসেছে মোনা-বানর থেকে। কিন্তু, দুইটি ভিন্ন এসআইভি কিভাবে শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে আসলো? আসলে শিম্পাঞ্জিরা প্রায়ই অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শিকার করে। তাদের

শিকারের মধ্যে ছোট বানরও থাকে যাদের শিম্পাঞ্জি খেয়ে ফেলে। তাই ধারণা করা হয় এই দুই শিম্পাঞ্জি প্রজাতিতে মূলত শিকার প্রক্রিয়ায় এসআইভির মোজাইক ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয় (গরিলাও একই এলাকার শিম্পাঞ্জিদের কাছ থেকে এসআইভি পেয়েছে)।

এসআইভি কিভাবে প্রজাতি-বাঁধ পার হয়ে এইচআই-ভিতে পরিণত হয়

আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বুশমিট শিকার নামক এক ধরণের চর্চা রয়েছে। বুশমিট শিকারে মানুষজন অজুত সব প্রাণী শিকার করে বেড়ায়। এর মধ্যে রয়েছে শিম্পাঞ্জি ও অন্যান্য প্রাইমেট। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, গত শতাব্দীর শুরুর দিকে এসআইভি শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষে প্রজাতি বাঁধা অতিক্রম করে। সম্ভবত বুশমিট শিকারে রক্ত বা ত্বকের উন্মুক্ত মিউকোসা কলার সংস্পর্শে এসআইভি মানুষে ছড়িয়ে পড়ে ও এইচআইভি-১ হিসেবে বিবর্তিত হয়। অন্যদিকে এইচআইভি-২ এর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিলো। কিন্তু এক্ষেত্রে সুটি-মাঙ্গাবে নামক বানর থেকে এই ঘটনা ঘটে। আফ্রিকাতে সুটি-মাঙ্গাবে কৃষকদের ফসল নষ্ট করে বলে এদেরকে অনেকটা ক্ষেত্রের ইনুরের মতো প্রতিরোধ করা হয়।

১৯১০ থেকে ১৯৩০ সালের দিকে, মধ্য-আফ্রিকা ছিলো ইউরোপের উপনি-বেশ। তখন সেখানে নগরায়ন হওয়া শুরু করেছিলো। এইচআইভি-১ এর একেবারে শুরুর দিকের মহামারি বংশগতির জাতিজনিক বৃক্ষ ও রোগতত্ত্ব গবেষণার মাধ্যমে মধ্য-আফ্রিকার লিওপডভাইল শহরে চিহ্নিত করা হয়েছে। লিওপডভাইল বর্তমানে কঙ্গোর কিনশাসা শহর যা আগে বেলজিয়াম এর উপনিবেশ ছিলো। এই হলো সেই শহর যেখানে এইচআইভি-১ ভাইরাস বিশ্বে মহামারি শুরু করার আগে প্রথম বিবর্তিত হওয়া শুরু করে।



চিত্র ৪১.৪: কি নিষ্ঠুর বুশমিট শিকার! ছবিটি University of Minnesota Duluth এর ওয়েবসাইট থেকে নেয়া।

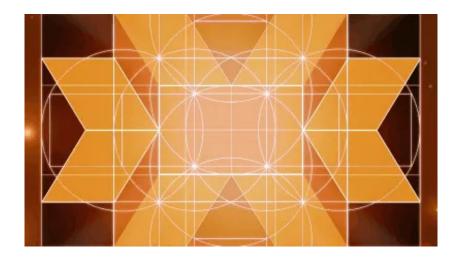
তথ্যসূত্র

♦ Paul M. Sharp and Beatrice H. Hahn. "Origins of HIV and the AIDS pandemic." Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine. 2011. 1(1): a006841.



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

§ 82



মেটালিক রেশিও: গোল্ডেন রেশিওর মূল পরিবার

সামিয়াতুল খান

ন ব্রাউনের দ্যা ভিঞ্চি কোড-এর কল্যাণে আমরা প্রায় সবাই গোল্ডেন রেশিও সম্বন্ধে জেনে গেছি। অনেক অনেক জায়গাতে এই গোল্ডেন রেশিও ব্যাবহার করা হয়, একে তো সৌন্দর্যের গাণিতিক মাপকাঠিও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু গোল্ডেন রেশিওর মত সিলভার রেশিও সম্বন্ধে কি আমরা জানি? কিংবা এই গোল্ডেন রেশিও আর সিলভার রেশিও পরিবার মেটালিক রেশিও? কিভাবে বের করা যায় এই রেশিও। আজকে আমরা সাবলীল ভাবে এই 'কিভাবে' বের করে ব্যাপারটা জানার চেষ্টা করব। আবার এটাও জানার চেষ্টা করব এই মেটালিক রেশিওর সাথে গোল্ডেন রেশিও আর সিলভার রেশিওর সম্পর্কটাই বা কী?

গোল্ডেন রেশিও

গোল্ডেন রেশিও নিয়ে লিখতে হলে গ্রীক গণিতবিদ ইউক্লিডের সংজ্ঞায়নটাই আগে বলে নিতে হবে। ইউক্লিড বলেছেন,

> একটা লম্বা 'লাইন' (সরলরেখা বা লাঠি যা ইচ্ছা কল্পনা করতে পারেন) কে দুটো অংশে ভাগ করতে হবে। এই বিভাজনটি হবে অসম। অর্থাৎ এর একটি অংশ হবে অপর অংশের তুলনায় বড়। এখন বড় অংশ আর ছোট অংশটির অনুপাত, পুরো অংশ আর বড় অংশের অনুপাতের সমান হয়। আর এই অনুপাতটাই হল গোল্ডেন রেশিও।

গোল্ডেন রেশিওকে গ্রীক বর্ণ Φ (ফাই) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যা হোক, পুরো ব্যাপারটা চিত্রায়নে বোঝা যাক।



চিত্র ৪২.১: গোল্ডেন রেশিও

উপরে একটা লাইন দেখতে পাচ্ছি আমরা। এই লাইনটাকে A আর B দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। স্পষ্টত দৃশ্যমান A অংশটি B অংশের চাইতে বড়। এখন ইউক্লিডের বর্ণনা অনুসারে আমরা যদি গাণিতিকভাবে দেখতে যাই তাহলে-

$$\Phi=rac{A}{B}=rac{A+B}{A}$$
বা, $\Phi=rac{A}{B}=1+rac{B}{A}$

সমীকরণটিকে Φ দ্বারা গুণ করলে-

$$\Phi^2 = 1 + \Phi$$

দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান করলে দাঁডায়-

$$\Phi = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

যেহেতু আমরা পজিটিভ দৈর্ঘ্য নিয়ে কথা বলছি, ঋণাত্মক মান্টুকু বাদ দিলে পাই-

$$\Phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1.618033\dots$$

এটাই গোল্ডেন রেশিও।

সিলভার রেশিও

গোল্ডেন রেশিও আমাদের কাছে বেশ পরিচিত হলেও গণিতের আরে-কটি অমিত সুন্দর অনুপাত সিল্ভার রেশিও। আজকে যেহেতু আমরা মেটালিক রেশিও নিয়ে কথা বলব, তাই মেটালিক রেশিও পরিবারের সদস্য সিল্ভার রেশিও কোথায় ব্যাবহার করা হয় তার চাইতে এটা কি আর কিভাবে পাওয়া যায় সেদিকেই আমাদের মনোযোগ বেশি থাকবে।

সিশভার রেশিও নিয়ে আলোচনা করতে হলেও আমাদের আবারও সেই 'লাইন' চিন্তা করতে হবে। কিন্তু, গোল্ডেন রেশিওর মত এবার আমরা আর লাইনটাকে দুইভাগে না, বরং তিনভাগে ভাগ করব। এই তিন ভাগের দুটি ভাগ হবে বড় অংশ যারা দৈর্ঘ্যে হবে সমান আর বাকি ভাগটি হবে ছোট অংশ। এখন এই লাইনটার পুরো অংশ আর বড় অংশটির অনুপাত আর যেকোন একটি বড় অংশ আর ছোট অংশের অনুপাত হবে সমান। আর এই অনুপাতটিই হল সিশভার রেশিও। সিলভার রেশিওকে প্রকাশ করতে বেছে নেওয়া হয় গ্রীক বর্ণমালার σ (সিগমা) বর্ণটিকে।

যা হোক, সিলভার রেশিও বোঝার শুরুতে আমরা আবারও চিত্রায়নে ফিরে যাব-



চিত্র ৪২.২: সিলভার রেশিও

আবারও উপরে একটি লাইন দেখতে পাচ্ছি আমরা। বর্ণনামতে এটাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে যার মধ্যে A আর A হল সমান দু-টি বড় অংশ আর B হল ছোট আর তিনভাগে ভাগ করার তৃতীয় অংশ।

উপরে বর্ণিত সংজ্ঞাটাকে যদি আমরা এবার গাণিতিকভাবে দেখি তাহলে-

$$\sigma=rac{A}{B}=rac{2A+B}{A}$$
 (পুরো লাইনটার দৈর্ঘ্য, $A+A+B=2A+B$) বা, $\sigma=rac{A}{B}=2+rac{1}{\sigma}$ বা, $\sigma=2+rac{1}{\sigma}$ ($rac{A}{B}=\sigma$ হলে $rac{B}{A}=rac{1}{\sigma}$)

এবার এখান থেকে যে দ্বিঘাত সমীকরণ পাওয়া যায়-

$$\sigma^2 = 2\sigma + 1$$

দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান করে ধ্বনাত্মক মান নিয়ে-

$$\sigma = \frac{2 + \sqrt{8}}{2} = \frac{2 + 2\sqrt{2}}{2} = 1 + \sqrt{2} = 2.414213...$$

এটাই সিলভার রেশিও।

আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা গোল্ডেন রেশিও আর সিলভার রেশিও কিভাবে পাওয়া যায় সেটা জেনে গেলাম। এটাও জানলাম গোল্ডেন রেশিও পাওয়ার ক্ষেত্রে লাইনকে দুইভাগে ভাগ করতে হলেও সিলভার রেশিওর ক্ষেত্রে সেটা হতে হবে তিনভাগে। কিন্তু মেটালিক নাম্বার পরিবারের মূল সদস্য মেটালিক রেশিওর আলোচনা এখনও বাকি আছে। এবার আমরা সেটাই জেনে নেব।

মেটালিক রেশিও

পুরো আলোচনাটাকে আমরা একটু সাধারণভাবে দেখতে চেষ্টা করব এবার।

ধরা যাক এবার একটি লাইনকে n+1 অংশে ভাগ করা হল। এই ভাগের n অংশের দৈর্ঘ্য সমান আর তা হল A আর ছোট অংশ হল B। যেমনটা আমরা সিলভার রেশিওর ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে তিনটি (n+1) অংশে ভাগ করে বড় দুটি (n) অংশ A আর ছোট অংশটি B। আগের রেশিওর ক্ষেত্রে আমরা যেমনটা বলেছিলাম এখানেও সেটা প্রয়োগ করব এবার। অর্থাৎ বড় অংশটির দৈর্ঘ্য আর ছোট অংশটির দৈর্ঘ্য-এর অনুপাত এবং পুরো অংশের দৈর্ঘ্য আর বড় অংশের দৈর্ঘ্যের অনুপাত—

$$\frac{A}{B} = \frac{nA + B}{A}$$

পুরো লাইনের দৈর্ঘ্য n টা বড় অংশের দৈর্ঘ্য nA আর একমাত্র ছোট অংশের দৈর্ঘ্য B এর যোগফলের সমান=nA+B

এই অনুপাতটাকে যদি আমরা গ্রীক বর্ণ λ (ল্যামডা) দিয়ে সূচিত করি-

$$\lambda=rac{A}{B}=rac{nA+B}{A}$$
 বা, $\lambda=rac{A}{B}=n+rac{B}{A}$ বা, $\lambda=n+rac{1}{\lambda}$ ($rac{A}{B}=\lambda$ হলে $rac{B}{A}=rac{1}{\lambda}$) বা, $\lambda^2=n\lambda+1$

দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানে ধ্বনাত্মক মান চিন্তা করে-

$$\lambda = \frac{n + \sqrt{(n^2 + 4)}}{2}$$

এই সমীকরণে n>1 এর জন্যে λ কে বলা হয় 'মেটালিক রেশিও'। কেউ কেউ অবশ্য এটাকে 'মেটালিক মূল'ও বলে থাকেন। আবার একটু খেয়াল করলে দেখবেন, এই সমীকরণেই n=1 এর জন্যে λ এর যে মান পাওয়া যায় সেটাই গোল্ডেন রেশিও। আবার n=2 এর জন্যে λ এর যে মান পাওয়া যায় সেটাই সিলভার রেশিও।

আলোচনার মাঝপথেই বলেছিলাম, গোল্ডেন রেশিও আর সিলভার রেশিও মেটালিক রেশিও পরিবারের সদস্য। এবার মিলল তো?



§ 80



গাছেও কি ক্যান্সার হতে পারে? কিংবা হলেও তা কতটা মারাত্মক?

মোঃ সানজিদ আহমেদ, অর্ণব কান্তি পাল

থমেই আমাদের জানতে হবে ক্যান্সার কী? ক্যান্সার হচ্ছে যেকোনো ধরনের কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি পাওয়া তা হতে পারে সেই জীবের জন্য উপকারী কিংবা অপকারী। প্রাণীর ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বে একটি ভয়ংকর মরণব্যাধি (বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে) হল ক্যান্সার। কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়।

সাধারণত প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় শরীরের যেকোনো একটি অংশে একটি টিউমার সৃষ্টি হয়। তারপর এই টিউমার আকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে অর্থাৎ বারবার কোষ বিভাজনের মাধ্যমে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। একসময় সেটি ক্যান্সারে পরিণত হয়।

প্রাণীতে ক্যান্সার কীভাবে ছড়ায়?

প্রাণীদেহে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে বলে মেটাস্ট্যাসিস। যেখানে ক্যান্সার সৃষ্টি হয় সেখান থেকে রক্তনালী কিংবা লিক্ষনালীর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন স্থানে যেমন- হাড়, যকৃত কিংবা ফুস্কুসে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর কোনো একসময় দেখা যায় যে শরীরের ক্যান্সার আক্রান্ত অঙ্গ নষ্ট হয়ে যায় এবং প্রাণীটির মৃত্যু ঘটে। প্রাণীর মতো উদ্ভিদে ক্যান্সার বা টিউমার এক অংশ থেকে আরেক অংশে ছড়ায় না অর্থাৎ মেটাস্ট্যাসিস হয় না।

দুটি কারনে উদ্ভিদে ক্যান্সার ছড়াতে পারে না:

১. উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর
উদ্ভিদের কোষের বাইরে শক্ত এবং পুরু কোষ প্রাচীর থাকার
কারণে উদ্ভিদের কোষগুলো চলাচল করতে পারে না। তাই
উদ্ভিদের কোথাও টিউমার হলেও সেটা উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন
স্থানে ছড়াতে পারে না।

২. প্রাণীর মত উদ্ভিদের পরিবহন তন্ত্র না থাকা
উদ্ভিদে পরিবহনতন্ত্র থাকলেও প্রাণীর মত নেই। প্রাণীর পরিবহনতন্ত্র
জীবিত, সজীব এবং কর্মক্ষম কোষ দিয়ে গঠিত। অপরদিকে
উদ্ভিদে তা মৃত কোষ দ্বারা গঠিত এবং সেটি শুধু পুষ্টি
পরিবহনেই সক্ষম। প্রানির মত কোষ পরিবহন হয় না।

এসব কারনে উদ্ভিদে ক্যান্সার ছড়াতে পারে না। উদ্ভিদে সৃষ্ট টিউমারটি উদ্ভিদ নিজের মত করে অভিযোজন করে নেয় এবং সেটা উদ্ভিদের একটি অংশ হয়ে যায়। এতে করে উদ্ভিদ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। তবে কখনো কখনো উদ্ভিদের মৃত্যুও হতে পারে। যদি নাও হয় কোষ গুলো তাদের টটিপটেন্সি হারিয়ে ফেলে (বলে রাখা প্রয়োজন টটিপটেন্সি হচ্ছে প্রতিটি কোষের সেই বৈশিষ্ট্য যেটা থেকে নতুন উদ্ভিদ হবার ক্ষমতা থাকে)। উদ্ভিদের ঐ অংশগুলো তার জৈবিক কার্যাবলি হারিয়ে মৃত হয়ে যায়।

প্রাণীদেহের কোনো অঙ্গে ক্যান্সার হলে একসময় প্রাণীটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু উদ্ভিদের কোনো একটি অংশে টিউমার হলে উদ্ভিদের শুধুমাত্র ঐ অংশ মরে গেলেও উদ্ভিদটি জীবিত থাকে।

এবার আসি উদ্ভিদে কী ধরনের টিউমার হতে পারে?

উদ্ভিদে দুই ধরনের টিউমার হতে পারে।

- ১. গল (GALL)
- ২. বার্ল (BURL)

গল

গল হচ্ছে উদ্ভিদের পাতা, ডালপালা, মূল অথবা যেকোনো অংশের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। গল সাধারণত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বা বিজ্ঞান অভিসন্ধানী বিজ্ঞান ব্লগ

কীটপতঙ্গের আক্রমনের ফলে হয়। গল দেখতে গলাকার, নব আকৃতির অথবা আঁচিলের মত হতে পারে। সাধারণত ক্রাউন গল উদ্ভিদে সবচেয়ে বেশি বিশেষ করে নগ্নবীজী এবং দ্বিবীজপত্রী আবৃতবীজী উদ্ভিদে বেশি দেখা যায়। উদ্ভিদের এই ক্রাউন গল রোগ এবং এর কারণ সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা দেন বিজ্ঞানী আরউইন এফ. স্মিথ (Erwin F. Smith)। এটি Agrobacterium tumefaciens ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা হয়ে থাকে যা মাটিতে বাস করে। যেহেতু এটি মাটিতে থাকে তাই প্রথমিকভাবে এটি মূলে আক্রমণ করে।



চিত্র ৪৩.১: উদ্ভিদের মূলের ক্রাউন গল বা টিউমার। সূত্র: California Agriculture

Agrobacterium tumefaciens ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদের যেকোনো ক্ষত অংশে আক্রমণ করে থাকে। একবার যদি এই ক্রাউন গল হয়ে যায় এরপর ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য ছাড়াই এটি বৃদ্ধি পেতে থাকে। যখন উদ্ভিদ এই ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন আক্রান্ত কোষের পাশের কোষগুলো ক্রমাগত বিভাজিত এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং এই বৃদ্ধি হয়ে থাকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে অর্থাৎ কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি তখন সেই কোষগুলোর ক্ষেত্রে আর কার্যকরী হয় না। এর ফলাফল হিসেবে উদ্ভিদের ঐ অংশে টিউমার সৃষ্টি হয় যা আমরা

ক্রাউন গল হিসেবে জানি। এত সব অসুবিধা থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে টিউমার কোষ উপকারী বিশেষ করে টিস্যু কালচার করতে। টিস্যু কালচার বলতে সাধারণত উদ্ভিদের কোন একটি অংশ (এক্সপ্ল্যান্ট) নিয়ে উপযুক্ত পরিবেশ এবং বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহের মাধ্যমে ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ উদ্ভিদ বানানোকে বুঝানো হয়। এর একটি উল্লেখযোগ্য ধাপ হচ্ছে ক্যালাস (অবিচ্ছিন্ন টিস্যুমণ্ড) তৈরি করা। সাধারণত উদ্ভিদের মেরিস্টেম টিস্যু ব্যাতীত অন্য এক্সপ্ল্যান্ট থেকে ক্যালাস তৈরির জন্য আবাদ মাধ্যমে নির্দিষ্ট মাত্রায় উদ্ভিদ হরমোন অক্সিন এবং সাইটোকাইনিন প্রদান করতে হয়। কারণ এই দুটি হরমোন উদ্ভিদের প্রধান দুটি বৃদ্ধিকারক হরমোন এবং এগুলো মেরিস্টেম টিস্যুতেই তৈরি হয়। কিন্তু টিউমার কোষ থেকে ক্যালাস তৈরির জন্য আবাদ মাধ্যমে অক্সিন ও সাইটোকাইনিন যোগ করতে হয় না কারণ টিউমার কোষ নিজেরার এ দুটি হরমোন তৈরি করতে পারে। তাছাড়াও সাধারণ কো-ধের থেকে টিউমার কোষ থেকে কম সময়ের মধ্যে ক্যালাস পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন থাকতে পারে যে টিউমার কোষ থেকে ক্যালাস তৈরি করে সেখান থেকে উদ্ভিদ বানানো কতটা যুক্তিযুক্ত এবং এটা ক্ষতিকর কিনা?

এর উত্তর হচ্ছে যে এই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কারণ টিউমার কোষ যখন উদ্ভিদ থেকে আলাদা করা হয় তখন তার টিউমার তৈরির বৈশিষ্ট্য আর থাকে না আর উদ্ভিদে টিউমার তৈরি শুরু করার জন্য একটা পরোক্ষ মাধ্যম লাগে যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক বা কোনো কীটপতঙ্গ।

এছাড়াও কিছু ফ্রেপ্ক বিজ্ঞানীদের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে টিউমার কোষ কিছু নোভেল এমিনো এসিড তৈরি করতে পারে যা সাধারণত উদ্ভিদ দেহে তৈরি হয় না। এই ধরণের এমিনো এসিডের মধ্যে অন্যতম হল- দুটি প্রধান ওপাইন (Opine):

১. অক্টোপাইন (Octopine)

২. নোপালাইন (Nopaline)

টিউমার কোষ সাধারণত এই বৈশিষ্ট্যগুলো পেয়ে থাকে আক্রমণকৃত ব্যাকটেরিয়ার প্লাসমিড থেকে।

বার্ল

বার্ল হচ্ছে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে কান্ডে স্ফীত অংশ যা টিস্যু দ্বারা গঠিত। এটাকে ক্যালাস টিস্যু বলা হয়। এটি গোলাকার, প্যাঁচানো, ভাঁজকৃত হতে পারে। সাধারণত উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ক্ষত যেমন- রোগ, কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রমণ, উদ্ভিদের ছাঁ-টাই করা অংশে বার্ল তৈরি করে। উদ্ভিদের কুঁড়ি থেকে বার্ল তৈরি হয়।



চিত্র ৪৩.২: উদ্ভিদে তৈরি হওয়া বার্ল। সূত্র: Organic Plant Care LLC

এটিকে মানুষের নন-ম্যালিগ্ন্যান্ট টিউমার এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। (বলে রাখা প্রয়োজন যে নন- ম্যালিগ্ন্যান্ট টিউমার এর কারনে মানুষের মৃত্যু হয় না)। কারণ এই টিউমার উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর নয়।

বার্ল এ উদ্ভিদের একই জেনেটিক উপাদান থাকে অর্থাৎ একই জিনগত বৈশিষ্ট্য বহন করে। বার্ল উদ্ভিদের ক্ষত এর বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া টিস্যু। ঐসব স্থানে উদ্ভিদকে সুরক্ষা দেবার জন্যই বার্লের তৈরি হয়। তবে উদ্ভিদের বার্ল কেটে ফেললে সেখানে আবার রোগ সৃষ্টি হতে পারে বা ঐ স্থান আবার আক্রমণ হবার সম্ভাবনা থাকে; সর্বোপরি উদ্ভিদের ক্ষতি হতে পারে।

উদাহরণঃ যেকোনো বৃক্ষ জাতীয় গাছ গুলোর যে অংশ কেটে নেওয়া হয় সেসব স্থানে বার্ল দেখা যেতে পারে। একটি কেটে ফেলা বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের বার্ল থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, গাছে সরাসরি ক্যান্সার না হলেও টিউমার তৈরি হয়। সেটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপকারীও হতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টিউমার হলে গাছের মৃত্যু হয় না।

তথ্যসূত্র

- ⊗ Robert P. Scheffer. The Nature of Disease in Plants.
- ♦ What is a Burl? Organic Plant Care LLC.
- ♦ Plant galls The Morton Arboretum.
- De Cleene, M., De Ley, J. The host range of crown gall. Bot. Rev 42, 389-466 (1976). DOI: 10.1007/BF02860827.



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

§ 88



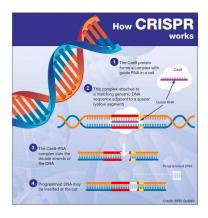
একটুখানি ক্রিসপার

অনিৰ্বাণ মৈত্ৰ

[জেনিফার ডাউডনা ২০২০ সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেলজয়ী প্রাণরাসায়নিক। আলোচ্য ক্রিসপার প্রযুক্তির তিনি একজন সহ-উদ্ভাবক। এই অত্যাধুনিক প্র-যুক্তি উদ্ভাবনের জন্যে তিনি এবং ইম্যানুয়েল শারপ্যান্টিয়ে যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। 'A Crack in Creation: Gene Editing and The Unthinkable Power to Control Evolution' নামক বইয়ের সহ-রচয়িতা তিনি, যেখানে তিনি তার এই আবিষ্কারের যাত্রার পাশাপাশি মানুষকে ক্রিসপারের ব্যাপারে দিয়েছেন কিছু সতর্কবার্তাও। ক্রিসপার সম্বন্ধে ২০১৫ সালে করা তার টেড-টক বিজ্ঞান ব্লগের পাঠকদের জন্যে বাংলায় অনুবাদ করা হলো।

মি জেনিফার ডাউডনা। পেশায় একজন গবেষক — কাজ করি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়াতে। কয়েক বছর আগে আমি এবং আমার সহকর্মী ইম্যানুয়েল শারপ্যান্টিয়ে একসাথে জিনোম সম্পাদনার একটি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করি। এর নাম ক্রিস্পার-ক্যাস নাইন। আপনারা জেনে খুশি হবেন ক্রিসপার ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা কোষের ডিএনএ'তে নিখুঁত পরিবর্তন করতে পারেন। আমাদের বিশ্বাস এই প্রযুক্তি আমাদেরকে-বহুকাল-ধরে-ভোগানো অনেক সমস্যার সমাধান দিতে পারবে। এই লেখায় আমি ক্রিসপার আসলে কী,এর ক্ষমতা কতদূর,এই প্রযুক্তি নিয়ে আমাদের ভাবনা কী এবং সবচেয়ে গুরু-ত্বপূর্ণ,এর ভবিষ্যত কী — তা নিয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

আপনারা জেনে অবাক হবেন ক্রিসপার আবিষ্কারের ঘটনা মোটেই খুব পরিকল্পিত কিছু ছিলো না,খুব সাধারণ একটা গবেষণা থেকে এর চিন্তাটা আমরা পাই। জীববিজ্ঞানের গবেষণায় বিভিন্ন জীব,অণুজীবের জিন নিয়ে নাড়াচাড়া করা খুব সাধারণ ব্যাপার। আমরাও সেরকম একটা গবেষণাই করছিলাম,আমাদের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিলো ব্যাকটেরিয়া কীভাবে ভাইরাস-আক্রমণ প্রতিরোধ করে,সেটা মোটামুটি জিনতাত্ত্বিক স্তরে পর্যবেক্ষণ করা। আপনারা জানেন ব্যাকটেরিয়া আমাদের দেহে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে থাকে,যেমন লেপ্রোসি,নিউমোনিয়া ইত্যাদি। 'চোরের ওপর বাটপারি' করার জন্য ব্যাকটেরিয়ারও একটা জাতশক্র আছে,তার নাম ভাইরাস। ব্যাকটেরিয়াকে তার পরিবেশে টিকে থাকতে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ব্যাকটেরিওফেজ বা ফেজ ভাইরাসের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। একটা ফেজ ভাইরাস যখন ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে,তখন প্রথমে সে ঐ ব্যাকটেরিয়ার দেহে ইঞ্জেকশনের মতো করে নিজের জেনেটিক বস্তু(ডিএনএ বা আরএনএ)প্রবেশ করিয়ে দেয়। এই জেনেটিক বস্তুই ব্যাকটেরিয়ার দেহে নানারকম ক্ষতি করে থাকে। আক্রমণটাকে মোটামুটি একটা টাইম বোমার সাথে তুলনা করা যায়-ব্যাকটেরিয়ার হাতে অল্প কিছু সময় থাকে বোমাটাকে নিদ্ধিয় করতে,নতুবা বোমাটা ফেটে যাবে এবং ব্যাকটেরিয়াটা মারা পড়বে। বিবর্তনের পথ-পরিক্রমায় বহু ব্যাকটেরিয়া তাদের দেহে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে একরকম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে,যার নাম ক্রিসপার।



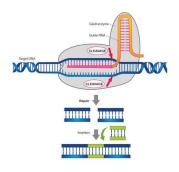
চিত্র 88.১: ক্রিসপারের কর্মপদ্ধতি। ছবিসূত্র: cambridge.org

ক্রিসপার (CRISPR) আসলে একটা শব্দসংক্ষেপ, এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats। এর বাংলা করা যেতে পারে 'নিয়মিত ব্যবধানযুক্ত গুচ্ছবদ্ধ ক্ষুদ্র প্যালিনড্রোমিক পুনরাবৃত্তি'। এটা আসলে কী একটু ভেঙে বলি। বিজ্ঞানীরা অনেক আগে থেকেই ব্যাকটেরিয়ার জিনোম বিশ্লেষণ করে

একটা বিষয় লক্ষ্য করেছিলেন যে জিনোমের একটা অংশ জুড়ে রয়েছে কিছু প্যালিনড্রোমিক সিকুয়েন্স, অর্থাৎ A, T, C, G দিয়ে লিখিত এমন কিছু জেনেটিক কোড — যা বাম থেকে ডানে পড়লে যা হবে, বাম থেকে ডানে পড়লেও তা-ই হবে। দেখা গেলো, বেশ বড়ো অংশ জুড়ে এরকম প্যালিনড্রোমিক সিকুয়েন্স, এরপর কিছু এলোমেলো সিকুয়েন্স, আবার একটা প্যালিনড্রোমিক সিকুয়েন্স-এটা আবার পূর্বেরটা থেকে ভিন্ন। বিজ্ঞানীদের বিশ্বয়ের সীমা রইলো না, যখন তারা এই প্যালিনড্রোমিক সিকুয়েন্সগুলির সাথে ফেজ ভাইরাসের বিশেষ কিছু জেনেটিক সিকুয়েন্সের মিল খুঁজে পেলেন!

আসল ব্যাপারটা বলি আপনাদের, ধরুন, একটা ব্যাকটেরিয়া একটা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে — ব্যাকটেরিয়াটা জখম হয়েছে বেশ, কিন্তু মারা যায় নি। আঘাত সামলে নিয়ে সে ঐ ভাইরাসের ফেলে যাওয়া অস্ত্র, অর্থাৎ তার জেনেটিক বস্তু-ধরা যাক ডিএনএ থেকে কিছু অংশ আলাদা করে নিজের ডিএনএ'র একটা বিশেষ জায়গায় রেখে দেয়। শুধু রাখেই না, বংশগতীয় প্রক্রিয়ায় এই অংশগুলো পরের প্রজন্মেও স্থানান্তর করে। এই যে বিশেষ জায়গাগুলোতে ঐ ভাইরাসের ডিএনএ'র খণ্ডবিশেষ রাখা হলো, ঐ জায়গাটাকেই বলা হয় ক্রিসপার জেনেটিক্সের পরিভাষায় বলা ভালো ক্রিসপার সাইট বা ক্রিসপার লোকাস। এই ক্রিসপার কিন্তু অনেকটা রেকর্ডখাতার মতো, যেখানকার প্যালিনড্রোমিক সিকুয়েসগুলো দেখে বলে দেওয়া যায় এই-এই ভাইরাসের সাথে এই প্রজাতির ব্যাকটেরিয়াটার পারিবারিক শত্রুতা আছে, এদের মধ্যে মাঝেমাঝেই 'গণ্ডগোল' হয়। এই রেকর্ডখাতা আবার ব্যাকটেরিয়া তার সন্তানকে দিয়েও যাচেছ, যাতে করে তারাও পুরোনো শত্রুকে চিনে রাখতে পারে। এবারে হচ্ছে আসল মজা, শুধু কি রেকর্ড রাখলেই শত্রুকে ধ্বংস করতে হবে না? ব্যাকটেরিয়া এরপর ঐ সংরক্ষিত ডিএনএ থেকে একটা অনুষঙ্গী 'গাইড' আরএনএ তৈরি করে রাখে, যার সাথে ভাইরাসের ডিএনএ সিকুয়েন্স মিলে যায়। অনেকটা ছবি তুলে রাখার মতো ব্যাপার আর কি! এই আরএনএ খণ্ডটাই ব্যাকটেরিয়াকে সাহায্য করে ঐ ভাইরাস আবার আক্রমণ করলে, তাকে বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

চিনে প্রতিহত করতে (এইজন্যে এর নাম 'গাইড')। প্রতিহত করার কাজে আরএনএ'টা একটি বিশেষ প্রোটিন — ক্যাস নাইনের সাথে যুক্ত হয়। ক্যাস নাইন-গাইড আরএনএ একসাথে পুরো কোষজুড়ে টহল দিতে থাকে, পরবর্তীতে যখনই একইরকম কোনো ভাইরাস(মানে একই জেনেটিক সিকুয়েঙ্গ!) আক্রমণ করে - তখনি ঐ যুগলবন্দী ভাইরাসটিকে চিনে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ভাইরাসের ডিএনএ'র ঐ মিলে যাওয়া অংশটুকু ক্যাঁচ করে কেটে দেয়! ভাইরাস তখন আর কোনো ক্ষতি করতে পারে না।



চিত্র 88.২: ক্রিসপারের ডিএনএ কর্তনের আণবিক প্রক্রিয়া। ছবিসূত্র: labiotech.eu

ক্যাস নাইন-আরএনএ'র এই যুগলবন্দীকে (বলে রাখি, এই যে যুগলবন্দীর কথা বলছি, এটিকেই পুনঃপ্রকৌশল করে আমরা সাধারণভাবে ক্রিসপার প্রযুক্তি বলতে শুরু করেছি) মোটামুটি একটা আণবিক কাঁচির সাথে তুলনা করা যায়, যেটা কি না গাইড আরএনএ'র সাথে মিলিয়ে অন্য ডিএনএ'র উপযুক্ত স্থানে কেটে দিতে পারে। ডিএনএ যেহেতু দ্বিসূত্রক, তাই দুই সুতাই একসাথে কাটা পড়ে। ক্রিসপার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি যুগলবন্দীর গাইড আরএনএ'টাকে আমরা ইচ্ছেমতো বদলে দিতে পারি, অর্থাৎ এই পুরো ব্যাপারটা, কম্পিউটারের ভাষায় বললে, 'প্রোগ্রামেবল'। তার মানে এই আরএনএ, যা কি না ক্যাস প্রোটিনকে চিনিয়ে দিচ্ছে কোথায় কাটতে হবে, সেটি বদল করে আমরা যেকোনো ডিএনএ সিকুয়েসই সম্পাদনা করতে

পারবো — আর সেটাও কেবল আদিকোষী ব্যাকটেরিয়াতে নয়, সবরকম কোষেই ডিএনএ'তে নিখুঁত পরিবর্তন করতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাবে। আমরা বিস্মিতই হয়েছিলাম যে, এই 'সরল' পদ্ধতিটার মাধ্যমেই জিনপ্রযুক্তির জগতে বেশ বড়সড় বিপ্লব আনা সম্ভব!

আণবিক কোষবিজ্ঞান থেকে আমরা জানি, ডিএনএ'র কোনো অংশ ভেঙে গেলে বা কোথাও ছেদ পড়লে, কোষ নিজে থেকেই তা খুঁজে বের করে জোড়া লাগাতে চেষ্টা করে। এই জোড়া লাগানোটা হতে পারে নতুন কোনো ডিএনএ খণ্ড এনে ঐ ছেদপ্রাপ্ত জায়গায় বসিয়ে অথবা কিছু প্রোটিন দিয়ে আঠা লাগানোর মতো করে ডিএনএ জোড়া দিয়ে — এরকম বিভিন্ন আণবিক প্রক্রিয়া কোষ নিজে থেকেই করে থাকে। এই ব্যাপারটাই ক্রিসপার ব্যবহারে আমাদের আশার আলো দেখাচ্ছে। আগেই বলেছি ক্রিসপার প্রযুক্তিটা 'প্রোগ্রামেবল'। পৃথিবীতে এখনো এমন অনেক রোগ আছে, যাদের কারণ বিরাট ডিএনএর সামান্য একটি কি দুটি অক্ষরের হেরফের(এই হেরফেরকে বলে মিউটেশন), যেমন হান্টিংটন ডিজিজ, সিসটিক ফাইব্রোসিস কিংবা সিকল সেল এনিমিয়া। আমরা যদি ক্যাস প্রোটিন-গাইড আরএনএ' যুগলটাকে এমনভাবে তৈরি করতে পারি, যা কি না ডিএনএর বিশেষ কিছু সিকুয়েন্সে, ধরা যাক এনিমিয়া কিংবা সিসটিক ফাইব্রোসিসের মতো রোগ যেসব মিউটেশনের কারণে হয়, সেইসব মিউট্যান্ট সিকুয়েঙ্গগুলোতে কাঁচি চালাতে পারে, তাহলে আমরা ঐ কোষটাকে ক্ষতিকর মিউটেশন মুক্ত করতে পারবো এবং ঐ অংশটুকু নতুন করে তৈরি করতে কোষকে প্রণোদিত করতে পারবো। অর্থাৎ, আমরা এতোদিন যেসব রোগের নিশ্চিত পরিণতি মৃত্যু বলে জেনে এসেছিলাম, ক্রিসপারের মাধ্যমে সেগুলো নিরাময় করার বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে! আপনারা জেনে খুশি হবেন, ২০১৫তেই বিজ্ঞানীরা ক্রিসপার ব্যবহার করে এইচআইভি ভাইরাস আক্রান্ত কোষকে আবার সুস্থ করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের আশা ক্রিসপার থেরাপি ব্যবহার করে এইচআইভির মতো অন্যান্য রেট্রোভাইরাস, বিশেষত হার্পিসের মতো যেসব ভাইরাস আমাদের ডিএনএ' ব্যবহার করেই আত্মগোপন থাকে — আর কয়েক বছরের মধ্যেই হয়তো তাদের চিরতরে পরাস্ত করা সম্ভব বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

হবে!



চিত্র 88.৩: ক্রিসপার ব্যবহৃত হতে পারে মারণঘাতি জেনেটিক রোগ নিরাময়ে। ছবিসূত্র: technologynetworks.com

ওপরে যে কোষের ডিএনএ জোড়া লাগানোর কথা বললাম, অনেক সময় এই জোড়া লাগানোর প্রক্রিয়াতেও ভুল হতে পারে এবং এই ভুল হওয়ার কারণে কোনো বিশেষ জিন, যেটা হয়তো কোনো অনাকাঞ্চিত প্রোটিন তৈরি করছে, সেই জিনটি নিজ্রিয় হয়ে যেতে পারে। ক্রিসপার ব্যবহার করে সচেতনভাবেই সেটা করা যায়। আর যদি তা না করে আমরা চাই, একটা খারাপ জিন পুরোপুরি অপসারণ করে সেখানে সঠিক জিন পুনঃস্থাপন করা দরকার — সে কাজেও ক্রিসপার সহায়তা করতে পারে।বিশেষ প্রক্রিয়ায় ক্যাস প্রোটিনের কাটাকুটির ক্ষমতাটাকে নিজ্রিয় করে দেওয়া যায়(বৈজ্ঞানিক ভাষায় বললে প্রোটিনটার 'অ্যাঞ্জিভ সাইট ডোমেইন'কে নিজ্রিয় করে দেওয়া যায়) এবং এই অবস্থায় ক্যাস প্রোটিন আর ডিএনএ কাটতে পারে না, এর মাধ্যমে তখন আমরা সঠিক ডিএনএ খণ্ডের একটা ছাঁচ তৈরি করে পূর্বের ছেদপ্রাপ্ত এলাকায় পাঠাতে পারি। কোষের "কাঠমিস্ত্রি" প্রোটিনগুলো তখন সেই ছাঁচ দেখে ঠিক ঠিকভাবে ডিএনএ জোড়া লাগায়!

আপনাদের মনে হতে পারে, জিনোম-প্রকৌশলে ক্রিসপারই বুঝি একমাত্র প্রযুক্তি। আদতে তা নয়, বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে সেই ১৯৭০ সন বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র 88.8: নোবেলজয়ী দুই বিজ্ঞানী — শারপ্যান্টিয়ে এবং ডাউডনা। ছবিসূত্র: pharmaceuticalintelligence.com

থেকেই কাজ করছেন। এর মধ্যে আমরা জিনোম সিকুয়েসিং এর প্রযুক্তি পেয়েছি, ডিএনএ'র কপি তৈরি করার পিসিআর মেশিন পেয়েছি এবং সেই সাথে উদ্ভাবিত হয়েছে ডিএনএ সম্পাদনার বিভিন্ন প্রযুক্তিও। ক্রিসপার আসার আগে বিজ্ঞানীরা জিল্ক ফিঙ্গার নিউক্লিয়েজ, ট্যালেন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিএনএ সম্পাদনার কাজ করতে পারতেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে সেগুলো এখনও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সমস্যা যেটা ছিলো — হয় এই প্রযুক্তিগুলোর নিপুণতার মাত্রা ছিলো অপেক্ষাকৃত কম, অথবা এগুলো ব্যবহার করতে বেগ পেতে হতো বেশ খানিকটা। সেদিক দিয়ে ক্রিসপারের গঠন এবং এর ব্যবহারশৈলী বেশ সহজ। এর আগের প্রযুক্তিগুলোকে যদি খসখসে কাগুজে ম্যাপের সাথে তুলনা করি, তাহলে ক্রিসপার হবে এখনকার জিপিএস সিস্টেম!

সারাবিশ্বে এর মধ্যেই ক্রিসপার নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে এবং হচ্ছেও। মানবদেহে ক্রিসপার কিভাবে কাজ করে, তা বোঝার জন্য অন্যান্য জীববৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মতো সরাসরি মানুষের ওপর প্রয়োগ না করে আগে ইঁদুর বা বানর, এরকম নমুনা প্রাণীতে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই পরীক্ষাগুলির মাধ্যমে ডিএনএ'র সামান্য পরিবর্তন কিভাবে অন্যান্য টিস্যু, অন্যান্য বৈশিষ্ট্য তথা পুরো জীবটাকেই প্রভাবিত করতে পারে — সে বিষয়গুলো বুঝতে দারুণভাবে সহায়তা করছে।

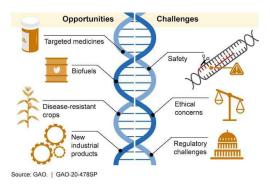
যেমন একটা গবেষণায় আমরা একদল ইঁদুরের গায়ের কালো রঙের জন্য দায়ী জিনটিকে পাল্টে দিয়েছিলাম। জীবদ্দশায় ইঁদুরগুলোর বিশেষ পরিবর্তন হয় নি, তবে তারা যে বাচ্চাকাচ্চার জন্ম দিয়েছে তাদের অধিকাংশের গায়ের রঙই আর কালো থাকে নি, যদিও তারা স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরাসহ অন্যান্য কাজ করেছে। বাচ্চা ইঁদুরগুলোর জিনোম সিকুয়েন্স করে আমরা দেখেছি, ক্রিসপার ঠিক সেই জিনটাকেই বদল করেছে, যেটা আমরা চেয়েছি। এছাড়া বানরের ওপর করা বিভিন্ন পরীক্ষা আমাদের ক্রিসপার বিভিন্ন টিস্যুতে কীভাবে ঠিকঠাক পৌছাতে পারে, কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় কি না, ডিএনএ মেরামত প্রক্রিয়া কীভাবে আরো ক্রটিহীন করা যায় — এই বিষয়গুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে আরো উন্নতির দিকে যেতে সহায়তা করেছে। আবিষ্কারের পর আমাদের ধারণা ছিলো মোটামুটি দশ বছরের মধ্যেই আমরা এর 'ক্লিনিকাল অ্যাপ্লিকেশনে' যেতে পারবো, অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্কদের ওপরে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যবিভাগ ২০১৬র জুনে সর্বপ্রথম ক্যান্সার চিকিৎসায় এই প্রযুক্তি ব্যবহারের অনুমোদন দেয়। এর কয়মাস যেতে না যেতেই চীন থেকে ঘোষণা আসে তারা ফুসফুসের ক্যান্সারে ক্রিসপার প্রযুক্তি দিয়ে বিশেষায়িত প্রতিরক্ষা কোষ ব্যবহার শুরু করেছে। ক্রিসপারের এরূপ উত্তরোত্তর সাফল্য বৃদ্ধিতে বড় বড় স্টার্ট-আপ করপোরেশন এবং ধন-কুবেররা ইতোমধ্যেই এর বাণিজ্যিকরণের ব্যাপারে বেশ আগ্রহ দেখিয়েছেন!



চিত্র ৪৪.৫: টেডের মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন জেনিফার ডাউডনা। ছবিসূত্র: $\operatorname{ted.com}$

ক্রিসপার দিয়ে যে মানব ইতিহাসে আগে যা কখনো ঘটেনি, সেরকম অসাধারণ কিছু করা সম্ভব আশা করি এতোক্ষণ আপনাদের তা বোঝাতে পেরেছি। এবার মুদ্রার উল্টো পিঠের গল্প। আমরা, বিজ্ঞানীরাও সবার মতোনই মানুষ; সমাজ-সভ্যতা-নৈতিকতার কাছে আমরাও আপনাদের মতোনই দায়বদ্ধ। আমরা এমন কিছু করতে বা করতে সমর্থন দিতে পারি না, যা বিশ্বমানবতার ক্ষতি, অসাম্য কিংবা অধোগামীতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইতোপূর্বে বিজ্ঞানের অসাধারণ কিছু আবিষ্কার মানুষের হাতে পড়ে খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রিসপারের ভবিষ্যতচিন্তায় আমাদের বিবেচনা করতে হবে ক্রিসপারেরও 'অন্যরকম' ব্যবহার হতে পারে। এই প্রযুক্তির যে অসীম ক্ষমতার কথা আমরা জেনেছি, তাতে হয়তো পরে ক্রিসপার দিয়ে আমরা এমন মানুষ তৈরি করতে চেষ্টা করবো, যাদের হাড় স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়, যাদের রোগ-সংবেদনশীলতা কম কিংবা তাদের চোখের রং পেশির গড়ন, উচ্চতা অন্যদের চেয়ে আলাদা। অর্থাৎ আমরা যেসব বৈশিষ্ট্যকে আকর্ষণীয় বলে বিবেচনা করি, আমরা চাইবো সেগুলোর সমন্বয়ে নতুন প্রজন্ম তৈরি করতে। আপনারা হয়তো সায়েন্স ফিকশনে এমন দেখে থাকবেন যে ভবিষ্যত পৃথিবীতে এলিটরা টাকার বিনিময়ে তাদের সন্তানদের অধিকতর বুদ্ধিমান, সুদর্শন করিয়ে নিচ্ছেন। 'ডিজাইনার বেবি' বলা হয় এদেরকে। আজকে পর্যন্ত এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর জিনগত কার্যকারণ অনেকাংশেই আমাদের অজানা। তার মানে এই নয় যে, আমরা তা কখনো জানবো না। তাৎপর্যপূর্ণ এটাই, আমাদের কাছে এমন একটা উপকরণ আছে - যা সত্যিই এরকম পরিবর্তনের কাজে ব্যবহৃত হতে পারি, জিনগত তথ্য আমরা যখনই বের করি না কেনো। 'ডিজাইনার বেবি' পর্যন্ত আমরা যেতে পারি নি এখনো; কিন্তু এটা আর সায়েন্স ফিকশন নয়, নিকট ভবিষ্যত। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে আমরা কি ক্রিসপারের মাধ্যমে বিশ্বকে নতুন এক অসাম্য, নতুন এক বিভেদের দিকে ঠেলে দিচ্ছি না?

এখানেই নৈতিকতার ব্যাপারটা চলে আসে, যেটা কোনো মতেই উপে-ক্ষণীয় নয়। আমি এবং আমার সহকর্মীরা এখনি মানবজ্ঞণে ক্রিসপার



চিত্র ৪৪.৬: ক্রিসপারের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা। ছবিসূত্র: medium.com

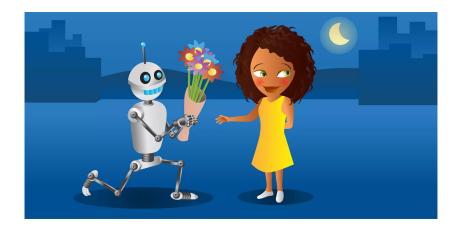
ব্যবহার না করবার ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীদের আহ্বান জানিয়ে আসছি, যাতে করে আরো আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা এর নিরাপত্তা এবং নৈতিক-সীমাবদ্ধতাগুলোর সুরাহা করতে পারি। বস্তুত ক্রিসপার আমাদেরকে মানব-বিবর্তনের এক তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে এনে দাঁড় করিয়েছে। একদিকে রয়েছে মিউটেশন, বৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রাণবিকাশের বিগত চার বিলিয়ন বছরে যাদের যুগপৎ ক্রিয়ায় পৃথিবী ভরে উঠেছে নানা জীববৈচিত্র্যে। অন্যদিকে আছে আফ্রিকার মরুদ্যান থেকে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে-পড়া বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে-উন্নত-এপ প্রজাতি, হোমো স্যাপিয়েন্স, যাদের হাতে আছে এমন এক প্রযুক্তি যা দিয়ে তারা নিজেরাই হয়ে উঠতে পারে নিজেদের বৈচিত্র্য এবং নির্বাচনের নিয়ন্ত্রক — ছাড়িয়ে যেতে পারে চেনা ছকে বিবর্তনের সমস্ত গতিপ্রকৃতি ও শক্তিমত্তা! তারা তা পারবে কী না, সে প্রশ্ন এখন আর প্রাসন্ধিক নয় — প্রাসন্ধিক হলো তারা তা করবে কি না! তাদের দায়িত্ববোধ, মানবিক-তা আর গুভবুদ্ধির ওপরেই যে ভর করে আছে গোটা পৃথিবীর ভবিষ্যত!

তথ্যসূত্র

- ৡ মূল বক্তব্য: How CRISPR lets us edit our DNA
 Jennifer Doudna. TED, Youtube.
- ৡ ক্রিস্পার দিয়ে জিন এডিটিং কী কেন কীভাবে? এটাই
 সায়েয়, Youtube.
- ♦ Genetic Engineering Will Change Everything Forever- CRISPR. Kurzgesagt In a Nutshell, Youtube.
- ♦ What is CRISPR-Cas9? yourgenome.org.



§ 8¢



মন্তিষ্ক যখন প্রেমের নাটের গুরু

মিঠুন পাল

মে পড়লে এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়। ব্যক্তি অন্য জগতে বিচরণ করতে থাকে। প্রেমে পড়লে ব্যাপারটা যতখানি না হৃদয়কেন্দ্রিক তার চেয়ে বেশি নির্ভরশীল মস্তিষ্কের কারসাজির উপরে। খাঁটি বাংলায় বলতে গেলে, প্রেমের ক্ষেত্রে নাটের গুরু হচ্ছে মস্তিষ্ক।

একজন প্রেমিকের (বা প্রেমিকার) মস্তিষ্ক

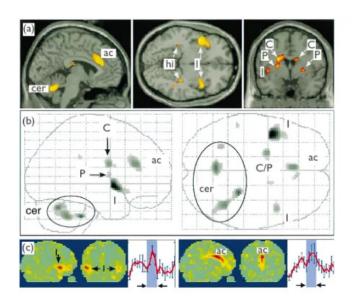
যখন কেউ প্রেমে পড়ে তখন দেহে হরমোন বা ভালো রকমের রাসায়নিক নিঃসরণের প্লাবন ঘটে। তাইতো প্রেমে পড়লে হদপিন্ডে স্পন্দন বেড়ে যায় মানে যাকে হৃদয়ের ধুকপুকানি বলে আর কি।

দুটো মানুষ একে অন্যের যখন প্রেমে পড়ে তখন তাদের শরী-রে ডোপামিন (dopamine), এড্রেনালিন (adrenalin), নোরেপিনেফ্রিন (norepinephrine) নামক হরমোনের নিঃসরণ বেড়ে যায়।

ডোপামিন হরমোন সুখানুভূতির উত্তেজনা সৃষ্টি করে, এড্রেনালিন এবং নোরেপিনেফ্রিন যৌথ প্রযোজনায় হৃদপিন্ডে স্পন্দন (heart bit) বাড়িয়ে দেয়। আর এই সামগ্রিক অবস্থা মিলিয়ে ব্যক্তি ভালবাসার দারুণ অনুভূতির আকাশে ভাসতে থাকে।

মস্তিষ্কের একেকটি অংশ একেক রকম কাজে নিয়োজিত থাকে। প্রেমে পড়লে মস্তিষ্কের কোন অংশ ভূমিকা রাখে- তা জানার আগ্রহ স্বাভাবিক। একদল বিজ্ঞানী এই আগ্রহকে পুঁজি করে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত করেন।

তারা ২১-৩৭ বছর বয়সী প্রায় ১৭ জন স্বেচ্ছাসেবক নারী-পুরুষ বাছাই করেন। এই অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই জানায়- তারা সত্যিকার গভীর প্রেমের সাগরে নিমজ্জিত এবং তাদের সঙ্গীকে পাগলের মতো ভালবাসে। গবেষক দল তাদের উপর যে পরীক্ষা চালান তা ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং (MRI) যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করেন। পরীক্ষা ছিল এরকম-



চিত্র ৪৫.১: মস্তিষ্কের যেসব অংশ সক্রিয় হয়ে উঠে ভালবাসার মানুষের ছবি দেখলে।

প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবককে তাদের ভালবাসার সঙ্গীর ছবি দেয়া হয়। বলা হয়, একদৃষ্টিতে ছবির দিকে তাকিয়ে থাকার জন্য। তাদের তাকিয়ে থাকার সময়কাল স্ক্যানে দেখলে দেখা যায় যে, ঠিক ওইসময় সবার মন্তিষ্কের কিছু নির্দিষ্ট অংশ উদ্দীপিত হয়ে উঠে। সেই অংশগুলো হল-হিপ্পোকাম্পাস (hippocampus), মেডিয়াল ইনসুলা (medial insula), এন্টেরিয়র সিংগুলেট কর্টেক্স (anterior cingulate cortex) এবং ডর্সাল স্টেইটামের (dorsal straitum) এর কিছু অংশ। একি সাথে গবেষকরা এটাও লক্ষ্য করেন যে, মন্তিষ্কের উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ সে সময় নিদ্ধিয় থাকে। সেগুলো হলো- ডান প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স (right pre-frontal cortex), দ্বি-খন্ডীয় পেরিয়েটাল কর্টেক্স (bilateral parietal cortex) এবং টেম্পোরাল কর্টেক্স (temporal cortex)। মন্তিষ্কের ডর্সাল স্টেইটাম অংশ ভালবাসার মানুষের প্রতি প্রবল আগ্রহ বা একধরনের পজিটিভ শক্তি সঞ্চার করে- আশেপাশের অন্যান্য মানুষের

চেয়ে বেশি।

ঠিক এইজন্য প্রবাদ আছে- 'প্রেম অন্ধ'! প্রেমে পড়লে একমাত্র সেই ভালবাসার মানুষটিই মুখ্য হয়ে উঠে, আপন মনে হয়, ভালো লাগে সবচেয়ে বেশি। বাকি অন্যান্য সবার আবেদন তুচ্ছ হয়ে যায় ব্যক্তির কাছে। প্রেমের প্রথম দিকে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তাকে সবার আগে প্রাধান্য দিয়ে আগলে রাখতে চায়। আর এই আগলে রাখার প্রবণতা কখনোবা তাকে অত্যাধিক অধিকার খাটাতে প্রভাবিত করে। প্রভুত্ব বা নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায় ভালবাসার মানুষের সকল কাজে। ভুল বুঝবেন না, এসব স্বাভাবিক। এইসব হয়ে থাকে কম পরিমাণে নিঃসৃত হওয়া সেরোটোনিন (serotonin) হরমোনের অভাবে। এই হরমোন কমে যাওয়ার ফলে ব্যক্তি ক্ষুধার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, জাগতিক সবকিছু থেকে আগ্রহ নিবৃত্ত হতে থাকে। ডোপামিন হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে গেলে সেরোটোনিন হরমোনের ক্ষরণ কমে যায়।

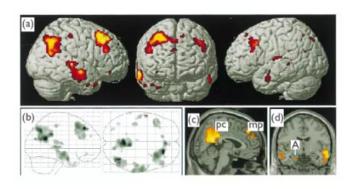
উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাক-

ধরুন, আপনি একজনকে প্রচন্ড ভালবাসেন। তার সঙ্গলাভে অন্য রকম তৃপ্তি অনুভব করেন। এসময় আসলে, আপনার শরীরে ডোপামিন হরমোন বেশি নিঃসৃত হয়। প্রেম চলাকালীন সময়ে আপনার দূরে কোথাও ভালো চাকুরীর অফার আসলো বা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ থেকে বৃত্তির খবর আসলো। আপনার শরীরে সেরোটোনিন হরমোন কমে যাবার কারণে, আপনার কাছে ভাল চাকুরী, বিদেশে উচ্চশিক্ষার বিষয় গৌণ হয়ে যাবে ভালবাসার মানুষের কাছে। আপনার কাছে মুখ্য হয়ে উঠবে তার কাছা-কাছি থাকা। তাকে রেখে বাকি কিছুতেই আপনার আগ্রহ কাজ করবে না।

বলা হয়, প্রেমে পড়লে মানুষ সাহসী হয়ে যায়। দরকার পড়লে বাঘের ডেরায় গিয়ে হানা দিতে পিছপা হয় না। বলতে গেলে, ধরাকে সরা জ্ঞান করে আর কি। এর পিছনেও কিন্তু কারণ আছে।

ভালবাসা চলাকালীন সময়ে মস্তিষ্কের একটি অংশ- যার নাম এমাইগডালা

(amygdala), তা নিজ্ঞিয় হয়ে যায়। মূলত এই অংশ মানুষকে ভয়ের ব্যাপারে সতর্ক করে তোলে বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে, নিজেকে সুরক্ষিত রাখার বার্তা দিয়ে থাকে। যখন এটা নিজ্ঞিয় হয়ে থাকে তখনি প্রেমিক বা প্রেমিকা অপ্রতিরোধ্য মননে বিশ্বাসী হয়ে উঠে।



চিত্র ৪৫.২: মস্তিষ্কের যেসব অংশ নিদ্ধিয় থাকে প্রিয়জনের ছবি দেখার সময়।

ভালবাসার বিভিন্ন পর্যায়

তিনটি ধাপে প্রেমের সময়কে বিভক্ত করা যায়। যথাক্রমে কাম (lust), মোহ (attraction), এবং ঘনিষ্ঠতা (adjustment)। প্রেমে যখন আকাজ্জা জন্মায়, তখন এই আকাজ্জা মস্তিষ্কের স্ট্রেইটাম অংশকে সক্রিয় করে তোলে। এই অংশ স্বয়ংক্রিয় পুরস্কার (automated reward) অনুভূতিকে উদ্দীপিত করে- যা সাধারণত খাবার খাওয়া, পান করা এবং যৌনতাকে (sex) প্রভাবিত করে। কথায় আছে, যৌনতা প্রেমের একটি অংশ (lust is a part of love)।

ভালবাসা এক ধরনের অভ্যাস - যা যৌনাকাজ্ঞা থেকে উদ্ভূত এবং এটা আকাজ্ঞাকে পুরস্কৃত করার অন্যতম মাধ্যম।

🗕 অধ্যাপক জিম ফাউস

মোহ বা আকর্ষণের সময় দেহে রক্ত চলাচল অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে যায় মস্তিষ্কের তৃপ্তি বা আনন্দের উৎসে। আর তাই আমরা অত্যাধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি সঙ্গীর প্রতি।

ঘনিষ্ঠতার ধাপে, ব্যক্তির আচরণে কিছুটা স্লান অভিব্যক্তি দেখা যায়। ধীরে ধীরে শরীর তখন আনন্দ উত্তেজক হরমোনের সাথে মানিয়ে (tolerance) নিতে শুরু করে। দেহে এন্ডোরফিন (endorphin), ভ্যা-সোপেসিন (vasopressin), অক্সিটোসিন (oxytocin) হরমোনের প্লাবন ঘটে থাকে। সবকিছু মিলিয়ে শরীরে একটি সুন্দর বার্তা সঞ্চারিত হতে থাকে আস্থা, নিরাপত্তার। যা সামগ্রিক অর্থে একটি দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের চলার পথ সুগম করে তোলে।

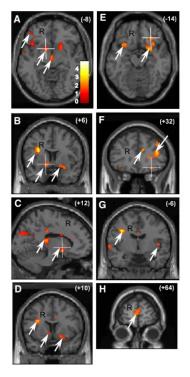
প্রেমে ব্যর্থতায় মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া

'প্রেমের মরা জলে ডোবে না' - আসলেই কি তাই? প্রেমে পড়া যেমন সুখকর অনুভূতি তেমনি প্রেমে ব্যর্থ হওয়া এক অসহ্যকর অনুভূতি। কেউ কেউ তো আত্মহত্যা করতে চায় বিরহে। এমনকি করেও ফেলে, যার উদাহরণ ভূরিভূরি। কিছুদিন আগে যে মানুষটার জন্য হাজার বছর বাঁচার শখ জাগতো, তার প্রস্থানে কেন তবে এত কষ্টের আগমন? হয়তোবা 'প্রস্থানেই দেবো না বিদায়' - এই কাব্যিক গূঢ় কথায় বিশ্বাস রেখে অটল থাকে মানুষ। খানিকটা অস্বাভাবিক মনে হলেও মস্তিষ্কের এইরকম স্থিতি হওয়া ব্যতিক্রম কোন ঘটনা নয়। মস্তিষ্কের যে অংশগুলো সুখের জোয়ারে ভাসতে ভূমিকা রাখে ঠিক একই অংশগুলোই জড়িত থাকে দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খেতে। প্রেমে ব্যর্থ হলে মানুষ যে সমস্ত আচরণ করে তার ব্যাখ্যা খুঁজতে একদল গবেষক একটি পরীক্ষা পরিচালনা করেন। চলুন, সে পরীক্ষাটি ব্যাখ্যা করা যাকঃ-

গবেষণার জন্য কলেজ পড়ুয়া মধ্যম বয়সী ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক যুবক-যুবতী বাছাই করা হয়। ঠিক তাদেরকেই নেয়া হয় যারা কিছুদিন আগেও গভীর প্রেমে আচ্ছন্ন ছিল এবং ইদানীংকালে প্রেমে ব্যর্থ হয়েছে। এই সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া সংরক্ষণ করা হয় একধরণের ম্যাগনেটিক রেজোনেঙ্গ ইমেজিং যন্ত্রে (functinal Magnetic Resonance Imaging বা fMRI)। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রত্যাখ্যাত হবার প্রথমদিক থেকে শুরু করে প্রায় ৬৩ দিন পর্যন্ত তাদের উপর নজর রাখা হয়। বিশ্বয়ের ব্যাপার হলো, তীব্র ভালবাসার মাপকাঠি (Passionate love scale) নামক একটি মানসিক পরীক্ষায় প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীই সর্বোচ্চ ফলাফল করে।এই পরীক্ষায় পরিমাপ করা হয় – ঐকান্তিক ভালবাসার অনুভূতিকে।

প্রত্যকে প্রতিযোগীই জানায়, তারা জেগে থাকার প্রায় ৮৫ শতাংশ সময়ে সেই মানুষের কথাই চিন্তা করতে থাকে যে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের প্রত্যাশা থাকে যে পছন্দের মানুষটিও তাকে নিয়ে ভাবছে, হয়তো ডাক দিয়ে ফের কাছে টানবে এবং তারা আবার একসাথে থাকবে। এরপর, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে তাদের প্রাক্তন ভালবাসার মানুষের ছবি দেখানো হয়। একই সময়ে তাদের একটি সহজ অংক করতে দেয়া হয় বা গণনা করতে বলা হয়। যেমন, প্রত্যেককে বলা একটি সংখ্যাকে নির্দিষ্ট ধরে ক্রমান্বয়ে চার সংখ্যা করে পেছনে গুণতে। ধরুন, সংখ্যাটি বলা হলো ১০০। এরপর গুণতে বলা হয় এভাবে ১০০, ৯৬, ৯২, ৮৮, ৮৪...। এই কাজটি করা হয়- অংশগ্রহণকারীর মস্তিষ্ককে রোমান্টিক অনুভূতি থেকে খানিক বিচ্ছিন্ন করতে। সে চোখে দেখছে ভালবাসার মানুষের ছবি কিন্তু গুণতে হচ্ছে সংখ্যা তাও আবার পেছনের দিক। স্বাভাবিকভাবে মস্তিষ্ক ব্যস্ত হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকার শেষের দিকে, প্রত্যেককে এবার এমন একজন নিরপেক্ষ মানুষের ছবি দেখানো হয় যে পরিচিত। এই যেমন ধরুন, দেখানো হলো বন্ধুর ভাইয়ের ছবি. পাড়ার দোকানদারের ছবি অথবা প্রতিবেশীর ছবি।

এবার ফলাফল জানার পালা। গবেষকরা এই পুরো সময় লক্ষ্য করে দেখেন যে, যখন অংশগ্রহণকারীদের তাদের প্রাক্তন প্রেমিক বা প্রেমিকার বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র ৪৫.৩: প্রেমে প্রত্যাখ্যানে মস্তিষ্কের যেসব অংশ উদ্দীপিত হয়ে থাকে।

ছবি দেখানো হয়- তখন মস্তিষ্কের কিছু নির্দিষ্ট অংশ উদ্দীপিত হয়ে উঠে। কিন্তু পরিচিত মানুষের ছবি দেখানোর সময় সেই অংশগুলো ওই অর্থে সাড়া দেয়নি। মস্তিষ্কের যে অংশগুলো উদ্দীপিত হয়ে উঠেঃ

- ৡ মধ্য-মন্তিয়ের ভেট্রাল টেগমেন্টাল অঞ্চল (ventral tegmental area বা VTA)। যা সাধারণত অনুপ্রেরণা, পুরস্কার এবং রোমান্টিক অনুভূতিতে ভূমিকা রাখে।

এসব ফলাফল বিশ্লেষণ করে, গবেষকগণ একটি সারাংশে উপনীত হন:

''প্রেমময় ভালবাসা এক ধরনের লক্ষ্য সমস্বিত অনুপ্রেরণা বা উৎসাহের অবস্থা। প্রেমে ব্যর্থতা একটি নির্দিষ্ট রকমের আসক্তিতে রুপ নেয়।"

যারা প্রেমে ব্যর্থ হয়, তারা প্রতিনিয়ত নিজের সাথে টিকে থাকার যুদ্ধ করে যায়। মনোদৈহিক সংঘর্ষের এই সময়টায় সে জড়িয়ে যায় বিভিন্ন আসক্তির সাথে। কখনোবা মাদকের প্রতি আবার কখনোবা জীবনের প্রতি বিক্ষুব্ধ বিতৃষ্ণা থেকে আত্মহত্যার প্রতি। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে ভুলে যায় না বরঞ্চ আগের চেয়ে বেশি অনুভব করতে শুরু করে। তার কথা অহর্নিশ ভাবতে থাকে বিধায়, তাকে কাছে না পাওয়ার আক্ষেপ ব্যক্তিকে হতাশার সমুদ্রে নিমজ্জিত করে। গবেষকরা মনে করেন, আমাদের একটি হাত বা পা ভেঙ্গে গেলে আমরা যে কন্ট পাই তার চেয়ে বেশি দুঃখ পাই প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলে। এমনকি অনেক বছর পরেও ভালবাসার মানুষকে হারানোর কন্ট ফিরে ফিরে আসে। একটু ভালোভাবে খেয়াল করলে, এর থেকে সাময়িক সমাধান কিন্তু জাজ্জ্বল্যমান।

- প্রেমে ব্যর্থ হওয়া মানেই সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়া নয়। এটা
 একটা অংশ মাত্র জীবনের।

সর্বোপরি প্রেম, ভালবাসা মানসিক এক স্থিতির নাম। মস্তিষ্ক তার সুনিপুণ দক্ষতায় এই পুরো প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

তথ্যসূত্র

- ♦ What falling in love does to your heart and brain − ScieceDaily.
- ♦ What does love do to our brains? Medical News Today.
- Romantic rejection stimulates areas of brain involved in motivation, reward and addiction
 ScienceDaily.
- ♦ The Rejected Brain The Anatomy of Love.
- ৡ ফিচার ছবিসূত্র: Training Your Emotional Brain: From Science Fiction to Neuroscience − Frontiers Media.



§ 85



কেন মানুষ ষড়যন্ত্র তত্ত্বে বিশ্বাস করে?

শুভ সালাউদ্দিন

সাপিরেসি থিওরি হলো কোনো ঘটনাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে তার সাথে উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা মিশিয়ে তাকে দিয়ে রহস্যময় করে তোলা কনসেপ্ট যেটা সমাজের একদল লোককে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে এবং বেশিরভাগ সময়ই এটা সমাজে পাকাপোক্তভাবে গেঁড়ে বসে যায়। এটা সাধারণত জনপ্রিয় কোনো ব্যক্তি, প্রভাবশালী অভিনেতা বা রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা চালু হয়ে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করে। প্রাচীনকাল থেকেই এসব বিশ্বাস চালু ছিল কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না থাকার কারণে একটি নিদিষ্ট গোত্রের মধ্যেই সেটা সীমাবদ্ধ থাকত কিন্তু বর্তমানের তথ্য প্রযুক্তির যুগে সামান্য বিষয়ই বিশাল আকার ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর কারণে। সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু কঙ্গপিরেসি থিওরির মধ্যে একটি হলো চন্দ্র অভিযান ভূয়া। আমেরিকা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ক্ষমতার লড়াইয়ে জিততে অভিযান শৃটিং করেছে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে না,এরিয়া ৫১ এ এলিয়েন আছে,পৃথিবী সমতলসহ বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু, বিভিন্ন জঙ্গি হামলার বিষয়েও এধরণের তত্ত্ব প্রচলিত আছে।মজার ব্যাপার হলো সঠিক ব্যাখ্যা থাকার পরও কন্সপিরেসি থিওরিতে বিশ্বাসীরা তা মানতে প্রস্তুত নয়। এখন আসি তারা এসবে বিশ্বাস কেন করে?

00110010010011

ভালো করে খেয়াল করুন এই নাম্বারগুলোর মধ্যে কোনো প্যাটার্ন খুঁজে পাচ্ছেন কি? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আপনি একা নয় প্রফেসর মার্ক লর্চের টুইটার পোলে ৫৬ শতাংশ লোক বলেছে তারা প্যাটার্ন খুজে পেয়েছ কিন্তু মজার ব্যাপার হলো প্রফেসর সিকোয়েন্সটা শুধু কয়েন টস করে সেটার ফলাফলকে বাইনারি নাম্বার দ্বারা প্রকাশ করেছেন আর সেখানে প্যাটার্ন থাকার কোনো প্রশ্নই উঠে না। তারপরও আপনি সম্ভবত প্যাটর্ন খুঁজে পেয়েছেন। কেন?

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র ৪৬.১: ছবির সূত্র journal.sjdm.org

বিভ্রম ছাঁদের ভ্রান্ত-অনুবোধন

এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে তারমধ্যে একটি হলো ইলুশনারি প্যাটার্ন পার্সেপশন মানে যেকোনো অনিয়মিত (Random) জিনিসপত্রে আমাদের ছাঁদ বের করার স্বয়ংক্রিয় প্রবণতা। বিশ্ব এক অনিশ্চিত জগৎ এখানে টিকে থাকার স্বার্থেই আমাদের মস্তিষ্ক প্রতিনিয়ত প্যাটার্ন খুঁজে সেগুলোর অর্থবাধক করে তুলতে চায়। বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, প্রাচীনকালে যখন শিকার করে মানুষ জীবনযাপন করত তখন আমাদের পূর্বপুরুষদের এই প্রবণতা অনেক সাহায্য করেছে। কেউ একবার দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাই এই ধরণের বাজে খাবার না খাওয়া, আকাশে কালো মেঘ জমেছে তার মানে ঝড় হবে, অমুক গাছের পাতা বিপদজনক তাই সেগুলো ব্যবহার না করা, কালো ছায়া মানে কোনো প্রাণী আক্রমণ করতে এসেছে। এসব কারণেই একটু সন্দেহপ্রবণ মানুষ প্রকৃতির সাথে লড়াই করে টিকে গিয়েছে। বিবর্তনের কারণে ব্রেইনের সেরেব্রাল কর্টেক্স (Cerebral Cortex) বিশেষ করে Frontal Cortex, Occipital Lobe, Temporal Lobe বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের প্যাটার্ন ডিটেকশন ক্ষমতাও প্রবল হয়ে উঠেছে। তাই

অনেকসময় প্রকৃতপক্ষে যেখানে কোনো প্যাটার্ন নেই সেখানেও প্যাটার্ন খুঁজে পায়।২০১৭ সালে ইউরোপিয়ান জার্নাল অব সোশ্যাল সাইকোলজিতে প্রকাশিত আর্টিকেলে বলা হয়, গবেষকরা ২০০-৪০০ জন লোকের মধ্যে ৫ টি পরীক্ষা পরিচালনা করেন। সেখানে দেখা যায়, যারা র্যান্ডম টসের মধ্যেও প্যাটার্ন খুজে পেয়েছে বা বিশৃঙ্খল পেইন্টিং এর মধ্যে প্যাটার্ন দেখতে পেরেছে তারাই অযৌক্তিক কোনো কিছুতে বিশ্বাস করে বেশি।

মনে করুন, তিনবার কয়েন টস করা হলো এবং তিনবারই টেইল পাওয়া গেল। এখন যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় এরপর কি আসবে? তাহলে উত্তর দিবেন হেড বা টেইল যেকোনোটাই আসতে পারে, চ্যান্স ফিফটি ফিফটি কিন্তু যে কন্সপিরেসি থিওরিতে বিশ্বাস করে বলবে, যেহেতু তিনবার টেইল এসেছে তাই এইবার অবশ্যই হেড আসবে।



অভিপ্রায় অনুধাবন (এজেন্সি ডিটেকশন)

এটা কোনো কিছুর কাজের পেছনে মোটিভ বের করার প্রবণতা। এটাকে Theory of Mind দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ToM হলো অন্যদের বিশ্বাস, ধারণা, মোটিভ, ভাবনাচিন্তা অর্থাৎ মানসিক অবস্থা সম্পর্কে অনুমান করতে পারার ক্ষমতা যেটা প্রত্যেকরই থাকে। মনে করুন আপনার এক বন্ধু আছে যে সবসময় প্রচুর লেট করে। যদি

কোনোদিন কোথাও মিনিট পাঁচেক আগে উপস্থিত হয় তাহলে আপনি অনুমান করতে পারবেন যে ও মনে মনে ভাবছে যে আপনাকে ভালোই চমকে দিয়েছে আবার আপনার বন্ধু আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারবে যে আপনি ভাবছেন সে ভালোই করেছে আগে এসে। এখন আপনারা ছোট্ট একটা হাসি দিয়ে অন্য কথা শুরু করতে পারেন। এখানে কোনো ধরনের কথা না বলেই একে অন্যের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরেছেন। এটা আমাদের সমাজে সকলের সাথে ইন্টারঅ্যাকশ-নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। আমরা বুঝতে পারি কে আমাদের বন্ধু কে আমাদের শক্রু, কে আমাদের পছন্দ করে, কে করে না ইত্যাদি । সাধারণত ৩-৪ বছর বয়স থেকেই এটার ডেভেলপমেন্ট হতে পারে। অটিজমসহ আরও কিছু নিউরোলজিকাল ডিজিজের কারণে যদি এটার ডেভেলপমেন্টে ঠিকমতো না হয় তাহলে দেখা যায় তারা সামাজিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

কিন্তু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে Agency Detection এর ক্ষমতা তুলনা-মূলকভাবে বেশি থাকে তারা সবকিছুতেই চক্রান্ত দেখতে পায়। মনে করে এলিয়েন পৃথিবীতে এসেছে কিন্তু সরকার আমাদের থেকে লুকাতে চাচ্ছে, অমুকে সিক্রেট পরিকল্পনা করছে ইত্যাদি।



চিত্র ৪৬.২: ছবির সূত্র undark.org

অভিযোজিত ষড়যন্ত্রের অনুকল্প (অ্যাডাপটিভ কন্সপিরা-সিজম হাইপোথিসিস)

এছাড়া জীববিজ্ঞানীরা একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা হলো, অ্যাডাপটিভ কঙ্গ-পিরাসিজম হাইপোথিসিস (Adaptive Conspiracism Hypothesis) । এটা অনেকটা একরম ধরা যাক, আপনি রাস্তায় হাঁটছেন এমনসময় দেখতে পেলেন এটা সাপ, আপনি ভয় পেয়ে সড়ে দাঁড়ালেন। পরে খেয়াল করে দেখলেন, আরে এটা তো দড়ি। এটা হাস্যকর তারপরও কোনো ক্ষতি হয়নি আপনার। আবার হাঁটতে থাকলেন দেখতে পেলেন, একটা দড়ি। নির্দ্বিধায় হাঁটা চালিয়ে গেলেন কিন্তু এবার দড়ি নয়, সত্যিকার অর্থেই সাপ ছিল যেটা আপনার জীবন সংশয়ের কারণ হিসেবে দাঁড়াবে। এখানে আমরা দুইধরনের error দেখতে পাচ্ছি:

- 😵 Type-II Error (False Negative): প্যাটার্ন থাকার পরও না খুঁজে পাওয়া। (High Cost)

প্রথম ধরনের ভুল করলে খুব বেশি আসে যায় না কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের ভুল করলে আপনাকে জীবন-মরণের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ শক্রু না থাকার পরও প্রস্তুতি নেওয়া, শক্রু থেকেও অপ্রস্তুত থাকা চেয়ে ভালো। এজন্য ব্রেইনের ডিফল্ট পজিশন হলো বিশ্বাস করে নেওয়া সব প্যাটার্নই সত্যি।

এছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হলো ডোপামিন লেভেল। ডোপামিন এক ধরনের হরমোন এবং নিউরোট্রাঙ্গমিটার যেটা ইমোশন এবং কগনিশন এর সাথে যুক্ত।ডোপামিন লেভেল একটা নিদিষ্ট মাত্রার কমবেশি হলে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা যায়। যদি কম থাকে তাহলে পারকিনসন ডিজিজ এর মতো সমস্যা দেখা যায় আবার বেশি হলে হ্যালুসিনেশন, প্যারানয়া, ডিল্যুশন ইত্যাদি সাইকোলজিক্যাল সমস্যা হয়। যারা জেনেটিক্যাল কারণে একটু বেশি ডোপামিন নিঃসরণ করে, তারা কঙ্গপিরেসি থিওরিতে বেশি বিশ্বাস করে। পিটার ব্রুগার (Peter Brugger) তার সহকর্মী ক্রিস্টিন মোর (Christine Mohr) ৪০ জন সাবজেক্ট এর উপর L-Dopa প্রয়োগ করে ডোপামিন নিঃসরণ বৃদ্ধি করে দেখেছেন যারা স্বাভাবিক অবস্থায় প্যাটার্ন খুঁজে পায়নি, তারাও র্যান্ডম জিনিসে প্যাটার্ন খুঁজে পাচ্ছে। আবার নিউরোলেপটিকস ড্রাগ (Neuroleptics Drug) যেটা হ্যালুসিনেশন, ডিল্যুশন, প্যারানয়াসহ বিভিন্ন phychotic behaviour এর চিকিৎসা ব্যবহার করা হয়। এটা ডোপামিন রিসেপ্টর ব্লুক করে দেয়া। তো এই ড্রাগ প্রয়োগ করার পর দেখা গেলো যারা র্যান্ডম জিনিসে প্যাটার্ন খুঁজে পেত তারাও কোনে প্যাটার্ন খুঁজে পেল না।

এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ের গবেষণাগুলোর মাধ্যমে জানা যায়, যারা এই ধরণের তত্ত্বে বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে কোনো কিছুর মধ্যে ব্যাখ্যা না পেলে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা দেবার প্রবণতা,কম বিশ্লেষণী ক্ষমতা,হতাশা, ক্ষমতাহীনতা, একাকিত্ব ইত্যাদি সমস্যা থাকে আর স্বল্প শিক্ষিত হওয়াও একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর।

তাছাড়া এমনিতেই বাস্তবতার চেয়ে গালগল্প অনেক মুখরোচক তাই কোনো একটা ঘটনার সত্যতার থেকে সেটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাড়িয়ে বলা বিভিন্ন কথা বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। থ্রিলার উপন্যাসের মতো মনে কনসেন্ট তো ভালো লাগবেই তাই এর অসাড়তা প্রমাণ হবার পরও মানুষ সেটা মানতে চায় না। বর্তমানে ইন্টারনেট আর সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে যেকোনো ধরণের সংবাদ অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে থাকে। সঠিক জ্ঞানের অভাবে অনেকে সব কিছুতেই বিশ্বাস করছে তাই কঙ্গপিরেসি থিওরি আরও বেড়েই চলেছে।এর মাঝেও আশার বিষয় হলো সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে এর সাথে মোকাবিলা করা সম্ভব । গবেষণায় এটা উঠে এসেছে যে উচ্চ শিক্ষিত লোকদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রবণতা কম। নর্থ ক্যারোলিনা স্টেইট ইউনিভার্সিটির সাইকোলজির প্রফেসর Anne Mclaughlin বলেছেন,

ক্রিটিক্যাল থিংকিং এমন একটা জিনিস যেটা শেখানো যেতে পারে এবং যদি মানুষকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাহলে লজিক এবং রিজনিং এর মাধ্যমে কন্সপিরেসি থিওরি এবং স্যুডোসায়েন্স এর মোকাবিলা করা সম্ভব। ব্রেইন ফলস কানেকশন তৈরি করার চেষ্টা করতে তারমানে এটা নয় যে আমাদের বিশ্বাস করতেই হবে।

তথ্যসূত্র

- ♦ Frans de Waal. Primates and Philosophers: How Morality Evolved (2006).
- Suspicious binds: Conspiracy thinking and tenuous perceptions of causal connections between co-occurring and spuriously correlated events (2018)
 − DOI: 10.1002/ejsp.2507.
- ♦ How the Theory of Mind Helps Us Understand Others (2020) verywellmind.com.
- ♦ Theory of Mind and Neurodevelopmental Disorders of Childhood. *Pediatr Res* 69, 101-108 (2011). DOI: 10.1203/PDR.0b013e318212c177.
- ♦ Conspiracy Theories: Evolved Functions and Psychological Mechanisms (2018).

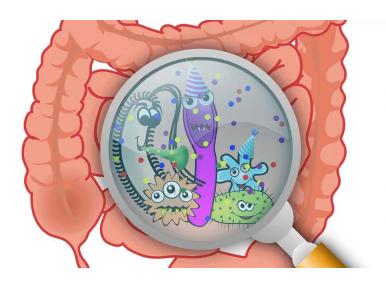
 DOI: 10.1177/1745691618774270
- ♦ Belief in conspiracy theories: Basic principles of an emerging research domain (2018). DOI: 10.1002/ejsp.2530.

- ♦ Connecting the dots: Illusory pattern perception predicts belief in conspiracies and the supernatural (2017). DOI: 10.1002/ejsp.2331.
- ♦ Conspiracy Theorists Have a Basic Cognitive Issue, Say Scientists – inverse.com
- 🗞 ফিচার ছবিসূত্র: Cultura via Getty undark.org.



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

§ 89



অন্ত্রে মাইক্রোবায়োম নেই এমন প্রাণীর সন্ধানে

উদিতি পাল বৃষ্টি

রীর বা শরীরের কোন নির্দিষ্ট অংশে স্বভাবতই বিপুল সংখ্যক অণুজীব বসবাস করে যারা খাদ্য হজমে, শক্তি উৎপাদনে, ভিটামিন তৈরিতে এমনকি ক্ষতিকর জীবাণু থেকে আমাদের রক্ষা করতে সাহায্য করে। এসব অণুজীবদের এক কথায় আমরা মাইক্রোবায়োম বা শরীরের অণুজীব বলে থাকি যারা প্রাকৃতিক ভাবেই মানুষ বা অন্য প্রাণীর দেহে থাকে। কিন্তু সিমঙ্গ ফাউন্ডেশনের 'Quanta Magazine' অনলাইন প্রকাশনার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এমনও প্রাণী আছে যাদের অন্তে মাইক্রোবায়োম নেই বা থাকলেও তা খুবই নগন্য। প্রতিবেদনটির মূলভাব এখানে তুলে ধরা হলো:

সুস্থ থাকার জন্য মানুষ এবং অন্যান্য কিছু প্রাণী তাদের অন্ত্রের জটিল ব্যাকটেরিয়া সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে যে তাদের এই সম্পর্ক নিয়মের বাইরেও ঘটতে পারে।

২০১১ সালের গ্রীন্মে, অনুজীববিজ্ঞানী স্নাতকোত্তর ছাত্র জন স্যান্ডার্স বহু বছর পরে দ্বিতীয় বারের মত গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘনবর্ষণ বনাঞ্চল খুঁজে পেয়েছিলেন। একটি বিশাল ফ্লোরসেন্স মাইক্রোস্কোপ এবং জেনারেটর দিয়ে অ্যামাজন নদী পর্যন্ত ৬০ পাউণ্ড ল্যাব সরঞ্জামে সজ্জিত করেছিলেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে তিনি যত দ্রুত সম্ভব বিভিন্ন পিঁপড়ে ধরতে শুরু করলেন, তাদের অন্ত্রে পরিব্যন্ত সব জীবাণু গুলো দেখার জন্য। তিনি সেই পিঁপড়া প্রজাতির কয়েকটিতে 'আশ্চর্যজনক, প্যাকেটযুক্ত মেঘ' দেখেছিলেন। তার মতে, ''এটি ছিল অনুজীবের ছায়াপথের মতো! মাইক্রোস্কোপের নিচে তাদের দিকে তাকালে তারা আপনার চোখে বিক্ষোরিত হবে।"

আমরা অন্যভাবে হজম করতে পারি না এমন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য, মূল পুষ্টি সরবরাহের জন্য, সংক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে কাজ করতে আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রশিক্ষণের জন্য আমরা এবং অন্যান্য অনেক প্রাণী আমাদের মধ্যে বসবাসকারি ব্যাকটেরিয়া কোষগুলোর উপর নির্ভর করি। মাইক্রোবায়োম আমাদের স্বাস্থ্য এবং বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র ৪৭.১: পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নির্লবণীকরণের প্রচলনের তুলনামূলক অনুপাত।

বেঁচে থাকার জন্য এতোটাই প্রয়োজনীয় যে কিছু গবেষক প্রাণীদেরকে তাদের অনুজীবীয় অংশের সমষ্টি হিসাবে ভাবাও দরকারি বলে মনে করেন। কিন্তু স্যান্ডার্স যখন পিঁপড়াগুলোর বাকি অংশ – তার সংগ্রহ করা বিভিন্ন কলোনি এবং প্রজাতির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের দিকে ফিরে গেলেন, তখন তিনি অবাক হয়ে বলেন, ''অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়া হিসেবে কোন কোষকে সহজেই শনাক্ত করতে আপনি কঠোর চাপে থাকবেন।" খাদ্য, ধ্বংসাবশেষ, পোকামাকড়ের অন্ত্রে আন্তরণের কোষগুলো – সবই উপস্থিত ছিল যেখানে মিথোজীবী অণুজীব বেশি ছিলোনা।

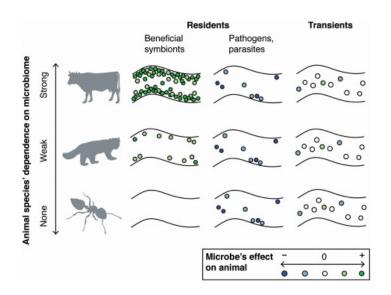
অণুজীব সম্প্রদায়ের পরিমাপ ও বিশ্লেষণের সরঞ্জামগুলোর উন্নতি হওয়ার সাথে সাথে এটি ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে মাইক্রোবায়োম প্রাণীজগতের সর্বত্র সর্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ যা প্রায়শই চিত্রিত করা দরকার। জীবাণুদের সাথে অনেক প্রাণীর আরও নমনীয় বা কম স্থিতিশীল সংযোগ রয়েছে বলে মনে হয়। কেউ কেউ তাদের উপর নির্ভর করে বলে মনে হয় না। উপহাসের বিষয় হচ্ছে, কীভাবে এবং কেন মাইক্রোবায়োমের বিকাশ ঘটে তার রহস্য সম্পর্কে, এর প্রকৃত গুরুত্ব এবং এর মূল অংশে থাকা সুবিধা ও অসুবিধাগুলোর সূক্ষ্ম ভারসাম্যহীন কাজ সম্পর্কে নতুন অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে এই প্রাণীগুলো এখন বিজ্ঞানীদেরকে সহায়তা করে।

অণুজীব হারিয়ে গেছে

বিশ শতকের গোড়ার দিকে, জীববিজ্ঞানীরা জটিল জীব এবং তাদের অণুজীবের মধ্যে আকর্ষণীয় সম্পর্ক উন্মোচন করতে শুরু করেছিলেন-টিউবওয়ার্ম যার মুখ, মলদ্বার বা অন্ত্র ছিল না; উইপোকা যা শক্ত, কাঠের গাছ খায়; গরু যাদের ঘাসযুক্ত খাদ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রোটনের ঘাটতি রয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ গুলো কৌতূহল তৈরি করেছে এবং পরবর্তী পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে উৎসাহিত করেছে। সেই বছরগুলোতে, কোনও প্রাণীর মধ্যে মাইক্রোবিয়াল সহায়কের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে আশ্চর্যজনক বা আকর্ষণীয় মনে হয় নি এবং এটি প্রায়শই সাহিত্যে পাস করার সম্মতির চেয়ে কিছুটা বেশি পেয়েছিল। এমনকি তার চেয়েও বেশি কিছু বিবেচনা করা হয়েছিল – য়েহেতু ১৯৭৮ সালের বিজ্ঞানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে উইপোকার মত নয় এমন ক্ষুদ্র কাঠ-খাওয়া ক্রাস্টেসিয়ানগুলোর অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়াগুলোর স্থিতিশীল জনপুঞ্জ ছিলো না।

এবং তাই এ ধারণা একটি নতুন নিয়মের দিকে যাচ্ছিলো যে প্রতিটি প্রাণীর এমন ব্যাকটেরিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিল যা ছাড়া এটি বিনষ্ট হয়। কয়েকজন এই অতি সাধারণ ধারণাটির প্রতিবাদ করেছিল। ১৯৫৩ সালের প্রথম দিকে মিথোজীবীতা গবেষণার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পল বুকনার এই ধারণাটি নিয়ে হতাশার সাথে লিখেছিলেন যে বাধ্যতামূলক, স্থির ও কার্যকরী মিথোজীবী সর্বজনীন ছিলো। তিনি বলেছিলেন, ''বা-

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



চিত্র ৪৭.২: গরু, পাণ্ডা এবং পিঁপড়ার মধ্যে অনুজীবীয় সম্পর্ক। উৎস: academic.oup.com

রবার লেখকরা জোর দিয়েছিলেন যে এন্ডোসিম্বায়োসিস হলো সমস্ত জীবের একটি প্রাথমিক নীতি"। তবে পাল্টা উদাহরণগুলো পোষক অণুজীবের মিথোজীবিতার গুরুত্ব নিয়ে, বিশেষত যেগুলো মানব স্বাস্থ্য এবং আমাদের নিজস্ব মাইক্রোবায়োমের মধ্যে সংযোগ তৈরি করেছে তার উপর অধিক গবেষণায় জোর দিয়েছিলো।

অ্যান্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তুতন্ত্র এবং বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান পোস্ট ডক্টরাল গবেষক টোবিন হ্যামার বলেছেন, ''মানব মাইক্রোবায়োম কীভাবে জীবাপুগুলো কাজ করে তা আমাদের চিন্তাভাবনাকে পুরোপুরি চালিত করেছে। এবং আমরা মাঝেমাঝে আমাদের বাইরেও চিন্তা করে থাকি।" তবে শুয়োপোকা এবং প্রজাপতি থেকে শুরু করে সফ্লাই এবং চিংড়ি, কিছু পাখি এবং বাদুড় (এবং এমনকি কিছু পান্ডা) এসব বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে যা চলছে তার জন্য মানব উদাহরণ আদর্শ নয়। এই প্রাণীগুলোতে অণুজীবগুলো বিক্ষিপ্ত, আরও ক্ষণস্থায়ী বা ধারণা করা যায় না এমন।

তারা প্রয়োজন ছাড়া তাদের পোষকের জন্য খুব বেশি অবদান রাখে না। কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানী এবং অনুজীবীয় বাস্তু বিশেষজ্ঞ সারা হির্ড বলেছেন, ''বিষয়টি আরও জটিল"।

স্যান্ডার্স তার গ্রীষ্মমন্ডলীয় পিঁপড়ের সাথে ব্যাকটেরিয়ার একটি ক্ষণস্থায়ী এবং প্রায় অস্তিত্বহীন সম্পর্ক দেখেন। তিনি তার নমুনা গুলো পুনরায় তার গবেষণাগারে নিয়ে এসেছিলেন যেখানে তিনি পোকামাকড়ের ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ সিকোয়েন্স করেছিলেন এবং কতটি জীবাণু উপস্থিত ছিল তা নির্ধারণ করেছিলেন। স্যান্ডার্স যে কয়টি প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন তার মধ্যে ঘন, বিশেষায়িত মাইক্রোবায়োম যুক্ত পিঁপড়ের প্রায় ১০০০০ গুণ বেশি ব্যাকটেরিয়া ছিল। স্যান্ডার্স বলেছেন, ''পিঁপড়াগুলোকে যদি মানুষের আকারে পরিমাপ করা হত তবে কেউ কেউ তাদের মধ্যে এক পাউন্ড জীবাণু নিয়ে যেত, অন্যরা কেবল কফি বিনের মতো সামান্য কিছু রাখতো। এটি সত্যিই একটি গভীর পার্থক্য।"

২০১৭ সালে Integrative and Comparative Biology রিপোর্টে দেখা গেছে যে এই পার্থক্য খাদ্যের সাথে জড়িত বলে মনে হয়েছিলো। কঠোরভাবে নিরামিষভোজী গাছে বাসকারী পিঁপড়ার প্রচুর পরিমাণে মাইক্রোবায়োম থাকার সম্ভাবনা ছিলো। সম্ভবত তাদের প্রোটিনের ঘাটতি যুক্ত খাদ্য গ্রহণের জন্য; মাটির নিচে বাসকারী সর্বভুক এবং মাংসাশী পিঁপড়ে বেশি সুষম খাবার গ্রহণ করে এবং তাদের অন্ত্রে নগণ্য পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া ছিল। তবুও, এই ব্যাপারটি বেমানান ছিল। কিছু গুলাজাতীয় পিঁপড়ার মাইক্রোবায়োমেরও অভাব ছিলো এবং যে পিঁপজ্জলোর মাইক্রোবায়োম ছিলো সেগুলোর নির্দিষ্ট প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া গুলোর সাথে বিস্তৃত, অনুমানযোগ্য সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে হয় না (যদিও কিছু অনুজীব পৃথক জেনেরার পিঁপড়ার মধ্যে সাধারণ ছিল)। এই ফলাফল আমাদের মতো স্তন্যপায়ী মাইক্রোবায়োম থেকে একটি স্পষ্ট ভিন্নতা চিহ্নিত করেছে, যা তাদের পোষক গুলোর জন্য খুব নির্দিষ্ট।

হিমশৈলীর চূড়ায়

স্যান্ডার্স পেরুতে যখন পিঁপড়া পরীক্ষা করছিলেন সেই একই সময়ে, হ্যামার গুঁয়োপোকার মাইক্রোবায়োম সন্ধানে কোস্টারিকায় ছিলেন (সান্ডার্স মন্তব্য করেছিলেন, ''পোকামাকড় জগতের এই গরুগুলোর চেয়ে আর কোনটা উৎকৃষ্ট পাওয়া যেতে পারে যার ব্যাকটেরিয়ার সাথে অত্যাবশ্যকীয় সম্পর্ক আছে?" তবে হ্যামার যেমন চেষ্টা করেছিলেন, তার সংগ্রহ করা পেটের এবং মলদ্বারের নমুনায় খুব বেশি ব্যাকটেরিয়া ডিএনএ খুঁজে পাননি। তিনি বলেছিলেন, ''সতিই অদ্ভত কিছ ঘটেছিল।"

কয়েক মাস ল্যাবে কাজের পরে তিনি হতাশাজনক ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রাণীগুলোতে কেবল কোন স্থিতিশীল মাইক্রোবায়োম থাকে না! ''এটি আমার জন্য চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আনার একটি কারণ ছিল যা মোটেই প্রত্যাশিত ছিল না।" তিনি এবং তার সহকর্মীরা শেষ পর্যন্ত দেখতে পেলেন যে, স্যান্ডার্সের অনেক পিঁপড়ার মতো, শুঁয়োপোকায় অনেক কম পরিমাণে জীবাণু ছিল যা আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার মত না। হ্যামার বলেছিলেন, ''তদুপরি সেই জীবাণু গুলো কেবলমাত্র প্রাণীর গাছপালার ডায়েটের মধ্যে পাওয়া একটি উপসেট ছিল, যা এই ধারণাকে সমর্থন করে যে তারা ক্ষণস্থায়ী ভাবে থাকছে। মূলত তা-দের মধ্যে কিছু হজম হচ্ছে, তারা অন্তে স্থিতিশীল জনপুঞ্জ স্থাপন করছে না।"

এই ক্ষণস্থায়ী ব্যাকটেরিয়াগুলো গুঁয়োপোকার উপকার করেছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য, গবেষকরা এন্টিবায়োটিক দিয়ে তাদের দূর করেছি-লেন। অন্যান্য পোকামাকড় এবং প্রাণীতে এই ধরনের চিকিৎসা পোষককে সরাসরি বিকাশ বা হত্যা করে। তবে এটি হ্যামারের গুঁয়োপোকায় কোনো প্রভাব ফেলেনি।

ভারতের বেঙ্গালুরুতে ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োলজিকাল সায়েন্সের ভারতের বাস্তবিদ এবং বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানী দীপা আগাশে ও বিজ্ঞান অভিসন্ধানী বিজ্ঞান ব্লগ



চিত্র ৪৭.৩: শুঁয়োপোকা Eumorpha satellitia। উৎস: biotechniques.com

তার দল তাদের ক্যাম্পাসের সবুজাভ অংশের বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে সংগ্রহ করা পোকামাকড়ের মধ্যে একইরকম কিছু দেখতে পেল। ড্রাগনফ্লাই এবং প্রজাপতিগুলোতে তারা যে অণুজীবগুলো পেয়েছিল সেই গুলো কোনও বিশেষ পোকার প্রজাতি বা বিকাশের পর্যায়ে না গি-রে পোকামাকড়ের খাবারের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ড্রাগনফ্লাই এর ব্যাকটেরিয়া সম্প্রদায়ের বেশিরভাগই সুযোগ পেয়ে একত্র হয়েছে বলে মনে হয়েছে। আগাশে বলেছিলেন, ''পোকামাকড় গুলো নির্দিষ্ট প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া বা কোনও বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়া বেছে নিচ্ছে বলে মনে হয় না, বেশিরভাগ কেবল সেখানে নামে মাত্র ছিল।"

প্রজাপতির মাইক্রোবিয়াল জনপুঞ্জ ব্যাহত করে এমন বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা গুলো পোষকের বৃদ্ধি বা বিকাশের উপর কোনো প্রভাব
ফেলেনি। এমনকি তাদের অন্ত্রের সাথে ব্যাকটেরিয়াকে পুনঃপ্রবর্তন করতে পারেন নি। আগাশে বলেছিলেন, ''সত্যিই তারা তাদের জীবাণুগুলোর
তত্ত্বাবধায়ন করে বলে মনে হয় না।" হ্যামার এবং স্যান্ডার্সের মতে
যদিও প্রজাপতিগুলো খাবারের জন্য বিষাক্ত উদ্ভিদের উপর নির্ভর

করে, পরিপূর্ণ, কার্যকরী মাইক্রোবায়োম কে তাদের খাবার বিষমুক্ত করতে উপযুক্ত মনে হয়। আগাশে বলেছিলেন, ''প্রথম দিকে আমরা আমাদের মাথা চুলকাচ্ছিলাম। এটি একটি আশ্চর্যজনক ফলাফল ছিলো এবং প্রকৃতপক্ষে এই বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা খাটাতে কিছুটা সময় লেগেছিলো।"

তবে এতে এত অবাক হওয়ার কিছু নেই যেহেতু বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন যখন মাইক্রোবায়োম উপস্থিত থাকে তখন তারা প্রায় নির্দিষ্ট টিস্যুতে পাওয়া যায়। এতে নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়া জড়িত যা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য গুলো কে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, ববটেল স্কুইডের একটি মিথোজীবিতা রয়েছে যা এক প্রজাতির আলোকিত ব্যাকটেরিয়ায় সীমাবদ্ধ যেটা একক আলোক উৎপাদনকারী অঙ্গে বিভক্ত থাকে। যখন স্কুইডের অন্ত্র এবং ত্বক অণুজীব মুক্ত থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক মৌচাকের তাদের ব্যাকটেরিয়ার সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে তবে লার্ভার থাকে না।

সুতরাং এমন না ভাবার কোন কারণ নেই যে এমন প্রাণী থাকতে পারে যার এরকম সম্পর্ক নেই। আগাশে বলেছিলেন, ''আমি মনে করি এই ধরনের সংযোগের পুরো বিস্তৃতি আপনি খুঁজে পেতে পারেন বর্তমানে এমন ক্রমবর্ধমান অনুধাবন রয়েছে।"

হ্যামার সহমত হলেন, ''আমরা কেবল হিমশৈলির শীর্ষে এক ঝলক পে-য়েছি।"

তিনি বলেছিলেন, ''এটি গরু এবং শুঁয়োপোকার মধ্যে দ্বন্দ্ব নয়, এখানে বিভিন্ন ধরণের জীবনধারা রয়েছে যা সত্যিই জটিল হয়ে উঠছে।" সম্ভবত ক্ষণস্থায়ী, স্বল্প-প্রাচুর্যের জীবাণুগুলো আরও উপদ্রব জনক কিছু করছে বা সম্ভবত তারা আরও স্থিতিশীল বিবর্তনমূলক সম্পর্ক গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে। হতে পারে তারা বেশিরভাগ সময় নিরপেক্ষ থাকে এবং কিছু নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে কেবল কার্যকরী হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু গবেষক মনে করেন যে এই অনুজীব গুলো কেবল অন্তে অবস্থান করে, জীবাণু গুলোকে অবরুদ্ধ করে কোন

পোষককে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। তদুপরি, ব্যাকটেরিয়া যেগুলো একটি বিষাক্ত উদ্ভিদ বা অন্যান্য বিপদের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে যা হয়তো সাময়িকভাবে অর্জিত, তারা কখনও কখনও নিয়মিত মিথোজীবীতায় জড়িত না হয়েও সহায়ক হতে পারে।

অ্যারলিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবিয়াল বাস্তবিদ এবং কীটপতঙ্গ বিদ অ্যালিসন রাভেনস্ক্রাফ্ট বলেছেন, ''এমনকি যদি কোনও ক্ষণস্থায়ী মাইক্রোবায়োম আপনার সাথে যুক্ত না হয়, আপনি যদি পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া ব্যাকটেরিয়া গিলে ফেলেন তাহলে সম্ভবত আপনি তাদের থেকে সুবিধা পেতে পারেন। এটি শুধুমাত্র পরিমাপ করা আরও কঠিন হবে।"

তিনি এটাও বলেন, ''এমনকি মানুষের মধ্যেও মাইক্রোবায়োম (ক্ষণস্থায়ী জীবাপুগুলো সহ) ডায়েট বা আচরণে পরিবর্তন আনতে পারে।" স্থিতিশীল মাইক্রোবায়োমের উপর নির্ভর করে না এমন জীবনধারা নিয়ে গবেষণা বিজ্ঞানীদের সেই পরিবর্তনের প্রভাব দূর করতে সহায়তা করতে পারে। এটি মাইক্রোবায়োম থাকার গুরুত্ব আরও ভালোভাবে চিহ্নিত করে বিবর্তনে নতুন অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পথ দেখায়।

বৈচিত্র্য থেকে যা শিখলাম

আগাশে বলেছিলেন, "আপনি যদি এটি নিয়ে চিন্তা করেন তবে স্থায়ী মাইক্রোবায়োম না রাখার অনেক কারণ রয়েছে। আসলে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে এমন প্রাণী রয়েছে যা বিভিন্ন দিকে চলেছে। তবে মূল বিষয়টি হলো আমরা জানি না কেন – কোন কারণে মাইক্রোবায়োম গঠনে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম করে এবং বিপরীতে, কী কারণে এই সম্পর্ক গুলো প্রতিরোধ করতে পারে।

শুঁরোপোকা, ড্রাগনফ্লাই, কিছু পিঁপড়া এবং অন্যান্য প্রাণী লিভ-ইন অণুজীবের সাথে দীর্ঘস্থায়ী সহাবস্থান মূলক সম্পর্কের সম্ভাব্য অসুবিধাগুলো তদন্ত করার একটি উপায় বের করে। যে অসুবিধা পরিমাপ এবং পরীক্ষা করা কঠিন হতে থাকে। গবেষকরা সন্দেহ করেছেন যে এই প্রাণীগুলো সম্ভবত নির্দিষ্টভাবে মিথোজীবিতার সম্ভাব্য কিছু প্রতিকূলতা এড়িয়ে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ ব্যাকটেরিয়া তাদের পুষ্টির জন্য তাদের পোষকের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে বা প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে, এই ঝুঁকিগুলো সম্ভাব্য সুবিধা সমূহ ছাড়িয়ে যেতে পারে। যদি তাদের নিজের বাঁচার জন্য দরকার এমন এনজাইম বা আচরণগুলো ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়ে থাকে তবে তারা কোনও মাইক্রোনায়াম অর্জনের জন্য বাছাইকৃত চাপের মুখে পড়ে না। হ্যামার বলেন শুঁয়োপোকার ক্ষেত্রে এটি হতে পারে, যা প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ উপাদান খেয়ে তাদের নিরামিষভোজী জীবনযাপন সঞ্চার করে। তাত্ত্বিকভাবে একটি শুঁয়োপোকার মাইক্রোবায়োম বাড়তি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উৎপাদন করতে বা আরও বেশি পুষ্টি তৈরি করতে সক্ষম। কিন্তু কীটপতঙ্গ গুণগত মানের খাবার তৈরি করতে পারে।

অণুজীবের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে এমন আরেকটি কারণ শারীরবৃত্তীয় বলে মনে হচ্ছে (যদিও কারণ এবং প্রভাব এর মধ্যে অস্পষ্ট
রেখাটি দেখে আগাশে এটিকে সঠিক ব্যাখ্যা মনে করেন না)। কতিপয়
ব্যাকটেরিয়া বহনকারী বেশিরভাগ জীবের একটি ছোট, সাধারণ অন্ত্রের
কাঠামো থাকে, মূলত এমন একটি নল যার মধ্য দিয়ে খাদ্য দ্রুত
চলে যায় এবং প্রক্রিয়াজাত হয়। এটি অণুজীবকে দৃঢ়ভাবে থাকার এবং
বাড়ার জন্য সময় বা স্থান দেয় না।

বাস্তুগত বিষয়গুলোও বিবেচনা করা উচিত। তিনি বলেন,"এটি আসলে বেশ অবিশ্বাস্যরূপে আশ্বর্যজনক যে কীভাবে মিথোজীবিতা হওয়া উচিত বা ঘটতে পারে।" বংশ পরস্পরায়, কোনও জীবকে প্রায়শই এমন অংশীদারিত্ব নিয়ে অন্য একটি প্রজাতির মোকাবিলা করতে হয় যা

পরিবর্তনীয়ও অবস্থার মধ্যেও নিয়মিত এবং পারস্পরিক উপকারী। আগাশে অনুমান করেন যে তার প্রজাপতি এবং ড্রাগনফ্লাই গুলো ক্রমশ জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ করে যা স্থান এবং খাতুতে পরিবর্তন হয়।তাই তাদের স্থিতিশীল মাইক্রোবায়োম প্রতিষ্ঠার জন্য একই ব্যাকটেরিয়ার সাথে দেখা হয় না।

গবেষকরা জোর দিয়ে বলেছেন যে মাইক্রোবায়োমের বিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সম্ভবত কোনও একক নিয়ম বা নীতি নেই। স্যান্ডার্স বলেছিলেন,"বিবর্তনটি অবিশ্বাস্য, স্বকীয় এবং বিভিন্ন জীবের মধ্যে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়।"

হির্ড আগাশের সাথে একমত হলেন। তিনি বলেছিলেন, "মাইক্রোবায়োম সম্পর্কে আমাদের বেশিরভাগ অনুমান স্তন্যপায়ী গবেষণার উপর নির্ভর করে, যেখানে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা অদ্ভুত। আমাদের প্রতিদিনের ভিত্তিতে মাছ বা পাখি বা শুঁয়োপোকা জাতীয় কোন কিছুতেই স্থিতিশীলতা নেই।"

এমনকি স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যেও মাইক্রোবায়াম কীভাবে নিজেকে উপস্থাপন করে তার মধ্যে বৈচিত্র রয়েছে। যদিও বেশিরভাগ স্তন্যপায়ী প্রজাতি নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার সাথে যুক্ত বলে মনে হয়, স্যান্ডার্স এবং তার সহকর্মীদের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে বাদুড় এমন হয় না। প্রকৃতপক্ষে তাদের মাইক্রোবায়োম আরও ক্ষণস্থায়ী এবং এলোমেলো। স্তন্যপায়ী প্রাণীর চেয়ে পাখির মাইক্রোবায়োমের সাথে অনেক বেশি মিল ছিলো । গবেষকরা মনে করেন যে এই পার্থক্য বাদুড় এবং পাখি উভয়েরই উড়ে চলতে যথাসম্ভব হালকা হওয়ার প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক থাকতে পারে। সম্ভবত তারা কোনও অতিরিক্ত ভার বহন করতে পারতো না।

নির্বিশেষে, অনুসন্ধানগুলো ব্যাখ্যা করে যে প্রজাতির তুলনা করে শেখার মতো অনেক কিছুই রয়েছে। ব্যাকটেরিয়ার সাথে তাদের সম্পর্ক কী হতে পারে তা নিয়ে অগ্রিম অনুমান করে অনেক কিছুই হারানোর সম্ভাবনা থাকতে পারে। এর মানে হচ্ছে কমপক্ষে মাছি, ইঁদুর এবং অন্যান্য মডেল জীবের গবেষণা মানুষে রুপান্তর করার সময় আরও সতর্কতার সাথে এগিয়ে যাওয়া। (ইতিমধ্যে, বুনো ইঁদুর বনাম ল্যাবে ব্রিড ইঁদুরের অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পাওয়া গেছে এবং প্রায়শই কিছু নির্দিষ্ট পরীক্ষামূলক ওষুধ কীভাবে মানুষের মধ্যে কাজ করতে পারে তার আরও একটি সঠিক মডেল হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।)

স্যান্ডার্স বলেছিলেন, ''প্রতিটি বিদ্যমান জীবের পেছনে সাড়ে তিন বিলিয়ন বছরের বিবর্তনমূলক ইতিহাস রয়েছে, ১০ লক্ষ বা ৫০ লক্ষ বা আরও অধিক লক্ষ বছর আগের যা আমরা মডেল হিসেবে নিই এমন অনুজীবের সাথে মিলে না।" ফলমূলের মাছির অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমের গুরুত্ব বা মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কিত মডেল নিয়ে অনুমান করার সময় অনুজীবের সাথে প্রাণিদের বৈচিত্র্যময় সম্পর্ক নিয়ে বিজ্ঞানীদের উদীয়মান সচেতনতা সত্যিই আমাদের সতর্ক করে। কারণ ফলের মাছিগুলো মৌলিক সূচনালগ্ন থেকে মানুষের তুলনায় খুব ভিন্নচালিত হতে পারে। ইঁদুরের ক্ষেত্রেও তা একই।

তিনি আরও বলেছেন, ''আমাদের চোখ এবং কান খোলা রাখা দরকার। প্রাকৃতিক ভিন্নতা এবং বৈচিত্র্য থেকে এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে।"

যখন বিজ্ঞানীরা আমাদের নিজস্ব থেকে ব্যাপকভাবে পৃথক কিছুকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছেন তখন মাইক্রোবায়োম এর ক্ষেত্রে হ্যা-মার বলেছিলেন, ''আমি মনে করি তাদের এখনো অদ্ভুতরূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।" এতটাই যে স্যান্ডার্স এবং অন্যরা তাদের কিছু কাজ প্রকাশ করা চ্যালেঞ্জ জনক বলে মনে করেছে।

যত দ্রুত এই মনোভাব পরিবর্তন হবে, ততই আমরা আরও শিখতে সক্ষম হব। হির্ড বলেছেন, ''আমরা সবেমাত্র খুব অল্প জায়গায় শত শত প্রজাতি থাকার জটিলতা, একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করা, তাদের পরিবেশের সাথে কথা বলার এবং পোষকের সাথে আলাপচারিতা করার বিষয়টির চারপাশে মাথা খাটানো শুরু করেছি, প্রতেক্যটা দৃশ্যকল্প সম্ভবত এখনও প্রমাণ করা বাকি।"

তথ্যসূত্র

♦ Jordana Cepelewicz. Some Animals Have No Microbiome. Here's What That Tells Us (2020)
 − Quanta Magazine.



§ 8b



বিশুদ্ধ জল-সংকটে বিশ্ব: সম্ভাবনায় নির্লবণীকরণ

সিয়াম আরাফাত

নির্লবণীকরণ কী? কেন প্রয়োজন?

উবেলা থেকেই আমরা আমাদের বিজ্ঞান বইয়ে পড়ে আসছি পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগ জল আর এক ভাগ মাটি। তাই আপাত-দৃষ্টিতে আমাদের মনে হতে পারে আমাদের বুঝি কোনো কালে পানির ঘাটতি হবে-ই না।কিন্তু এ ধারণা পুরোপুরি সঠিক নয়। আনুমানিকভাবে আমাদের পৃথিবীর মোট পরিমাণের ৭০ ভাগ পানি এবং ৩০ ভাগ মাটি বা স্থলভূমি।

পৃথিবীর পানির এই মোট পরিমাণের ৯৭ ভাগই লবণাক্ত যা আমাদের ব্যবহার উপযোগী নয়। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বাকী যে ৩ ভাগ বিশুদ্ধ পানি রয়েছে তার অধিকাংশই হিমবাহরুপে (বরফ হিসেবে) থাকে। ফলে গড় হিসেবে পৃথিবীর মোট পানির পরিমাণে আমাদের ব্যবহার-যোগ্য পানির পরিমাণ এক শতাংশেরও কম। ব্যবহারযোগ্য এই সামান্য অংশটুকুও জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পানি দৃষণ, বিশ্বব্যাপী পানির অপচয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন শিল্পকারখানা বৃদ্ধির ফলে ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের পড়তে হতে পারে জল-সংকটে।আর এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্যই প্রয়োজন ডিস্যালিনেশন প্রযুক্তির প্রয়োগ ও বিকাশ।

লবণাক্ত পানি না হয় আমাদের ব্যবহার অনুপোযোগী, কিন্তু আমরা যদি লবণাক্ত পানি থেকে লবণ অপসারণ করে বিশুদ্ধ পানিতে রা-পান্তর করি তাহলে কিন্তু এই সমস্যার অবসান ঘটানো সম্ভব।আর যে পদ্ধতিতে এটি করা হবে সেটাই হচ্ছে ডিস্যালিনেশন বা ডিসল্টিং (Desalination or Desalting)। বাংলায় এই পদ্ধতিকে বলা যেতে পারে নির্লবণীকরণ। অর্থাৎ সমুদ্রের লবণাক্ত পানি থেকে লবণ অন্যান্য ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ অপসারণ করে ব্যবহার উপযোগী বিশুদ্ধ পানি উৎপাদনের পদ্ধতিকেই বলে ডিস্যালিনেশন বা নির্লবণীকরণ। তবে শুধুমাত্র সমুদ্রের পানিকে বিশুদ্ধ পানিতে পরিণত করতেই ডিস্যালিনেশন ব্যবহৃত

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

হয় না, বরং লবণাক্ত বা আংশিক লবণাক্ত পানি বিদ্যমান যেকোনো জলাশয় থেকে বিশুদ্ধ পানি পেতে ব্যবহার করা যেতে পারে এই পদ্ধতি।



চিত্র ৪৮.১: পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নির্লবণীকরণের প্রচলনের তুলনামূলক অনুপাত

ডিসলিন্যাশনের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কীভাবে কাজ করে?

যেহেতু এই পৃথিবীর অতি সামান্য পরিমাণ পানি আমাদের ব্যবহারযোগ্য তাই ভবিষ্যৎ সংকটের কথা ভেবে বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের ও অন্যান্য উৎসের নোনা পানিকে কিভাবে আমাদের গ্রহণযোগ্য করা যায় সে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন।তারা এই ডিসলিন্যাশন নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন, উদ্দেশ্য- এর ব্যয় কমিয়ে কম খরচে নোনা জলকে ব্যবহারযোগ্য জলে রূপান্তর করা।

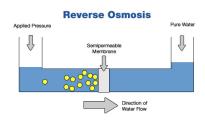
নোনাজল থেকে লবণকে আলাদা করে গ্রহণউপযোগী পানিতে পরিণত করার অনেক পদ্ধতি থাকলেও অধিকাংশ সময়ই মাত্র দুটি পদ্ধতির একটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ দুটো হচ্ছে- মাল্টিস্টেজ ফ্ল্যাশ (Multistage flash) এবং রিভার্স অসমোসিস (Reverse Osmosis).

Multistage Flash (মাল্টিস্টেজ ফ্লাশ)

এ প্রক্রিয়ায় সমুদ্রের জলকে পাম্প করে কোনো একটি ট্যাংকে নেওয়া হয়।তারপর একে তাপ দিয়ে বাষ্পে পরিণত করা হয়।সেই বাষ্পকে আবার ঘনীভূত করে তরলে পরিণত করা হয় এবং অতঃপর একে আরও তাপ দিয়ে বাষ্পে পরিণত করা হয়। এভাবে একাধিকবার পাতন প্রক্রিয়ায় তরল হতে বাষ্প, বাষ্প হতে তরল.. করে একে বিশুদ্ধ পানিতে রূপান্তর করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর তাপশক্তির প্রয়োজন হয় বিধায় খরচও অনেক বেশি।

Reverse Osmosis (রিভার্স অসমোসিস)

Reverse Osmosis প্রক্রিয়া হচ্ছে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপ-রীত।অর্থাৎ, অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কম ঘনত্বের স্থান হতে বেশি ঘনত্বের স্থানের দিকে দ্রবণ ধাবিত হলেও রিভার্স অসমোসিস প্রক্রিয়ায় বেশি ঘনত্বের স্থান হতে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে দ্রবণ ধাবিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় পানি বিশুদ্ধকরণে তাপ ও শক্তির তুলনামূলকভাবে খুব বেশি প্রয়োজন না পড়ায় Multistage Flash হতে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কম খরচ হয়।এই পদ্ধতিতে নোনাজল হতে আয়ন ও অন্যান্য অনাকাঙ্খিত খনিজ দ্রব্যকে পৃথক করতে একটি অর্ধভেদ্য পর্দা ব্যবহার করা হয়।এই প্রক্রিয়ায় অসমোটিক প্রসার প্রয়োগ করে পানিকে Reverse Osmosis Membrane (অর্ধভেদ্য পর্দা) এর দিকে ধাবিত করা হয়।এই পর্দার ছিদ্রসমূহের ব্যাস হচ্ছে ০.০০০১ মাইক্রন। অন্যদিকে বিভিন্ন অণুজীবের ব্যাস প্রায় ০.০১ মাইক্রনের কাছাকাছি, যা অর্ধভেদ্য পর্দায় থাকা ছিদ্রের চেয়ে প্রায় ১৫ গুণ বড়।ফলে কোনো ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ময়লা, ধূলিকণা এই পর্দা ভেদ করে যেতে পারে না।শুধু মাত্র পানিতে দ্রবীভূত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এবং কিছু দ্রবীভূত খনিজ পদার্থ এই পর্দা ভেদ করে অপরদিকে আরেকটি ট্যাঙ্কে জমা হয় এবং এ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পানি শতভাগ বিশুদ্ধ ও ব্যবহার উপযোগী।



চিত্র ৪৮.২: রিভার্স অসমোসিস যেভাবে কাজ করে

ডিসলিন্যাশনে চ্যালেঞ্জসমূহ

ডিসলিন্যাশনের মাধ্যমে প্রধানত সমুদ্রের জল হতে লবণ ও অন্যান্য ক্ষতিকর দ্রব্য অপসারণ করে বিশুদ্ধ জল উৎপাদন করা হয়। এই ক্ষতিকর ও অপসারিত দ্রব্যগুলোকে সাধারণত ব্রাইন বলা হয়ে থাকে। এই পদার্থগুলোর ঘনত্ব অনেক বেশি এবং খুবই বিষাক্ত যা পানিতে ফেললে পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও পানিদূষণ সহ জলজ প্রাণীদের জন্য ভ্রমকিস্বরূপ হয়ে যায়। অন্যদিক মাটিতে পুঁতে ফেললে মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। মাটি দৃষিত ও অনুর্বর হয়ে যায়।সেখানে সাধারণত আর গাছ জন্মায় না। তাছাড়া এই প্রকল্পের খরচ অনেক বেশি।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় ডিসলিন্যাশন

ব্যয়বহুল হলেও বিশ্বের অনেক দেশ ডিসলিন্যাশন প্রযুক্তিকে নিরাপদ পানি পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। বিশ্বব্যাপী ডিসলিন্যাশন প্ল্যান্টগুলোর সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তা নিয়ে গবেষণা কার্যক্রমও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচছে। গত পাঁচ দশকে সরকারী ও বেসরকারীভাবে এই প্রকল্পে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। ব্যয়বহুল এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ শক্তির অপচয় ঘটে তা হয়তো ভবিষ্যতে উন্নত প্রযুক্তিজ্ঞানের সাহায্যে আরও কমিয়ে আনা সম্ভব, এমনটাই প্রত্যাশা বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীদের।ভবিষ্যতে হয়তো এই ডিসলিন্যাশনই হবে আমার আপনার নিরাপদ পানি পাওয়ার

একমাত্র মাধ্যম।

আমাদের করণীয়

বিশ্বে দ্রুতহারে বাড়ছে জনসংখ্যা, সংকটে বিশুদ্ধ পানি। পৃথিবীব্যাপী প্রতিদিন প্রায় দুই মিলিয়ন টন শিল্পকারখানা, কৃষিকাজ, গৃহস্থালিসহ অন্যান্য বর্জ্য সমুদ্র, নদ-নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে ফেলা হচ্ছে (UN WWAA 2003). তাছাড়া আমাদের পানি অপচয়ের পরিমাণও কম নয়। তবুও যেন অধিকাংশেরই সেদিকে কোনো দৃষ্টিপাত নেই, তারা যে যার মতো পানি দূষণ ও অপচয় করেই যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবেলায় আমাদের সকলকেই সচেতন হতে হবে, পানি দূষণ ও অপচয় যথাসম্ভব রোধ করতে হবে। নিজে সচেতন হতে হবে, অন্যকেও সচেতন করে তুলতে হবে।

তথ্যসূত্র

- ♦ Multi-Stage Flash Distillation ScienceDirect.
- ♦ Laurie L. Dove. How Desalination Works How Stuff Works.
- ♦ What Is Desalination? Fluence.
- ভিস্যালিনেশন বা নির্লবণীকরণ কী? − Biggan Blog,
 Youtube.



§ 85



"সুন্দর" এর কাটাকুটি: নন্দন স্নায়ু-বিজ্ঞান

আরিফ ইশতিয়াক

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী



পরের ছবি দুইটির মধ্যে মিল কোথায় বলুন তো? দুইটা ছবি দুই ধরনের, প্রথমটি লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির আঁকা খুব বিখ্যাত পোর্ট্রেট মোনালিসা আর দ্বিতীয়টি জোসেফ ডন্ডেলিঞ্জা এর ক্যামেরা দিয়ে তোলা পুরন্ধার প্রাপ্ত একটা ল্যান্ডক্ষেপ।

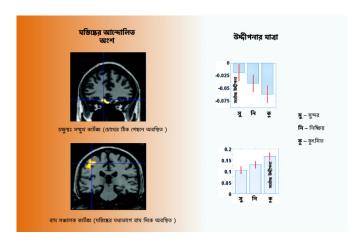
দৃশ্যত কোন মিল না থাকলেও এদের মধ্যে একটা বড় মিল হল, দুইটা ছবিই বেশ সুন্দর। আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, কেন সুন্দর এগুলো? আপনি উত্তরে হয়ত বলবেন নিখুঁত আকুনি, রং, আকর্ষনীয়তা বা অন্যকিছু।

কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় "সৌন্দর্য" কি?

একটু বিষম হয়ত খেয়েই বসবেন তখন। খুবই সহজ একটা প্রশ্ন, আবার কিন্তু খুব জটিলও। তবে, নিশ্চিন্ত থাকুন এর উত্তর দিতে গিয়ে শুধু আপনিই নন বড় বড় বিজ্ঞানীরাও হিমশিম খাচ্ছেন। অথচ ভেবে দেখুন প্রতিদিনই আমরা এই সৌন্দর্যকে অনুভব করছি নানা ভাবে।

নিউরোএস্থেটিকস বা নন্দন স্নায়ু-বিজ্ঞান কী বলছে?

সৌন্দর্যকে বুঝতে গিয়ে বিজ্ঞানের আন্ত একটা শাখা তৈরি হয়েছে, যার কাজ সৌন্দর্য কিভাবে কাজ করে আর এর পেছনে আমাদের মন্তিষ্কের ভেতর কি ঘটছে তা উদঘাটন করা। শাখাটির নাম নিউরোএস্থেটিকস, বাংলায় এর নাম হবে "নন্দন স্নায়ু-বিজ্ঞান"। গবেষণায় মানুষের এই সৌন্দর্য বোধের খুব চমৎকার কিছু বিষয় উঠে এসেছে। আমাদের মন্তিষ্কের কিছু অংশ রয়েছে যেগুলু উদ্দীপিত হয়ে আমাদেরকে বলে দেয় কোন কিছু সুন্দর নাকি কুৎসিত। আপনি যখন উপড়ের ছবি দুটো দেখছেন আপনার মন্তিষ্কের প্রধানত দুইটি অংশে রক্তপ্রবাহ বেড়ে গেছে এবং ঐখানের স্নায়ুগুলু উদ্দীপিত হয়েছে, আর সেগুলুর উদ্দীপনের মাত্রা ঠিক করে দিয়েছে এটা আপনার কাছে সুন্দর লাগছে নাকি লাগছে না। নিচের ছবিতে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।



চিত্র ৪৯.১: এফ - এম আর আই মেশিন দিয়ে স্ক্যান করা ছবি এবং উপাত্তগুলো নেওয়া হয়েছে ড. সামির জাকি আর ড. হিদেকি কাওয়াবাতো এর বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা থেকে। $\mathrm{DOI:}~10.1152/\mathrm{jn.}00696.2003$

এতো গেল মস্তিষ্কের ভেতরের কথা কিন্তু ঠিক কোন বিষয়গুলু আমাদের মধ্যে এই সৌন্দর্য বোধের উদ্দীপনা দেয়? বিজ্ঞানীরা এর উত্তর খুঁজতে স্নায়ু বিদ্যার পাশাপাশি মনোবিদ্যা, বিবর্তন বিদ্যা আর পুরাতত্ত্ব বিদ্যার সাহায্য নিলেন। সে বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণার যা বেরিয়ে আসল সেটা কে সহজ করলে বলা যায়,

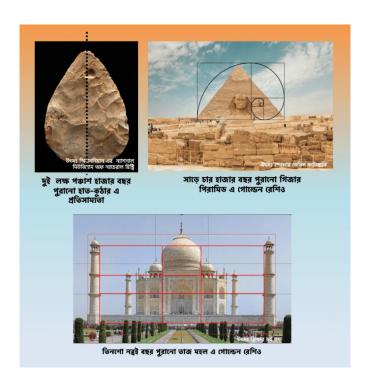
যখন কোন কিছুর রং, আকার, আকৃতি, নকশা বা অনুপাত কোনভাবে আমাদের কাছে আকর্ষনীয় মনে হয়, আমাদের মস্তিঙ্কের নির্দিষ্ট অংশগুলুতে একধরনের আলোড়ন তুলে; তখন আমরা একে সুন্দর ভাবি।

সৌন্দর্যের বয়স কত?

সৌন্দর্য এমন একটা মানব অনুভূতি যা আমাদের সাথে আছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। যতগুলো আদিম সভ্যতা আবিষ্কার হয়েছে তার সবগুলোতেই রয়েছে জ্যামিতিক সৌন্দর্য বাধের ছাপ। সময়ের সাথে সাথে সৌন্দর্যের গতি বিভিন্ন দিকে মোড় নিলেও আবর্তিত হয়েছে একই মৌলিক বিষয় গুলোর মধ্য দিয়ে। আদিম স্থাপনা আর ব্যবহৃত বস্তু গুলোতে জ্যামিতিক আকার, আকৃতি, প্রতিসাম্যতা, আনুপাতিক নকশা আর সোনালী অনুপাত বা গোল্ডেন রেশিও বেশ লক্ষণীয়। এমনকি মানব সভ্যতার একদম সূচনা লগ্নে বানানো সবচেয়ে আদি সরঞ্জাম গুলোতেও প্রতিসাম্যতা পাওয়া গেছে। মাটির নীচ থেকে আবিষ্কৃত সবচেয়ে আদিম কুঠার এর আকৃতি প্রতিসাম্য বৃষ্টির ফোঁটার মতন। কুঠারের এই আকার যে খুব কার্যকর তা কিন্তু নয়, তার পরও দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ পাথরে পাথর ঘষে কেন ঠিক এই আকারটাই দেওয়া হতো তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা পুরুপুরি নিশ্চিত না হলেও সৌন্দর্য বোধ একটা খুবসম্ভব কারন। এখানে জ্যামেতিক আকার বা অনুপাত মেন চলা বিভিন্ন সময়ের কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শনের ছবি দেওয়া হল।

- 🗞 প্রতিসাম্যতা: সমান ভাগ্যে ভাগ করা যায় এমন।

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী বিজ্ঞান ব্লগ



সৌন্দর্যবোধ এলো কোথা থেকে?

সৌন্দর্যের সম্ভাব্য উৎপত্তি হয়েছে আদিম মানুষের বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা থেকে। যেই আকার, আকৃতি, রং আর অনুপাতগুলো মানুষের তৈরি সুন্দর শিল্প, স্থাপনা বা বস্তুতে পাওয়া যায় তার সবগুলুই প্রকৃতি থেকে অনুপ্রাণিত। জ্যামিতিক অনুপাত বা নকশা প্রকৃতিতে অসংখ্য। যেমন, শামুকের খোলসে গোল্ডেন রেশিও, ফুলের পাপড়ি, গাছ, প্রজাপতি, মাছ এমনকি গরু মহিষের শিং এ ও পাওয়া যায় প্রতিসাম্যতা। এগুলো চিনতে পারা হয়ত আদিম মানুষের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ছিল। প্রতিসম গম গাছ একটা ভাল খাবারের উৎস হলেও আগা বিকৃত গম গাছ থেকে খাবার না জোটার সম্ভাবনাই বেশি, চারকোনা সমান দাঁত ওয়ালা মহিষ নিরাপদ মাংসের উৎস আর অসমান বড় দাঁত ওয়ালা নেকড়ে জীবনের জন্য হুমকি, আকাশের

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

মেঘের রং দেখে বুঝতে পারা বৃষ্টি আসবে কিনা, সমুদ্রের ঢেউয়ের আকার দেখে বুঝতে পারা মাছ ধরা কতটা নিরাপদ; এই ধরনের দক্ষতা গুলো বাড়িয়ে দিয়েছিল আদিম মানুষের বেচে থাকার সম্ভাব্যতা। আকার, আকৃতি, রং বা অনুপাত আদিম মানুষের পরিবেশ যাচাই করার সহজ উপায় দেখিয়েছে, দিয়েছে ক্রুত বিপদ সনাক্ত করার ক্ষমতা। নিরাপত্তা আর পুষ্টির চিহ্ন আমাদের কে ভাল অনুভূতি দেয়। যেই জিনিসগুলো আদিম মানুষকে কে নিরাপত্তা আর পুষ্টির মাধ্যমে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে সেগুলো মানব মস্তিষ্কের আনন্দ উৎপাদন কেন্দ্রকে বারবার সক্রিয় করে হয়ে গেছে স্থায়ী আনন্দ প্রভাবক। হয়তো আমাদের এই সৌন্দর্য বোধ সেই আকার, রং, অনুপাত বা প্রতিসাম্যতা চেনার দক্ষতা থেকেই বিবর্তিত হয়েছে।



সৌন্দর্যবোধ কি অন্তর্নিহিত?

সৌন্দর্যবোধ আমাদের অনেক গভীরে পৌঁছে গেছে। এটা এখন আমাদের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। অনেক সময় আমাদের মস্তিষ্ক ঠিকঠাক কাজ না করলেও এই বোধ ঠিকই জাগ্রত থাকে। গবেষণায় উঠে এসেছে, আমাদের স্মৃতি শক্তির সাথে সৌন্দর্য চেতনার তেমন কোন সম্পর্ক নেই। ধরুন ছোটবেলায় আপনার কাছে যতগুলো খেলনা ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর লাগতো হাল্কা বাদামি রঙয়ের একটা খেলনা ঘোড়া। তারপর আপনি বড় হলেন, বুড়ো হলেন, তারপর ডিমেনশিয়া হয়ে সব স্মৃতি ভুলে গেলেন, এমন কি আপনার পরিবারের কাউকে চিনতে পর্যন্ত পারেন না। এ অবস্থায় আপনাকে যদি অনেকগুলো খেলনা ঘোড়া দেখিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় এগুলোর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে সুন্দর, আপনি কিন্তু ঠিক ঠিক সেই বাদামি রঙের ঘোড়াটাই বের করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্নায়ু বিজ্ঞানী ড. আন্দ্রেয়া আর তার দল আলঝাইমার রোগীদের উপর এই ধরনের একটা গবেষণা চালান। গবেষণায় এক গ্রুপে সুস্থ মানুষ আর এক গ্রুপে আলঝাইমার রোগীদের নেওয়া হয়। এর পর দুই গ্রুপকেই বিভিন্ন ধরনের পেইন্টিং এর কতগুলো পোস্টকার্ড দিয়ে বলা হয় সৌন্দর্য অনুযায়ী কার্ডগুলো সাজাতে। তারপর দুই সপ্তাহ বিরতি দিয়ে আবার এই কাজটি করতে বলা হল। আলঝাইমার এর রোগীরা ততদিনে সব ভুলে গেছে। কিন্তু দেখা গেল সুস্থ মানুষের গ্রুপ মতন এলঝাইমার রোগীর গ্রুপও সেই কার্ডগুলোকে ঠিক একই ভাবেই সাজাতে পারছে। অর্থাৎ আলঝাইমার রোগী কোন এক অদ্ভুত ভাবে ঠিকই জানেন তার কি পছন্দ বা কি পছন্দ না, যদিও পছন্দের কোন স্মৃতিই তার মধ্যে আর নেই।

কেন সৌন্দর্য চাই?

আমাদের এই বিস্ময়কর সৌন্দর্য প্রবৃত্তি অনেকটা আমাদের অজান্তেই কাজ করে চলছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাঁপে সুর্যের আলোর প্রতিফলন, ইন্সটাগ্রামে দেখা কোন ল্যান্ডস্কেপ ছবি, ফেসবুকে দেখা কারো চেহারা, রাস্তার পাশে জ্বলজ্বল করা একটা ছোট্ট ফুল, বা রাতে ঘরে ফেরার পথে একঝাক আকাশের তারা, এই সব কিছুতেই আমরা সৌন্দর্য খুঁজে পাই। আমাদের জীবনে এই প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটানোর বিশেষ প্রয়োজন আছে। আধুনিক যুগে এসে আমরা প্রকৃতি থেকে নিজেদের অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছি। প্রয়োজনীয়তা, কার্যকারিতা আর অর্থের কথা ভেবে সৌন্দর্যের প্রতি এখন আর কারো খেয়াল নেই। চোখের খুললেই দেখা যায় একই ধরনের সারি সারি একঘেয়ে বিল্ডিং, নিম্প্রাণ অফিসপাড়া আর এলোমেলো দোকানপাট।

গবেষণায় পাওয়া গেছে, এধরনের দৃষ্টির একঘেয়ামী সহজেই মনে বিরক্তি আর অস্বস্থির সঞ্চার করে, এতে বাড়তে পারে মানসিক চাপ আর রক্তচাপ। উল্টো দিকে, সুন্দর বাড়ি বা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে, রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়। আমাদের শরীর আর মস্তিষ্ক আমাদের চারপাশের সৌন্দর্যের প্রতি সক্রিয়ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়। আমাদের আশেপাশের পরিবেশকে যদি আমরা সুন্দর রাখতে পারি তবে সেটা আমাদের মানসিক দক্ষতা আর সৃজনশীলতাকে বাড়িয়ে দেয়। এক জরিপে দেখা গেছে, যেই শহর এর পরিবেশ যত বেশি সুন্দর সেই শহরের মানুষজন তত বেশি সুখী, জীবন নিয়ে তত বেশি তৃপ্ত। আমরা সুন্দরের বিকাশ শুরু করতে পারি নিজের ঘর থেকেই। ঘরটা গুছিয়ে ফেলুন, যেই টেবিলে বসে পরাশুনা করেন সে-টা সাজিয়ে ফেলুন দেখবেন আপনার মনোযোগ আর দক্ষতা বেড়ে যাছে।

নিঃসন্দেহে সৌন্দর্য বোধ মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে অনন্য করেছে। তবে, এই বোধ যে শুধু মানুষেই আছে অন্য প্রাণিতে নেই তা কিন্তু নয়। তাদের এই বোধটা হয়ত অন্য ধরনের। সে বিষয় নিয়ে জানার অনেক কিছু এখনো বাকি। সৌন্দর্য গবেষণায় সামনে যে আরো অনেক নতুন নতুন তাকলাগানো তথ্য পাওয়া যাবে এ অনেকটাই সুনিশ্চিত।



§ (co



ভিটামিন বি-১ আবিষ্কারের গল্প

প্রসূন ঘোষ রায়

বেরি রোগের কথা প্রথম পড়েছিলাম মাস্টার্সের এক কোর্সে।
ইদানীংকালে এই রোগে আক্রান্তের খবর বাংলাদেশে খুব একটা
পাওয়া না গেলেও, আফ্রিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দরিদ্র দেশে
এখনো বেরিবেরি রোগের প্রাদুর্ভাব চোখে পড়ার মতন। বেরিবেরিতে
আক্রান্ত মানুষের প্রথম লক্ষনগুলো একই রকম – যেমন শারীরিক
দুর্বলতা অনুভব করা, পা ভারী হয়ে যাওয়া, হাত পা অবশ আর
ঝিনঝিন বোধ করা। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে দুই ধরনের লক্ষন দেখা
দিতে পারে:

- ৡ দুই শুষ্ক বেরিবেরি

 যাতে আক্রান্ত মানুষগুলোর পায়ের মাংশপেশী শুকিয়ে জীর্ন হয়ে

 যায়, শ্বাসকষ্ট হয়, মুখ আর নাকের পাশের অংশ নীল হয়ে

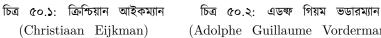
 যায় এবং অবশেষে হৃদয়য়ের ক্রিয়া বয় হয়ে একসময় মারা

 যায়।

ঘটনাটা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, ন্যাদারল্যান্ডের (ডাচ) ডাক্ডার ক্রিশ্চিয়ান আইকম্যান তখন জার্মানীর বার্লিনে এক বিখ্যাত ল্যাবে বেরিবেরি রোগ নিয়েই গবেষণা করছিলেন। তখনকার ডাচ শাসিত ইন্দোনেশিয়াই বেরিবেরি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে, ডাচ রাজতন্ত্র আইকম্যানকে ১৮৮৮ সালে ইন্দোনেশিয়া পাঠাই বেরিবেরি রোগ নিয়ে গবেষণা করতে এবং মানুষগুলোকে বেরিবেরি রোগ থেকে বাঁচানোর কোন একটা রাস্তা বের করতে। সেই উদ্দেশ্যেই ইন্দোনেশিয়ায় মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দিয়ে বেরিবেরি রোগের কারন খুঁজতে থাকেন আইকম্যান। প্রথম দিকে বিজ্ঞানী আইকম্যানের ধারনা ছিল বেরিবেরি রোগ হয়তা কোন এক অদৃশ্য জীবাণুর আক্রমনে হয়। কারন ততদিনে লুই পাস্তরের প্রচারকৃত জীবাণুতত্ত্ব সবার মাঝেই বেশ গ্রহনযোগ্যতা পেয়ে গেছে এবং

সবারই তখন ধারনা ছিল সব ধরনের রোগের কারনই হল কোন না কোন জীবাণু। এই ধারনাকে মাথায় রেখেই উনি উনার গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ১৮৯০ সালে তাঁর গবেষণাগারের মুরগীগুলোর মধ্যে হঠাৎ বেরিবেরি রোগের লক্ষন দেখা দিলে বিজ্ঞানী আইকম্যানের ভাবনায় নতুন মোড় নেয়। উনি বেরিবেরি রোগের জীবাণু খোঁজার জন্য রুগ্ন মুরগী থেকে সুস্থ মুরগীর শরীরে রোগ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলনা। বরং কিছুদিন পর আইকম্যানকে অবাক করে দিয়ে অসুস্থ মুরগীগুলোই আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে যায়। এর কারন অনুসন্ধান করতে গিয়ে উনি দেখলেন খাদ্যাভাসের পরিবর্তন। গবেষণাগারের মুরগীগুলোকে এতদিন ধরে দেওয়া হত সেনাবাহিনীর রেশন থেকে পাওয়া বেশি দামী সাদা চাউলের ভাত, কিন্তু বাজেট ঘাটতির জন্য কমদামী লাল চাউলের ভাত ঐ মুরগী গুলোকে খেতে দেওয়ার পর থেকেই মুরগীগুলো আন্তে আন্তে সুস্থ হয়ে উঠে। এই প্রথম আইকম্যান বুঝতে পারলেন রোগ শুধুমাত্র জীবাণুর মাধ্যমেই হয়না. খাবারে কোন একটা উপাদান না থাকলে ও রোগ হতে পারে।





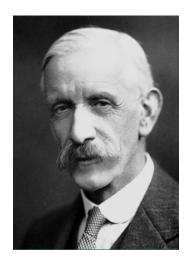


(Adolphe Guillaume Vorderman)

কিন্তু এই উপাদানটা কি করে এল কোথা থেকেই বা এল সেটা বের করার আগেই আইকম্যান অসুস্থ হয়ে পরেন এবং নিজ দেশ নেদারল্যান্ডে ফেরত যান। কিন্তু যাওয়ার আগে একই ইন্সটিটিউট এর চীপ মেডিকাল অফিসার ও বন্ধু এডক্ষ গিয়ম ভডারম্যান (Adolphe

Guillaume Vorderman) কে অনুরোধ করে যান গবেষনাটা চালিয়ে যেতে এবং সাদা চাল, বাদামী চাল আর বেরিবেরি রোগের মধ্যে থাকা যোগসূত্রটা বের করতে। সেই উদ্দেশ্যেই ১৮৯৭ সালের মধ্যে এডক্ষ ইন্দোনেশিয়ার ১০০টা জেল এ কোন ধরনের চাউলের ভাত দেওয়া হয় এবং কোন জেল এ কত বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত মানুষ আছে তার তথ্য সংগ্রহ করেন। লক্ষ্য করে দেখেন, যে সকল জেল এ কয়েদিদেরকে কমদামী লাল চাউল দেওয়া হয় সেসব জেলে বেরিবেরিতে আক্রান্তের পরিমান দশ হাজারে একজন আর যে সকল জেল এ সাদা চাউলের ভাত দেওয়া হত নিয়মিত সেখানে বেরিবেরিতে আক্রান্তের হার ৩৯ জনে ১ জন! বিজ্ঞানী এডক্ষের এই গবেষণা আইকম্যানের ধারনাকে সত্যি প্রমান করে। যার ফলে লাল চালের ভাতের ব্যবহারকে সম্প্রসারণ করেই তখন লাখো লাখো মানুষের জীবন বাঁচিয়েছিলেন এই দুই বন্ধু। যার জন্য বিজ্ঞানী আইকম্যান ১৯২৯ সালে আরেক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক হপকিন্স (Sir Frederick Gowland Hopkins) এর সাথে মেডিসিনের নোবেল পুরঙ্কারে ভূষিত হন। (যদিও বিজ্ঞানী এডক্ষকে কেন সেই নোবেল পুরষ্কারের অংশীদার করা হয়নি সেটা এখনো রহস্যই থেকে গেছে) কারন বিজ্ঞানী হপকিন্স তাঁর গবেষণাগারের ইঁদুরের উপর গবেষণা করে দেখেছিলেন, ইঁদুরকে পেট ভরে খেতে দেওয়ার পর ও তাদের শরীর জীর্ণ শীর্ণই থেকে যায়, সেই একই ইঁদুরের খাদ্যে সামান্য একটু গরুর দুধ যোগ করে দিলেই ইঁদুরগুলোর শারীরিক বৃদ্ধি বহুগুণ বেড়ে যায়। এই গবেষনা থেকেই হপকিন্স বুঝতে পারেন গরুর দুধে এমন একটা উপাদান আছে যা অন্য সকল খাবারগুলোতে নেই এবং ইঁদুরের শরীরেও নিজে নিজে তৈরি হয়না বরং বাইরে থেকে খাদ্যের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হয়। তাই গরুর দুধকে রাসায়নিক বিশ্লেষন শুরু করেন তিনি এবং কিছু অ্যামিন $(-\mathrm{NH}_2)$ এর অস্তিম্ব খুঁজে পান। যা শুধু ইঁদুরের জন্যই নই, এমনকি মানুষের দেহের বৃদ্ধির জন্যও খুবই প্রয়োজনীয় বা ভাইটাল $({
m Vital})$ এই সকল অ্যামিন। তাই তার নামকরন করা হয় ভাইটাল অ্যামিন, পরবর্তিতে যা সংক্ষেপে ভিটামিন নামেই পরিচিতি পায়।

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

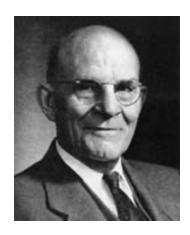


চিত্র ৫০.৩: ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক গল্যান্ড হপকিন্স (Sir Frederick Gowland Hopkins)

কিন্তু এই সকল ভাইটাল অ্যামিন বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎসে খুব সামান্য পরিমানে খুঁজে পাওয়া গেলেও পরীক্ষাগারে বানানো তখনো অসম্ভবই ছিল। সেই অসাধ্যকেই সাধন করেন পাশের দেশ ভারতের মাদ্রাজে জন্ম নেওয়া পাদ্রী বাবার সন্তান রবার্ট উইলিয়ামস। ছোটবেলা থেকেই যার স্বপ্ন ছিল রসায়নবিদ হওয়ার। সেই উদ্দেশ্যেই আমেরিকার ইউনিভারসিটি অফ শিকাগো থেকে রসায়নের মাস্টার্স শেষ করে ফিলিপাইনের এক গবেষনাগারে যোগ দেন গবেষক হিসেবে। দুই বন্ধু আইকম্যান এবং এডক্খ'র লাল চাউল খাইয়ে বেরিবেরি রোগ নিরাময়ের কথা তখনো মানুষের মুখে মুখে। তাই সেই লাল চাল নিয়েই গবেষণা শুরু করলেন বিজ্ঞানী উইলিয়ামস।

উইলিয়ামসের ধারনা ছিল লাল চালের ঐ লাল আবরণেই এমন কিছু লুকিয়ে আছে যা বেরিবেরি রোগ সারতে পারে। সেটা পরীক্ষা করবার জন্য তিনি আরো কয়েকজন বন্ধুর সহযোগীতায় সেই লাল চালের আবরণটা আলাদা করে নির্যাস বানিয়ে সেটা ব্যবহার করা শুরু করলেন বেরিবেরি আক্রান্ত কুকুরের উপর, ভাল ফল পাওয়ার পর ব্যবহার বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

করলেন মানুষের উপর। দেখলেন লাল চাউলের ভাত না খাইয়ে শুধুমাত্র এই নির্যাস বা ঔষধ ব্যবহার করেই কয়েকদিনের মধ্যেই বেরিবেরি আক্রান্ত মানুষ সম্পূর্ন সুস্থ হয়ে যায়।



চিত্র ৫০.৪: রবার্ট আর উইলিয়ামস (Robert R. Williams)

কিন্তু মাত্র ৯ গ্রাম লাল আবরন সংগ্রহ করতেই বিজ্ঞানী উইলিয়ামস আর তাঁর বন্ধুদেরকে বাছায় করতে হয়েছিল একটন লাল চাল! আর ঐ ৯ গ্রাম লাল খোসা থেকে তিনি নির্যাস পান মাত্র কয়েক মিলিগ্রাম। এক টন লাল চাউল থেকে এত খাটা খাটনির পর মাত্র কয়েক মিলিগ্রামের নির্যাস সংগ্রহ বিজ্ঞানী উইলিয়ামসকে ভাবনায় ফেলে দেয়। তাই তিনি সহ সকল বিজ্ঞানী এই নির্যাসের মধ্যে থাকা অ্যামিনের রাসায়নিক গঠন জানার জন্য উঠে পরে লাগলেন। সেই উদ্দেশ্যেই অনেক পরিশ্রম করে সেই অণুকে ভেংগে তার মধ্যে থাকা কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা এবং অনুপাত বের করলেন নিখুতভাবে। আর তার রাসায়নিক নাম দিলেন থায়ামিন। এই সেই থায়ামিন যা পরীক্ষাগারে বানানো গেলে মানুষের শরীর স্বাস্থ্য আর সাদা চাউল লাল চাউলের উপর নির্ভর করবে না। একটা প্রাণ ও ঝরে যাবেনা বেরিবেরি রোগে। অনেক চেষ্টার পর ১৯৩৬ সালে সেই অসম্ভব কাজটাই করে ফেললেন বিজ্ঞানী উইলিমস। পরীক্ষাগারে এক

ফোঁটা বিশুদ্ধ থায়ামিন বানাতে সক্ষম হলেন এই কালজয়ী বিজ্ঞানী। যা এক টন লাল চাউলের খোসার নির্যাস থেকে পাওয়া থায়ামিনের পরিমান থেকেও বেশি। আর এই থায়ামিনের পরবর্তি নাম দেওয়া হয় ভিটামিন বি-১।

চিত্র ৫০.৫: থায়ামিন বা ভিটামিন বি-১



পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে

আহ্বান

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলো গল্পের ছলে বলতে পারলে সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানে উৎসাহী হবে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে বিজ্ঞানমনষ্ক করা। দুর্বোধ্য ভাষায় তত্ত্বকথা না কপচিয়েও বিজ্ঞানকে সহজ করে বোঝানো যায়। এই পথে হেঁটেছিলেন আব্দুল্লাহ আল-মুতী ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতো বাঘা বাঘা লেখকেরা।

আমাদের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো নবীন বিজ্ঞান লেখকদের মাঝে নি-জেদের বিভিন্ন লেখার উপর ইতিবাচক ও গঠনমূলক মতামত লেনদেন করা ও পরস্পরের কাছ থেকে শেখা। আপনিও যোগ দিন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ছড়ানোর এই আন্দোলনে।

- 🗞 ওয়েবসাইট: bigganblog.org
- 🗞 সামাজিক মাধ্যম: বিজ্ঞান ব্লগ ফোরাম (ফেসবুক গ্রুপ)
- 🗞 লেখক হতে চাইলে পড়ন: bigganblog.org/policy





প্গতরি পথ

বিজ্ঞান ব্লুগ

বিজ্ঞান চর্চা

বিজ্ঞান অভিসন্ধানী

বিজ্ঞান ব্লগের এক যুগ নির্বাচিত নিবন্ধ সংকলন